



নজদী আন্দোলনের নূতন পুরাতন ইতিহাস  
বনাম

# নজদী পরিচয়



বেদওয়ানিয়া লাইব্রেরী  
বাংলাবাজার-ঢাকা

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ  
[www.syedmostafasakib.blogspot.com](http://www.syedmostafasakib.blogspot.com)



বাংলাদেশে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কর্তৃক মনোনীত ও স্বীকৃত।

## নজদী পরিচয়

(ওহাবী আন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিহাস)

প্রণেতা

মোহাম্মদ রেদওয়ানুল হক ইসলামাবাদী

প্রকাশনায়

রেদওয়ানিয়া লাইব্রেরী

৩৮/২ (গ) বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ২৩৭৬২০, ২৮৩০২৬



প্রকাশক  
সাইফুল ইসলাম  
১৫ নং কোর্ট হাউস স্ট্রীট, ঢাকা

প্রথম সংস্করণ—নভেম্বর ১৯৯০ ইং

প্রকাশক কর্তৃক সব স্বত্ত্ব সংরক্ষিত

মূল্য : ৩৫.০০

মুদ্রণ :  
রেডওয়ানিয়া প্রেস  
বাংলাবাজার ঢাকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## ভূমিকা : “নজদ” পরিচিতি

বর্তমান সৌদী আরবের পূর্বাঞ্চলীয় একটি প্রদেশের নাম “নজদ”। এদেশের অধিবাসীগণ ঐতিহাসিক ভাবে ইসলামের ঘোর শত্রু। ইসলামের প্রারম্ভিক কাল হতেই এরা মুসলমানদের ধ্বংস সাধনে নানা যড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল খুন খারাবি, রাহাজানি, অবৈধ যুদ্ধ পরিচালনা, ইসলাম বিদ্বেষ ইত্যাদি। এদের জীবন যাত্রার প্রণালী ছিল পশু চারণ, দস্যুত্ব, মর্খতা ও বাবাঘরি। এখান থেকে উৎপত্তি হয়েছিল শরতানেব শিং মোসালিমা কাজজাব নামের ভন্ড নবী ও আবদুল ওহাব নজদী নামের প্রান্ত ফেরকার উদ্ভাবক।

পির নবী হুজুরে পাক (দঃ) এদের সম্পর্কে বদদোয়া করেছেন ফলে, এ জাতিতে আজ পর্যন্ত কোন ধর্ম প্রাণ লোকের জন্ম হয়নি এবং তৈল সম্পদ ও এই প্রদেশে আবিষ্কৃত হয় নি। নজদবাসীগণ আব্বাছ পাকের প্রেরিত নবী হুজুরে পাক (দঃ) কর্তৃক অভিশপ্ত হওয়ার বহু কারণের মধ্যে নিম্নলিখিত কারণগুলো উল্লেখযোগ্য :

(১) নজদের প্রধানতম মুরব্বী শেখ নজদী মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) কে খুম্বত অবস্থায় হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করেছিল। যার কথা আব্বাছ পাকের কোরআন মাজিদে বিশেষ ভাবে উল্লেখ রয়েছে।

(২) নজদ হতে মুসালিমা কাজজাব নামে এক ভন্ড নবী হযরত আব্বাকর সিন্ধিক (রাঃ) এর খেলাফত কালে ইসলামের মধ্যে ফেতনা সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছিল। যার কথা ইসলামের ইতিহাসে বিস্তারে আলোচিত হয়েছে।

(৩) সাহাবা বিদেখী এই দেশবাসী বীরে মাউনাতে সুশিক্ষিত সত্তর জন সাহাবীকে নির্মম ভাবে বিনা কারণে হত্যা করেছিল। এই ঘটনার পর হুজুরে পাক (দঃ) নামাজের মধ্যে কুনুতে নাজেলায় মাযামে নজদীগণের জন্য বদদোয়া করেছিলেন। (বোখারী ও মুসলিম)



(২)

ভূমিকা নজদী পরিচিতি

(৪) ১১১১ হিজরীতে আবদুল ওহাব নজদী নামের এই দেশের এক ব্যক্তি ইসলামের বড় এক ফেতনা। ইবনে সউদ ছিল তার সম্পর্কীয় ভগ্নিপতি। এই দু'ব্যক্তি দস্যু বাহিনী গঠন করে নজদ ও হেজাজের শাসন ক্ষমতা দখল করেছে, বহু সূফী ওলামায়ে কেরাম, হাফেজ, কারীকে হত্যা করেছে, বহু প্রসিদ্ধ সাহাবায়ে কেরামের মাজার শরীফ ধ্বংস করেছে এবং দুনিয়া ব্যাপি ওহাবী আন্দোলন পরিচালনা করেছে। যার অনুসারী বর্তমান সৌদী শাসক বাদশাহ (ফাহদ) পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। তারা ইসলামী মূল ধারা হতে বিজ্ঞান। তারা ইসলামের গনতন্ত্রকে হত্যা করে স্বৈরাচারী ও বিলাস প্রিয় রাজতন্ত্র কায়েম করেছে। তাদের সহায়ক শক্তি হল ইহুদী, নাসারা, সাবাইন ও নাস্তিক সম্প্রদায়। সুতরাং এই ধীকৃত জাতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার আজ সময় এসেছে। উপরোক্ত বিষয় সমূহ উক্ত বইয়ে আমরা সবিস্তার আলোচনা করেছি। আমাদের এতদ্দেশে নজদী ওহাবী পন্থী দেওবন্দ মাদ্রাসার কতিপয় আলেম উল্লেখযোগ্য। এদের লিখিত ফতুৱাতে রশিদিয়া ওহাবী মতবাদের অন্যতম পুস্তক। শরীয়াত তরীকত পন্থী ওলামাগণ ওহাবী মতবাদীদের ফতুৱা ও তাদের অনুসারীদের সংগ্রহ হতে দূরে থাকার কথা তাকিদ দিয়ে বলেছেন। অন্য-থায় ইমান আকীদা বিনুটি হয়ে যাবে। রোজা নামাজ প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করেও কোন সাধকতা হাসিল করা যাবেনা।

হযরত রাসুলে আকরম (সঃ) বলেছেন আমার উম্মতগণ ৭৩ ফেকরি বিভক্ত হয়ে যাবে। তন্মধ্যে আহলে সুন্নাতের জামায়াতই সম্মত ও বেহেশতী ফেকরি হবে। নজদী, খারেজী, ওহাবী প্রভৃতি সকল ফেকরি শাস্ত এবং দোষখী হবে। এরা শরতানের মত শৃঙ্খল আল্লাহ পাকের পূজারী, তারা হযরত মোহাম্মদ (সঃ) কে যথাস্থ ভাবে বিশ্বাস করেন। আল্লাহ পাক মুসলিম উম্মাকে সকল বাতিল ফেকরি হতে হেফাজত করুন, আমীন।

আবুজ গোফার

মোহাম্মদ রেদওয়ানুল হক ইসলামাবাদী

## নজদী পরিচয়ের সুচীপত্র

প্রথম পাঠ

বিষয়	পৃষ্ঠা
○ কুফরী মতবাদের বিরুদ্ধে ইসলাম ধর্মের সূচনা।	১
○ শেখ নজদীই মহানবী (সঃ) কে ধুমস্ত অবস্থায় হত্যা করার কর্মসূচী গ্রহণ করে।	২
○ মহানবী (সঃ) কে প্রানে বদ করার জন্য শেখ নজদীর দারুন নবরায় পদাধীন।	৪
○ মহানবী (সঃ) কে হত্যা করার জন্য তাঁর বাড়ী ঘেরাও।	৭
○ নজদের মাটিতে নজদীগণ ৭০ জন সাহাবা কেরামকে নির্মমভাবে হত্যা করার ঘটনা।	১০
○ নজদের রেজীতে সাহাবা হত্যার ঘটনা।	১৪
○ মসজিদে যেরারে নবী (সঃ) কে হত্যার সংকল্প।	১৫
○ যেসব হাদীসে নজদীগণ অভিযুক্ত।	১৬
○ মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর কুকাতি।	২৬
○ ফতোয়া শামীতে নজদী পরিচয়।	২৭
○ তাফসীর সাবীতে ওহাবী ফেকরি।	২৮
○ ওহাবী ফেকরি সম্বন্ধে দেওবন্দী মৌলভী।	২৯
○ দেওবন্দী ফতোয়ার জবাবে ওলামায়ে হারামাইন।	৩১
○ যেসব দেওবন্দী আলেম ওহাবী ফেকরি বিরুদ্ধে ছিলেন।	৩২
○ মুফতী শফী সাহেবের ফতোয়ার দেওবন্দীগণ ধর্মচ্যুত।	৩৪
○ নবীর কুৎসাকারীর শাস্তি হত্যা ও কতল।	৩৬
○ ধর্ম কুৎসাকারী দেওবন্দীগণ তওবা করে ছিলেন কিনা।	৩৭
○ ব্রিটিশ সন্ন্যাসের ভাগ্যেতে ওহাবী পরিচয়।	৪০



(খ)	নজদী পরিচয়ের সূচীপত্র	পৃষ্ঠা
০	তরখানের ডাক বাংলার মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী।	৪১
০	নজদী ও শিয়ার তক' বহু।	৪২
০	মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী সুফিয়ার মতাকলে পড়ে শরাব পান।	৪৪
০	ওহাবী মাযহাব স্বপ্নে পাওয়া মাযহাব।	৪৬
০	ওহাবী আন্দোলনের ৬৬ফা কর্মসূচী।	৪৮
০	ওহাবী আন্দোলনের ৬৬ফার দুরাবস্থা।	৪৯
০	ওহাবী নজদীর সংস্কারে বাংলা একাডেমী।	৫২
০	ওহাবী ইমাম ইবনে তাইমিয়ার উপর আল্লাহর গজব।	৫৫
০	খারেজী মাযহাবের উৎপত্তি কাল।	৫৭
০	নজদী প্রনীত কিতাবত তাওহীদে বহু কুফরী কালাম।	৫৮
০	নজদী প্রনীত কাশফুশ শুবহাতের কুফরী কর্ম।	৫৯
০	কাশফুশ শুবহাতের ধারাবাহিক কুফরী কর্ম।	৬১
০	নবী (দঃ) ধর্ম প্রচারের জন্য নিদেশিত ছিলেন তাওহীদ প্রচারের জন্য নয়।	৬৩
০	মহানবী (দঃ) এর ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পত্র আহ্বান।	৬৭
০	রোম সম্রাটের সঙ্গে প্রিয়নবী (দঃ) এর পরালাপ।	৬৯
০	রোম সম্রাটের নিকট ইসলামী দাওয়াত।	৭০
০	মৌলবাদের জন্ম কথা।	৭৪
০	ধর্ম পন্থী ও খোদা পন্থীর পার্থক্য।	৭৯
০	দীনে তাওহীদ এর মোকাবেলায় ইসলাম ধর্ম।	৮৫
০	নজদী ওহাবীর মূর্তি পূজা করতো।	৮৬
০	তরীকত শিকার মাধ্যমে ধর্ম প্রচার।	৯০
০	বাইয়াতে রাসুল ও বাইয়াতে সাহাবা।	৯১
০	ওহাবী তরীকত এর সূচনা।	৯৩

(গ)	নজদী পরিচয়ের সূচীপত্র	পৃষ্ঠা
০	আকবরের দীনে এলাহী ও মজাহিদদিয়া তরীকার ধর্ম।	৯৪
০	তরীকত শাহ ওলীউল্লাহ মোহাম্মদে দেহলভী (রাঃ)।	৯৫
০	শাহ আবদুল আজিজ মোহাম্মদে দেহলভীর শিরা দমন।	৯৭
০	ভারত বর্মে ওহাবী ফেকারি উদ্ভব।	৯৮
০	দিল্লীর মসজিদে ওহাবী সূফীর প্রথম বহু।	১০০
০	সৈয়দ আহাম্মদ রেলভী আল্লাহর হাতে মরত্ব হ'লেন কি করে।	১০১
০	আল্লাহ পাকের কোন তরীকা আছে ?	১০৩
০	সুফী মাওলানা নূর মোহাম্মদের পূর্ব পুরুষ ও বংশ পরিচয়।	১০৫
০	তরীকত পন্থী সূফী ইমামগণের নাম।	১০৯
০	মাওলানা আবদুসসাদ সিন্ধীকীর মরত্বানগণ।	১১২
০	মাওলানা রুহুল আমীনের সঙ্গে ওহাবীগণের বহু।	১১৪
০	সৈয়দ আহাম্মদ রেলভী কেন শহীদ হন নি।	১১৭
০	তরীকারে আওর মোহাম্মদীর সঠিক রূপ।	১১৯
০	কবর স্মৃতি নির্মানের শরীরত সম্মত বিধান।	১২১
০	মাজার নির্মানের পট ভূ মতা।	১২৩
০	হযরত ওমর (রাঃ) এর ব্যস্ততুল মোকামদাস পরিদর্শন।	১২৪
০	কবর পাকা করার মূল উৎস।	১২৭
০	কবরের পাশে নামাজ পড়া শরীরত সম্মত।	১৩০
০	দারুল আরকম কি ?	১৩৪
০	জামাতুল মোরাস্সার কবর স্থান।	১৩৮
০	ঐতিহাসিক বদর প্রান্তর।	১৪১
০	জামাতুল বাকীর কবর স্থান।	১৪৩
০	মৌলবাদী শক্তির কালো মূখ।	১৪৮



(৬)

নজদী পরিচয়ের সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
০ ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ।	১৪৯
০ মৌলবাদী শক্তির সূচনা কাল।	১৫০
০ দমে দমে আত্মাহুত।	১৫০
০ একজন মৌলবাদী ওরায়েজের ঘটনা।	১৫৭
০ আদম ও শয়তানের লুকোচুরী।	১৬০
০ খারেজী মাযহাব ও ইহুদী মাযহাব।	১৬৪
০ ওহাবী মাযহাবের হলপ নাম।	১৭০
০ দেওবন্দী মাযহাবে ভোট দিন।	১৭১
০ দেওবন্দী মাযহাবের বৈশিষ্ট্য।	১৭৩
০ দেওবন্দ পরিচিতি।	১৭৪
০ দেওবন্দে হুজুরে পাকের তাশরীফ আনয়ন।	১৭৬
০ হারামকে হালাল করার নিয়ম।	১৭৭
০ সুদের টাকা হালাল করার নিয়ম।	১৭৮
০ হারাম দূধ ও মাংস হালাল করার নিয়ম।	১৭৮
০ কাকের মাংস হালাল করার হীল।	১৮০
০ কাকের মাংস হালাল হওয়ার যৌক্তি।	১৮১
০ মিলাদ কেরাম নিয়ে উদ্ভাদ সাগরিকের লড়াই।	১৮২
০ মিলাদ শরীফের পুস্তক পুঁড়িয়ে দেয়া ঘটনা।	১৮২
০ দেওবন্দী প্রথম ইমাম ইসমাইল খারেজী।	১৮৫
০ দেওবন্দী দ্বিতীয় ইমাম কাশেম কাদিয়ানী।	২৮৭
০ দেওবন্দী তৃতীয় ইমাম রশিদ গঙ্গুহী।	১৮৯
০ দেওবন্দী চতুর্থ ইমাম খলিল আহাম্মদ নাস্তিক।	১৯০
০ দেওবন্দী শেষ ইমাম আশরাফ আলী থানভী।	১৯২
০ আশরাফ আলীর ঘোষণার মহানবী ক্ষত্র জানী ছিলেন।	১৯৩
০ থানভী ও থানাবন এর মহাবী।	১৯৬
০ দেওবন্দীগণ তিন দলে বিভক্ত।	১৯৮
০ আশরাফ আলীর ফতোয়ার সকল দেওবন্দী।	১৯৯

## প্রথম পাঠ

### কুফরী মতবাদের বিরুদ্ধে ইসলাম

إِنِّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ পবিত্র ইসলাম-ই হল মহান আলাহ

পাকের নিম্নে একমাত্র মনোনীত ধর্ম। ৬১০ খৃস্টাব্দে হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর বয়স যখন ৪০ বছরে উপনীত হল মহান আলাহর নির্দেশে তিনি তার পর হতে এ ধর্ম মত প্রচার আরম্ভ করেন। প্রথম তিন বছর পর্যন্ত তিনি এ প্রশংসনীয় ধর্মটিকে স্তি গোপনে গোপনে প্রচার করতে থাকেন। এ সময়ের মধ্যে যে সামান্য সংখ্যক লোক এই পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তারা অতি সংগোপনে তা পালন করতেন। অতঃপর যখন তা প্রকাশ্যে প্রচারের জন্য আদিষ্ট হয়ে কুরাইশদেরকে প্রকাশ্যে ইসলামের প্রতি আহবান জানালেন, তখনই তাদের শত্রুতার মাঠ বেড়ে গেল।

০ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সঃ) এর গোপনে গোপনে ইসলাম প্রচার দেখে কুরাইশ গোত্র প্রধানগণ হুজুরে পাক (সঃ) এর আন্তানার উপস্থিত হয়ে আপত্তি জানাল যে, আপনি এই নতুন ধর্মটি প্রচার করবেন না! কারণ এ-তে আমাদের ধর্মমতের বিরোধিতা করা হচ্ছে। তাই আমরা ইচ্ছা করছি যে, যদি আপনি নতুন ধর্মমত প্রচার থেকে বিরত থাকেন তবে আপনাকে বহু ধন সম্পদ দিব। যাতে আপনি আরব বিখ্যাত ধনী হয়ে যাবেন এবং আপনি ইচ্ছা করলে আপনার মনের আনন্দ উপভোগের জন্য আরব বিখ্যাত সুন্দরী সুন্দরী রমণী আমরা আপনার খেদমতের জন্য নিযুক্ত করে দিব। আপনি যদি আগ্রহ প্রকাশ করেন তবে এ সব এখনই আপনার দরবারে উপস্থিত করা হবে।



০ আর একটি হাদীসের বর্ণনার দেখা যায় যে, কুরাইশগণ হুজুরে পাক (দঃ) এর সঙ্গে ইসলামের বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত সন্ধি করতে চেয়েছিল।

১। কুরাইশগণ হুজুর পাক (দঃ) কে বলল, এক বছর আপনি আমাদের লাভ, ওজা প্রভৃতি ভূতের পূজা করবেন, তা হলে অপর বছর আমরা আপনার এক ঘোদার ইবাদত করবো। হুজুর (দঃ) ও কুরাইশদের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের আলাপ আলোচনা চলছিল এমতবস্থায় সে আলোচনা মজলিসের মধ্যে হুজুরের চাচা "আসওয়াদ" ও "ওলিন" উপস্থিত হয়ে বলল, হে মোহাম্মদ! উপরে উল্লেখিত দু'টি প্রস্তাব মেনে নেয়ার জন্য আমরা তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি। হুজুরে পাক (দঃ) সূরায় "কাফেরুনের" নির্দেশ মোতাবেক কুরাইশগণকে উত্তর দিলেন যে, আমি মানুষের হাতে গড়া প্রতিমার পূজা করতে পারি না।

অতঃপর কুরাইশগণ হুজুরে পাক (দঃ) হতে এ উত্তর শ্রবণ করে তারা তাঁর প্রাণের শত্রু হয়ে গেল। একদা হুজুরে পাক কা'বা শরীফের পথে রওনা হলেন। কুরাইশগণ তাঁকে একা দেখে পথের মধ্যে বহু অপমান করে। এমনকি তাঁর গলার মধ্যে রশি লাগিয়ে টানা হেঁচড়া শুরু করে। এমনকি উপস্থিত সকলেই যে যেভাবে ইচ্ছে নবী করীম (দঃ) কে বিভিন্ন অপমান সূচক ব্যবহার ও গালাগালী করল।

অপর একদিন হুজুরে পাক (দঃ) কা'বার আঙ্গিনাতে নামাজ পড়ছিলেন, হঠাৎ একদল কুরাইশ কা'বার আঙ্গিনার উপস্থিত হয়ে সিজদা অবস্থায় রাসুলে পাকের পিঠের উপর উটের নাড়ীভূড়ী রেখে বৈ চৈ শুরু করে। হুজুর নাড়ীভূড়ী ওজনে মাথা উত্তোলন করতে সক্ষম হচ্ছিলেন না। এই রূপ আরো অপমান সূচক আচরণ ও ঘটনার বিবরণ পবিত্র কোরআন ও হাদীসের পাতার পাতার স্বনামকরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। মহানবী (দঃ) এত লাঞ্চিত নির্ণীত হন। তারপরেও আলাহ পাকের মনোনীত ধর্ম ইসলামের প্রচার বন্ধ করেন নি।

২। অন্যদিকে কুরাইশ কাফেরগণ হুজুরে পাক (দঃ) কে প্রাণে বদ করার জন্য দারুন নবওয়া নামক স্থানে একত্রিত হয়ে শলা পরামর্শ করতে লাগল। শেষ পর্বত শেখ নজদীর কুপরামর্শ মোতাবেক তাঁকে হত্যার সংকল্পে তাঁর বাস ভবন ও ঘেরাও করে। যার বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে দেখুন।

### শেখ নজদী কতৃক নবী হত্যা কর্মসূচী

মহানবী হুজুর (দঃ) এর ইসলাম প্রচার এর পরিপ্রেক্ষিতে কুরাইশ কতৃক তিনটি পরিকল্পনা বা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় (১) প্রথম পরিকল্পনা ছিল মহানবীকে শত'সাপেক্ষে নিজ দেশে-নিজ বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত রাখবে (২) দ্বিতীয় কর্মসূচী ছিল তাঁকে হত্যা করা হবে (৩) তৃতীয় কর্মসূচী ছিল তাঁকে মজা হতে বিভাড়িত করা হবে। এই তিনটি পরিকল্পনার দ্বিতীয় পরিকল্পনা (হত্যা) কে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে মহানবীর বাড়ী ঘেরাও করা হয়, তার বিস্তারিত আলোচনা আলাহ পাক পবিত্র কোরআনের মধ্যে নিম্ন অধ্যায়ে বর্ণনা করেন।

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْيَهُودُ أَوْ يَتْلُوا  
أَوْ يَضْرِبُونَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا  
كِرُونَ - (سورة الفال ٥٠)

কিরুন - (সورة الفال ৫০)

আলাহ পাক বলেন হে নবী! কুফরে মজা আপনার সম্বন্ধে তিনটি কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। ১। শত'সাপেক্ষে আপনাকে নিজ দেশে বহাল রাখবে। ২। আপনাকে নিজ ঘরের মধ্যে হত্যা করবে। ৩। আপনাকে মজা হতে বের করে দিবে। আলাহ পাক বলেন: হে আমার প্রিয় হাবীশ! আমি কাফেরদের উপরে উল্লেখিত তিনটি চফাতই বাধ' করে দিবে।



নবী হত্যায় শেখ নজদীর কুপরামর্শঃ মজার পূর্ব প্রান্তে শেখ নজদী নামে একজন বৃদ্ধ বসবাস করতেন। বয়সের দিক দিয়ে সে সকলের বয়স হতে দীর্ঘায়ু ছিল। তার নাম যাই থাকুক না কেন সে শেখ নজদী নামে খ্যাত ছিল। এই কমবয়স্ক মরদদের আমলে “বসুস” নামক বৃদ্ধের সূত্রপাত হয়। আর তারই আমলে সেই বৃদ্ধটি ৪০ বছর পর্যন্ত স্থায়িত্ব লাভ করে অবসান ঘটে। এই বৃদ্ধের অবসানের পর আর একটি আরব বিখ্যাত বৃদ্ধ শূর, হয়, সে বৃদ্ধে ৭০ হাজার মানুষ অথবা বৃদ্ধ করে প্রাণ হারায়। এই বৃদ্ধটির ৫০৪ ইং সনে অবসান ঘটে। এ ছাড়া আরবের মধ্যে যত আপত্তিকর ঘটনা ঘটতো প্রত্যেক ঘটনাতাই এ কুট বৃদ্ধের কিছুর না কিছুর পরামর্শ থাকতো। এই কুটনা বৃদ্ধের কুপরামর্শেই আব, জেহেল হুজুরে পাককে প্রাণে হত্যা করার জন্য উদ্বৃত্ত হয়েছিল। নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো।

### দারুন নদওয়ারে শেখ নজদীর পদার্পন

দারুন নদওয়ার কমিটি সেন্টারে নবী হত্যার আলোচনা চলছিল। হঠাৎ সে মজলিসের মধ্যে আগমন করলো শরতান শেখ নজদী। তার আগমনে সকল আরব গোত্র প্রধানগণ অত্যন্ত খুশী হলো। স্বয়ং আব, জেহেল সভাপতির আসন ছেড়ে দিয়ে নীচে বসল, আর সভাপতির আসনে বসালো শেখ নজদীকে। এই কুটনা বৃদ্ধ বলল, হে আরব গোত্রগণ! তোমরা কেন দারুন নদওয়ারে সমবেত হয়েছ, তা আমি নজদে বসেও জানি। আমার এই বৃদ্ধাবস্থার বৈশায়ে সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়, তবে তোমাদের এই অধিবেশনটি বড় গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় আমি বহু কষ্টে উপস্থিত হয়েছি। বিশ্বস্ত তাকসীর কারকগণ লেখেন এই বদ বৃদ্ধ দারুন নদওয়া কমিটিতে শীতের দরুন কম্বল পরিধান করে উপস্থিত হয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত শেখ নজদীর সভাপতিত্বে দারুন নদওয়ার সভা চললো। শেখ নজদী দাঁড়িয়ে বলল যে, তোমরা যে কাজে উপস্থিত হয়েছ এখন

তোমরা সে কাজে মনোনিবেশ কর। অতঃপর আব, জেহেল দাঁড়িয়ে বলল, হে মানাবর, আমাদেরই মধ্যকার আবদুল্লাহ পূত্র (মোহাম্মদ) ‘ইসলাম’ নামে একটি নতুন ধর্মের প্রচার আরম্ভ করেছে। সে গোপনে গোপনে আমাদের অনেক লোককে তাঁর ধর্মে দীক্ষিত করে ফেলেছে। দিন দিন তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমন কি সে তাঁর গোত্রের আরব প্রখ্যাত নেতা আব, লাহাবকেও তাঁর ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার আহবান জানাচ্ছে। এমতাবস্থায় আমরা নীরবতা অবলম্বন করলে একদিন হয়তো সকল আরব গোত্র তাঁর ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যাবে। তাই এখন কি করতে হবে পরস্পর পরামর্শের জন্য আমরা দারুন নদওয়ারে সমবেত হয়েছি। হে মাননীয় শেখ! আপনি যখন উপস্থিত হয়েছেন, তখন আমাদেরকে ইহা থেকে পরিগ্রহণ লাভের জন্য একটি সুপরামর্শ দিবেন এটাই আমাদের একান্ত কামনা।

অতঃপর হারামজাদা শেখ নজদী আব, জেহেলের আবেদনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে দারুন নদওয়ার উপস্থিত জনতাকে বলল, মোহাম্মদ যে ইসলামের শিক্ষা দিচ্ছে, তা যদি ঐক্যেই বন্ধ না করা হয় তবে অচীরেই ইসলাম ধর্ম সারা আরবে বিস্তৃত হয়ে পড়বে। তাই মোহাম্মদের ধর্ম প্রচারকে প্রথমেই রুদ্ধ করে হবে। সুতরাং এখন তোমরা মোহাম্মদ সম্বন্ধে কি করতে চাও। প্রত্যেক আরব গোত্র প্রস্তাব উত্থাপন কর। শেষ সমাধানটা আমিই দিব। শেখ নজদীর নির্দেশ মোতাবেক দারুন নদওয়ার আরব প্রধান উপস্থিত জনতা নিম্নোক্ত স্ব-স্ব প্রস্তাব উত্থাপন করে।

১। প্রথম প্রস্তাবঃ মহানবীর ইসলাম প্রচারের বিরুদ্ধে এক আরব গোত্র বলল, মোহাম্মদ (দঃ) কে দমন করতে হলে তাঁর হাত পা বেধে কোন একটি ঘরে আবদ্ধ করে রাখতে হবে। এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে মোহাম্মদের ধর্ম প্রচার বন্ধ হবে।

শেখ নজদী মগের আসন হতে ঝাঁপ দিয়ে উঠে বলল, উক্ত প্রস্তাবটি আমার মোটেই গ্রহণযোগ্য হল না। কারণ মোহাম্মদের সাধীগণ যখন শুনবে যে, তাঁদের নবী ঘরে আবদ্ধ আছে তখন তারা জানে প্রাণে চেষ্টা



করে তাঁকে তথা হতে উদ্ধার করে নিবে। এ প্রস্তাবের কথাটি কোরআনের মধ্যে নিম্ন বাক্যে এরূপ বলা হয়েছে।

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ -

হে আমার হাবীব! কাফেরগণ আপনাকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখার পরিকল্পনা করেছে। তাই এখন থেকে আপনি সতর্ক থাকুন।

২। দ্বিতীয় প্রস্তাব : এক গোত্র প্রধান বলল, মোহাম্মদকে দেশ ত্যাগী করা হউক। সে যেখানে ইচ্ছে সেখানে চলে যাক। শেখ নজদী বলল, এ প্রস্তাবটি অসম্পূর্ণ। শেখ নজদী কসম করে বলল, আমি জানি মোহাম্মদের কথা ও ভাষা অতি মিষ্ট। তাঁর কথার প্রত্যেকের মন মৃদু হয়ে যায়। সে যেখানেই থাকনা কেন তাঁর আলাপ আচরণে মানুষ মৃদু হয়ে যাবে এবং তাঁর দল বৃদ্ধি পাবে। তখন সকল আরব গোত্রের উপর আক্রমণ চালাবে। কাফেরদের এই পরিকল্পনার কথা আল্লাহ পাকের কোরআনে নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে।

كَذَلِكَ قَالَ أُولُو الْأَرْحَامِ -

হে হাবীব! আপনাকে মক্কা শহর হতে বের করার প্রস্তাব উত্থাপন করা হচ্ছে।

৩। তৃতীয় প্রস্তাব : এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করল আরব নেতা আবুজেহেল। সে শেখ নজদীকে লক্ষ্য করে বলল যে, পূর্ববর্তী প্রস্তাবের আশ্রয় ও মনঃপূত হয় নি। কেননা মোহাম্মদকে ঘরে বেঁধে রাখা বা বহিস্কার করা জীবিত রাখারই নামান্তর। এখন আমি একটি প্রস্তাব পেশ করছি। শেখ নজদীকে বলল, মান্যবর আপনার মনঃপূত হলে গ্রহণ করবেন, নচেৎ প্রত্যাখান করে দিবেন। উহা হল এই যে, আমি চাই যে, মোহাম্মদকে হত্যা করা উক। শেখ নজদী বলল, এখনই সঠিক প্রস্তাব

উত্থাপিত করা হল। তবে এই প্রস্তাব বানা আমি আংশিক মেনে নিলাম। কারন মোহাম্মদকে হত্যা করা বড় কথা নয়, কেননা তাঁর মত বক্তাই লোক বৈমন্দিন হত্যা হচ্ছে। তাই আমার মত বয়স্কদের পাকা বুদ্ধি এই যে, মোহাম্মদকে নিরাপত্তা দেওয়া হত্যা করা হউক। আবুজেহেল হাতে তালী দিয়ে শেখ নজদীর প্রস্তাবকে মেনে নিল এবং পরস্পর সকল আরব গোত্র লকলেই তাঁর প্রতি সমর্থন জানাল। আল্লাহ পাক তাঁর হাবীবের হত্যাকে কোরআনের মধ্যে لِيَقْتُلُوكَ শব্দে ব্যক্ত করেন। অর্থাৎ হে নবী! আপনাকে হত্যা করার ব্যবস্থা চলছে।

মহানবী (সঃ) এর বাড়ী ঘেরাও : দারুন নবওয়া নামক নৈটক হুজুরে পাক (সঃ) এর হত্যার প্রস্তাব পাম হওয়ার পূর্বেই হুজুরে পাক (সঃ) জিরাঈল (আঃ) কর্তৃক কাফেরদের কুক্রান্ত সম্পর্কে অবহিত করা হলো। এবং পরবর্তীতে কি করতে হবে তাও জানায়ে দেয়া হল। এ দিকে একরাতে আবুজেহেলের নেতৃত্বে প্রত্যেক আরব গোত্র হতে কিছু সংখ্যক লোক তাঁর তরবারী হাতে নিয়ে হুজুরে পাক (সঃ) এর বাড়ী ঘেরাও করে ফেলে। এমন সময় হযরত জিরাঈল আমীন হুজুরে পাক (সঃ) কে কাফেরদের এ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে পরবর্তী সিদ্ধান্তের কথাও জানায়ে দিলেন। তাই হুজুরে পাক (সঃ) ঐ রাতে নিজ শরন কক্ষে তাঁর চাদর গায়ে জড়িয়ে হযরত আলীকে তাঁর বিছানায় শুয়ে থাকার জন্য আদেশ দিলেন এবং তাকে আরো বললেন যে, আমার আর মক্কাতে অবস্থান সম্ভব নয়। হে আলী (রাঃ) আমার নিকট মক্কাবাসীদের যে আমানত সংরক্ষিত রয়েছে তা স্ব স্ব আমানতকারীকে প্রদান করে তিনদিন পর তুমি মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় চলে এসো। হুজুরে পাক (সঃ) হযরত আলীকে এ নির্দেশ দেওয়ার সময় দেখেন কাফেরগণ বাড়ী ঘেরাও করে রেখেছে। হযরত আলী (রাঃ) বললেন, হুজুর আপনি নির্দেশ করুন আমি একটু কাফেরদেরকে আপনার বাড়ী ঘেরাওয়ের মজা দেখায়ে দেই। হযরত রাসুলে পাক (সঃ) বললেন, কোন ভয় নেই, আল্লাহ আমার সহায়ক রয়েছে। এই বলে



হুজুরে পাক (দঃ) আল্লাহ পাকের নির্দেশে স্বীয় পারের তলা হতে এক মুষ্টি বালি নিয়ে কাফেরদের প্রতি হুজ্জে মারলেন। আর অমনি ঐ বালি কণাগণ্ডো কাফেরদের চকুতে পড়ে সকলেই অন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) তাদের ভীড়ের মধ্য দিয়ে নিজ বাড়ীর সীমা ত্যাগ করে হযরত আবুবকর (রাঃ) এর বাড়ীতে এসে উপস্থিত হন। হযরত আবুবকর (রাঃ) কে পূর্ব হতেই অনুরূপ নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তাই তারা এতদুদ্দেশ্যে রাত্রিতেই (গারে হেরা) হেরা পর্বতের গৃহায় গিয়ে উপস্থিত হন।

হুজুরে পাক (দঃ) স্থান ত্যাগ করার পর কাফেরগণ তাঁর বাড়ী তল্লাশী দিল সেখানে দেখে যে, হযরত আলী (রাঃ) হুজুরে পাকের বিছানায় চাবির জড়িয়ে শূরে আছেন। অতঃপর তারা হযরত আলীকে জিজ্ঞাসা করলো “মোহাম্মদ কোথায়”? তিনি উত্তর দিলেন হুজুরে পাক (দঃ) এখনই তোমাদের মধ্য দিয়ে স্থান ত্যাগ করলেন। এ দিকে মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ) কে সাথে নিয়ে ছুর নামক গৃহাতে এসে আত্ম গোপন করলেন। অতঃপর পরদিন হতে ২/৩ দিন পর্যন্ত কাফেরগণ সে গৃহায় চতুর দিকে বহুবাহর অনুসন্ধান করলো কিন্তু কোন খোঁজ পেলো না। হযরত রাসুলে পাক (দঃ) ও হযরত আবুবকর (রাঃ) উভয়ে তিন দিন পর্যন্ত গারে ছুরের মধ্যে অবস্থান করার পর চতুর্থ দিনে উল্টা পথে মদীনায় দিকে রওয়ানা হলেন। অতঃপর মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) মদীনায় এসে পৌঁছলে মদীনাবাসীগণ হুজুরে পাককে স্বাগতম জানালেন। বাকি ইসলামের পরিভাষার বলা হয় হিজরত।

মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) মদীনায় হিজরত করার পর হতে মক্কা ও মদীনায় অধিবাসীদের মধ্যে ঘন ঘন যাতায়াত হত। মদীনাবাসীগণ হুজুরে পাক (দঃ) কে মক্কা হতে বের করার কারণে প্রতিশোধ নেওয়ার সংকল্প করে। এ নিয়ে মক্কা ও মদীনায় মধ্যে বহু যুদ্ধও সংগঠিত হয়। মক্কার কাফের নেতাদের মধ্য হতে যারা হুজুরে পাক (দঃ) এর বাড়ী ঘেরাও করে

ছিল তাদের মধ্যকার ২৪ জন আরব নেতা বদর যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে প্রাণ হারিয়ে জাহান্নামী হয়।

**পাঠকবৃন্দ :** এখন চিন্তা করুন কৃষ্ণাঙ্কুরে কুরাইশ ইসলাম প্রচারকে কেন্দ্র করে নানা নাশকতা মূলক কাজে লিপ্ত হয়েছিল বটে তবে এ সবের মূলে কোন ব্যক্তির অধিক হাত ছিল তা প্রনিধান যোগ্য।

সাধারণ আরব গোত্র প্রধানগণ চেরেছিল যে, শূখ, ইসলামের নতুন ধর্ম প্রচার বন্ধ করা। কিন্তু তাদের লক্ষ্য ছিল না মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) কে প্রাণে হত্যা করা। কারণ তারাতো প্রস্তাব দিয়েছিল নবীকে ঘরে আবদ্ধ করে রাখা অথবা দেশ হতে বহিস্কার করা। কিন্তু চরমপন্থী আবু জেহেল ও নজদের অধিবাসী শেখ নজদী কুটনায় কুমন্ত্রনায় সাধারণ আরবগণ হুজুরে পাক (দঃ) কে প্রাণে বদ করার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়। প্রকৃত পক্ষে বিচার করতে গেলে নবী হত্যা প্রস্তাবের জন্য একমাত্র দায়ী ব্যক্তি হল শেখ নজদী। এই এক ব্যক্তি যে নবীকে নিদ্রা বাপন অবস্থায় হত্যা করার পরামর্শ দিয়েছিল। শেখ নজদীর মতও আবুজেহেল হুজুরে পাক (দঃ) এর হত্যার প্রস্তাব করে। কিন্তু শেখ নজদীই রাসুলে পাক (দঃ) কে নিদ্রা বাপন অবস্থায় হত্যা করার পরামর্শ দিয়েছিল। শূখ, তাই নয় অনেক সাহাবায়ে কেরামকেও নজদ বাসীরা হত্যা করেছিল যার বিবরণ পরবর্তীতে দেখুন।



## নজদের মাটিতে ৭০ জন সাহাবা হত্যা।

মহানবী রাসুলে পাক (দঃ) কাফেরদের যন্ত্রনার অতিশয় হারে শেষ পর্যন্ত আব্বাসাহ পাকের নির্দেশে মক্কা ভূমি ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করতে বাধ্য হন। মদীনায় উপস্থিত হয়ে তিনি শব্দ আখরফা করেন নি বরং মদীনায় তিনি প্রকাশ্য ভাবে পবিত্র ইসলাম প্রচার করেন ও তার ইসলাম প্রচারে যে, কলটি পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য ছিল তন্মধ্যে দুটি পদ্ধতি হল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি হল কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা। দ্বিতীয় যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বন্দী হত তারা বিনা শক্তি প্রয়োগেই ইসলামের আদর্শ উপলব্ধি করতঃ পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতেন।

মহানবী রাসুলে পাক (দঃ) এর ইসলাম প্রচারের বিতর্কিত পদ্ধতিটি ছিল যে, তিনি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সাহাবা কেরামদেরকে আরব প্রতিবেশী দেশে প্রেরণ করতেন। তারা সেখানে পৌঁছে কোরআন ও হাদীসের অমীয়া বানী দ্বারা নিজ বুদ্ধি হেঁকমতে জন সাধারণের মধ্যে ইসলাম প্রচার করতেন এ দুই প্রক্রিয়ায় ইসলামের প্রথম যুগে ইসলাম প্রচারিত হত।

সুতরাং ৪ হিজরী সনের সফর মাসে ইসলাম প্রচারের জন্য হুজুরে পাক (দঃ) নজদের ভূমিতে ৭০ জন সাহাবা কেরামদেরকে প্রেরণ করে ছিলেন। কিন্তু নজদীগণ সে প্রেরিত ৭০ জন সাহাবাকে নিম্নভাবে হত্যা করে। নিম্নে সেই ঘটনাটি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

## বিরে মাউনায় ৭০ জন সাহাবীর হত্যার ঘটনা :

"বিরে মাউনা" নজদের একটি প্রাসাদ কুণ্ডের নাম। এই কারণেই সেখানকার স্থানীয় গ্রামের নাম "বিরে মাউন" হয়। এই বিরে মাউনাতে ৭০ জন সুশিক্ষিত মোবাললেগ সাহাবা কেরামগণকে নিম্নরূপে হত্যা করা হয়েছিল। যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ :

নজদের সকল অধিবাসী জন্মগতভাবেই কাফের বা বেইমান ছিল। তবে তাদের মধ্যে হতে "বারা" নামক একজন নজদী মদীনায় উপস্থিত হয়ে হুজুর (দঃ) এর হাতে ব্যাপ্ত গ্রহণ করে। অতঃপর কিছু দিন মদীনায় অবস্থান করে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করে। "আবুল বারাহ (রাঃ)" নিজ দেশে ফিরার পূর্বে হুজুরে পাক (দঃ) এর খেদমতে অনুরোধ জানান যে, হুজুর! নজদের অধিবাসীদের মধ্যে আমি একমাত্র মুসলমান। আপনি যদি আমার সঙ্গে কতিপয় মোবাললেগ সাহাবী পাঠান, তবে আমি আশাকরি নজদের অধিবাসীগণ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হবে। হুজুর আকরাম (দঃ) বললেন, আমি নজদে কোন মোবাললেগ পাঠাতে পারি না। কারণ সকল নজদী গান্দার, কাফের ও মুনাকফ। সে দেশেরই এক বৃদ্ধ কাফের দারুন মদুরাতে আমাকে নিম্নিত অবস্থায় হত্যা করার পরামর্শ দিয়েছিল। হযরত নবী করীম (দঃ) নজদবাসী সম্বন্ধে এতটুকু বলার পরও হযরত আবুল বারাহ (রাঃ) বারংবার একই কথা বলতে থাকে, হুজুর! আমি আশা করি আপনি সেখানে মোবাললেগ প্রেরণ করে উপকৃত হবেন।

হযরত আবুল বারাহ (রাঃ) এর বারংবার অনুরোধের পর হযরত নবী করীম (দঃ) ৭০ জন সুশিক্ষিত সাহাবাকে কেরামকে "নজদে" প্রেরণ করেন। আবুল বারাহ (রাঃ) এই ৭০ জনের নিরাপত্তা বিধানের চুক্তিবদ্ধ হন।

হুজুর পাক (দঃ) "মানবীর" বিন আমের (রাঃ) কে ৭০ জনের উপর আমীর নিয়োগ করলেন। হযরত মানবীরের হাতে হুজুর পাক (দঃ) এর হস্তলিখিত একখানা পত্র দেয়া হয়। হযরত আবুল বারাহ (রাঃ) এর পথ প্রদর্শনে ৭০ জন প্রখ্যাত শিক্ষিত সাহাবা কেরাম নজদের নেতা আবুত তোফায়েলের নিকট বীরে মাউনা গ্রামে উপস্থিত হন। আবুত তোফায়েল জিজ্ঞেস করল যে, তোমরা কারা? হযরত মানবীর তখন মহানবীর হস্ত লিখিত পত্রখানা আবুত তোফায়েলের হাতে দিলেন। সেই মরদুদ পত্র খানা একটু না পড়ে সঙ্গে সঙ্গে ছিড়ে ফেলে দিল। অতঃপর সেই মরদুদ



দরবারের পিছন দিকে ডাকারে একজন কুর্দি'কে নির্দেশ দিল পর বাহক মানবিরকে হত্যা করার জন্য। কুর্দি' নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হযরত মানবিরকে নিম্ন'ভাবে হত্যা করলো।

হযরত মানবির(রাঃ)কে হত্যা করার পর নজদী নেতা অবশিষ্ট সাহাবা কেরামগণকে হত্যা করার নির্দেশ দিল। হযরত আবুল বারা (রাঃ) এর স্ববশেষণ এই হত্যা কান্ডের প্রতিবাদ জানালে বলল, এই নিরপরাধ সাহা-বাগণের নোহ কি? তাদেরকে আমাদের নজদবাসী আবুল বারা নিরাপত্তা বিধান দিয়ে নজদে নিয়ে এসেছে।

নজদের নেতা আবুত তোফায়েল যখন দেখলো তার হত্যার নির্দেশ কার্য'করী হচ্ছে না, তখন আবুল বারার বংশের লোকদের বাদ দিয়ে নজদের অধিবাসী চারটি আরব গোঠকে সাহাবাগণকে হত্যার নির্দেশ দিল। নির্দেশকৃত চার গোঠের নাম। ১। রয়েল। ২। বাকওয়ান। ৩। ওছাই ও ৪। বনাইলইহান।

উপর উল্লেখিত চার গোঠ বাহিনী স্তুতিকৃত হামলা করে মোবাল্লাগ সাহাবাগণকে হত্যা করে। এই শহীদানদের লাশের ধুপের মধ্যে হযরত কা'ব বিন যারযেদ আহত অবস্থায় মৃতের ডান করে পড়ে থাকেন। যখন হত্যা-কারীগণ সাহাবাগণকে এক এক করে নিম্ন'ভাবে হত্যা করার পর প্রত্যেকে নিজ নিজ কাজে লিপ্ত হয়, তখন হযরত কা'ব বিন যারযেদ লাশের রূপ হতে উঠে আঁত কষ্ট করে মদীনায় পথে রওয়ানা দেন। তিনি কয়েক দিন পথ'ন্ত মদীনায় পথ অতিক্রম করার পর পথে দেখেন যে, একটি গাছের ছায়ায় দু'বার্ত্তি নিদ্রা ঘাপন করছে। হযরত কা'ব ঐ দু'জনকে নজদের অধি-বাসী মনে করে নিদ্রা অবস্থায় হত্যা করেন এবং হযরত কা'ব (রাঃ) মদী-নায় উপস্থিত হয়ে বললেন, হুজুর! আমি দু'জন নজদীকে গাছের নীচে হত্যা করে ৭০ জন সাহাবা হত্যার বদলা নিজেছি। হুজুর (দঃ) বললেন, তারা দু'জনতো নজদী নয়, বরং তারা আমার প্রতিশ্রুতিত ভিন্ন দেশী। তাই এই দু'জনের হত্যার খেসারত আমারই বহন করতে হবে।

অতঃপর হযরত নবী করীম (দঃ) হযরত কা'বকে লক্ষ্য করে বললেন, হে কা'ব! নজদের মাটিতে কি নিম্ন'ম হত্যা। চলতোছিল তা আমি জানি। নজদীগণ জন্মগতই বেখান। তবে আমি আবুল বারা সাহাবীর অনুরোধে ৭০ জন প্রশিক্ষিত সাহাবাগণকে নজদে প্রেরণ করে ছিলাম। যে সাহাবা-কেরামগণ। এসো নজদীবাসীদের ধ্বংসের জন্য নামাজাঙে কুনুতে নাজেলা পাঠ করে বদদোয়া করি।

তারপর হতে হযরত নবী করীম (দঃ) নামাজাঙে কু'রুর পর একমাস পর্যন্ত কুনুতে নাজেলা পাঠ করে গোটা নজদের অধিবাসীর জন্য বদদোয়া করতে থাকেন। তবে এই কুনুতে নাজেলা পাঠ করা পরবর্ত্তিতে রহিত হয়ে যায়।

**পাঠক :** বদদোয়া, কাউকে অভিশাপ দেয়া নবী করীম (দঃ) এর জ্ঞানের বরখেলাপ ছিল। জীবনে তিনি কারো জন্য বদদোয়া করেন নি। উহুদের মরদানে তাঁর নূরানী শরীরের উপর কত বড় আঘাত এসেছে, দাঁত মোবারক শহীদ হয়েছে, তারপরও তিনি মূখে উচ্চারণ করেন اللهم اهدنا لمرمى। আল্লাহ তুমি আমার কাণকে হেদায়েত কর। তবে তিনি নজদের মধ্যে ৭০ জন সাহাবা কেরাম শহীদ হওয়ার খবর পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে নজদীদের জন্য বদদোয়া করেন। এমন কি নামাজাঙে কুনুতে নাজেলা পাঠ করতঃ নজদের অধিবাসীদের জন্য বদদোয়া করেন। (যোযারী কিতাবুল মাগাজী)

বড়ই পরিভ্রাণের বিষয় যে, আজকাল সেই নজদের মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব এর অনুসারী এবং হিন্দুস্থান দেওবন্দের আলেমদের নিকট সাহাবা হত্যা ইমানে'র অন্তর্ভুক্ত। তারা তাদের রচনাবলীতে লেখেছেন কেউ কোন সাহাবাকে কাফের বললে সুন্নীয়ত বাতিল হয় না। নজদী আকীদা ভাল ছিল, শক্ত ছিল ও পাকা ছিল। (যতোদ্বারে রশিদিয়া)



## নজদে “রেজেরীতে” সাহাবা হত্যা

( ৫৭৫ পৃষ্ঠা (বাখারী শরীফ )

নজদের অন্তর্ভুক্ত “রেজেরী” নামক একটি বস্তি রয়েছে। সে বস্তিতে সাহাবা হত্যার যে হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটেছে তা ইমাম বাখারী (রাঃ) বাখারী শরীফের মধ্যে বিশেষ ভাবে বর্ণনা করেছেন। আমি এখানে তা সংক্ষেপে আলোকপাত করছি।

ইসলামের প্রারম্ভে হযরত রাসুলে পাক (সঃ) মক্কা মদীনার প্রতিবেশী দেশের মধ্যে ইসলাম প্রচারের জন্য মোবালেগ পাঠাতেন। একবার আট দশ জন মোবালেগের উপর হযরত আছেন (রাঃ) কে প্রতিনিধি করে নজদের অজ্ঞাত রেজেরী নামক স্থানে প্রেরণ করেন, জাকওয়ানবাসীগণ সাহাবাগণের আগমনের সংবাদ পেয়ে তাঁদেরকে হত্যা করার প্রকৃতি নের। সাহাবাগণ নজদী কাফেরগণের প্রকৃতি দেখে একটি পাহাড়ের মধ্যে আশ্রয় গোপন করেন। নজদীগণ সাহাবাগণকে হত্যা করবে না বলে আশ্বাস দিয়ে তাঁদেরকে লক্ষ্য করে পাহাড়ের উপর তীর বর্ষণ করতে থাকে। হযরত আছেন (রাঃ) তীরের আঘাতে শহীদ হয়ে গেলেন। সাহাবাত বরন কালে হযরত আছেন দোয়া করতে থাকেন হে আল্লাহ! আমাদের এই মমান্তিক অবস্থার সংবাদ টুকু আমাদের রাসুলের নিকট পৌঁছে দাও। তাঁর সাহাবাত লাভের পর তাঁর সাথী হযরত যারেন, খোবাইব ও আবদুল্লাহ বিন তারেক (রাঃ) কে নজদীগণ নিরাপত্তা বিধান দিয়ে পাহাড়ের উপর থেকে নীচে নামালো এবং অত্যন্ত আক্রমণ করে সাহাবাগণের হাতিয়ার ছিনাইয়া নিলো। অতঃপর তাঁদেরকে পিছন দিক থেকে বেঁধে ফেলল। এবং সকলকে “রেজেরী” বস্তিতে নেয়ার জন্য টানাটানি করলে আবদু-

ল্লাহ বিন তারেক যেতে রাজী না হওয়াতে তাঁকে সে পাহাড়ের নীচেই শহীদ করেছিল। হযরত যারেন ও খোবাইব (রাঃ) কে বেঁধে প্রথমতঃ রেজেরীর বস্তিতে নিয়ে গেল। সেখানে এই দু’জনকেও বহু কষ্ট দিয়ে পরিশেষে মজার বাজারে নিয়ে গেল। হযরত খোবাইবকে হারেছ বিন নওফেলের সম্মাননের নিকট বিক্রি করে দিল। হারেছের সম্মানগণ খোবাইবকে বাড়ীতে নিয়ে কোপারে কোপারে সুলিতে আরোহন করাল। কারণ হযরত খোবাইব হারেছকে বদর যুদ্ধের মধ্যে নিহত করেছিল। হুজুর আকবাব (সঃ) এই নিযাতনের সংবাদ পেয়ে হযরত আমর বিন উমাইরা জমীরা (রাঃ) কে খোবাইবের লাশ উদ্ধার করার জন্য মজার প্রেরণ করেন। হযরত খোবাইব (রাঃ) কে তিনি যখন উদ্ধার করেন তখন কাফেরগণ মদ পানে নিমগ্ন ছিল। হযরত আমর (রাঃ) খোবাইবের লাশ কান্দে করে মদীনার পথে রওয়ানা দিলে তার কিছুক্ষণ বাদ কাফেরগণ এ রহস্যটি জানতে পারলো তখনই পিছন থেকে ধাওয়া করে। হযরত আমর (রাঃ) কোন উপায় না দেখে লাশকে মাটিতে ফেলে দেন। সাথে সাথে মাটি খোবাইবের লাশকে গ্রাস করে নের। কাফেরগণ বহু তালাশ করে খোবাইবের লাশ পেল না। অতঃপর তারা নিজ বাস স্থানের দিকে রওয়ানা হয়ে যায়।

উপরে উল্লিখিত ঘটনাটি বিরে মাউনার ঘটনা সংগঠিত হওয়ার সামান্য কিছু পূর্বেই ঘটে ছিল।

## মসজিদ নব্ব ধর্ম নাশের যাতাকল

ইসলামের শুরূতেই ইসলামের শত্রুগণ হযরত মহানবী (সঃ) এর সাথে বহু যুদ্ধ করে ও তাঁকে হত্যা করতে সক্ষম হয় নি। হুজুর পাক (সঃ) কে হত্যা করতে গিয়ে স্বয়ং তারাই হত্যা হয়েছে। যেমন ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদর ময়দানে অন্ততঃ ২৪ জন আরব বিদ্যাত নেতা প্রাণ হারায়।



এ কারনেই হুজুরে পূর নূর (দঃ) হিজরত করে মদীনায় বসতি স্থাপন করার পরও কুফ্ফারে কুরাইশগণ ইসলামের শত্রুতা নবীর শত্রুতা মতে উঠে। তারা মদীনায় মুনাক্কদের সাথে এ মর্মে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল যে, যখন নবী (দঃ) মজা ত্যাগ করে মদীনায় বসতি স্থাপন করেছেন তোমাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ রইল তোমরা তাকে মদীনাতেই হত্যা করবে। মদীনায় মুনাক্কগণ কুরাইশদের বন্ধুত্বের খাতিরে হুজুরে পাক (দঃ) কে হত্যা করার বহু পরিকল্পনা অংকন করে। কিন্তু তাদের প্রত্যেকটি পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়।

মুনাক্কদের একটি পরিকল্পনা ছিল যে, ইবাদত উপাসনার নামে তারা জেরার নামে একটি মসজিদ নির্মান করে এবং তথায় নবীকে উদ্বোধনী দাওয়াত দেয় তাদের লক্ষ্য ছিল তিনি যখন মসজিদে উপস্থিত হবেন, ঠিক তখন তারা সংঘবদ্ধ আক্রমণ চালাবে তাকে হত্যা করবে। কিন্তু মহানবী (দঃ) মজার বেরূপ কাকের হতে সতর্ক ছিলেন, তদ্রূপ মদীনাতেও মুনাক্ক হতে অধিক সতর্ক ছিলেন। এই সতর্কের মূল মন্ত্র ছিল আল্লাহ পাক মুনাক্কদের তথাকথিত মসজিদ খানাকে অনিষ্টকারী মসজিদ নামে অভিহিত করেন। যেমন বলেন :

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا -

মুনাক্করা হল এরূপ ব্যক্তি যারা মসজিদ নির্মান করেছে। যা হল অনিষ্টকারী ও কুফরীতে ভরপুর। অর্থাৎ মুনাক্কদের উদ্দেশ্য হল তারা তথায় আপনাকে হত্যা করে কুফরীতে লিপ্ত হবে। (আপনি সতর্ক হউন)

মসজিদে ঘেরার অনিষ্টকারী মসজিদ হল কিরূপে তা আল্লাহ পাক কোরআনের মধ্যে ব্যাখ্যা করেন নি। তবে হাদীস শরীফের মধ্যে উহার বিস্তারিত আলোচনা বির্ণিত আছে। আমি সেই আলোচনাটি এখানে সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করবো ইনশা আল্লাহ।

“জাল্লস” নামক একজন প্রসিদ্ধ মুনাক্কদের নির্দেশে মসজিদে কোবার পাশা পাশি একটি মসজিদ নির্মান করা হয়। এতে মুনাক্কদের উদ্দেশ্য ছিল যে, হুজুরে পাক (দঃ) যখনই সে মসজিদখানাকে উদ্বোধন করতে আসবেন, তখনই তাঁর চতুর্দিক ঘেরাও করে তাকে সেখানে হত্যা করে ফেলবে।

এতদ উদ্দেশ্যকে মুনাক্কগণ অন্তরে গোপনে করে রেখে তারা কয়েক মাস ধাবত অতি পরিশ্রম করে তথাকথিত মসজিদ খানা নির্মান করে। নির্মান কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর তারা হুজুর (দঃ)-কে উদ্বোধন করার দাওয়াত দিল। আর বলল যে, হুজুর! ইবাদত ও উপাসনার খাতিরে আমরা “কোবার” নাম আর একটি মসজিদ তৈরী করছি। আপনি সেখানে পদার্পন করুন বরকতের জন্য দোয়ায় খায়ের করুন। উদ্বোধনী দাওয়াত কালে রাসুলে পাক (দঃ) তাবুকের যুদ্ধ পথে রওয়ানা দিছিলেন তাই তিনি মুনাক্কদেরকে উত্তর দিলেন যে, আমি তোমাদের দাওয়াত সম্বন্ধে পরে বিবেচনা করব এখন তোমরা যদি খাতি মসলমান হও তবে আমার সঙ্গে তাবুকের পথে রওয়ানা হও। তখন মুনাক্কেরা ওজর আপত্তি জানাতে থাকে। কেহ বলে হুজুর আমার কয়দিন হতে জ্বর। কেহ বলে আমার পরিবার অসুস্থ ইত্যাদি ইত্যাদি। এরূপ আরো অনেক ওজর আপত্তি পেশ করে তারা নবীর সঙ্গে তাবুকের যুদ্ধে যাওয়া হতে বিরত থাকলো।

হুজুরে পাক (দঃ) তাঁর বর্মপ্রাণ সঙ্গী সাহাবাগণকে সঙ্গে করে তাবুকের পথে রওয়ানা দিলেন। যুদ্ধ পরিসমাপ্তির পর তিনি আবার মদীনায় পথে রওয়ানা দিলেন। চলতে চলতে তিনি যখন তাবুক ও মদীনায় মধ্যস্থানে (আকাবার) উপস্থিত হন, তখন দাওয়াত দাতা মুনাক্কগণ সে আকাবার খাতিতে উপস্থিত হয়ে হুজুর পাক (দঃ)-কে প্রাণে বধ করার ষড়যন্ত্র করে। হুজুর জানতেন যে, মুনাক্কগণ পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে। তাই



তিনি সাহাবাগণকে বললেন যে, আমি যখন আকাবা খাটির নিকটে পৌঁছবো তখন তোমরা সে খাটির দু'ধারের বস্তিতে পথ আগাতে থাকবে। আমি একাই আকাবার 'মধ্য' পথ দিয়ে অতিক্রম করবো। সাহাবাগণ হুজুর পাক (সঃ) এর নির্দেশ মোতাবেক বস্তির দু'ধারের পথে মদীনার দিকে এগিয়ে চললেন ও ইমার বিনু ইরাসেরকে বললেন তুমি আমার উটের লাগাম ধরে সামনের দিকে পথ নির্দেশ কর। হযরত হুজারফা বিন ইরামন (রাঃ) কে বললেন, তুমি আমার উটের পিছে পিছে থাকো। হুজুরে পাক (সঃ) এ নিয়মে পথ অতিক্রম করতে লাগলেন। যখন 'আকাবা' খাটির মূখে উপস্থিত হতে থাকেন, তখন তিনি পিছের দিক হতে শত্রুর উটের পারের শব্দ ও অস্ত্রের কনকনানী শুনলেন। হযরত হুজারফা শত্রু অস্ত্রমনি দেখে চিংকার দিতে থাকেন, হে শত্রু দল! নবীর পথ রুদ্ধ করোনা এর ফলাফল ভাল হবে না। হুজারফা (রাঃ) এর চিংকার শ্রুনে বস্তি পথে চলমান সাহাবাগণ যখন হুজুরের দিকে এগিয়ে আসলেন তখন মুনাক্কিরের দল পার্শ্ববর্তী বস্তিতে পলায়ন করে। অতঃপর মহানবী রাসুলে পাক (সঃ) নিরাপদে পথ অতিক্রম করে মদীনায় উপস্থিত হন। পথিমধ্যেই উপরে বর্ণিত আয়াতখানা অবতীর্ণ হয়েছিল। অর্থাৎ যে আয়াতেম্ব মধ্যে মুনাক্কির নির্মিত মসজিদখানা ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ আছে। অতঃপর হুজুরে পাক (সঃ) মদীনায় উপস্থিত হতে তথাকথিত মসজিদে ঘিরারকে সাহাবাদের সাহায্যে স্বহস্তে ভেঙ্গে চূরমার করে দিলেন।

**পাঠক :** যে মসজিদের মূলভিত্তি স্থাপন ধর্ম ধ্বংসের জন্য হয় সে মসজিদ মত বড় বা ছোট হোক না কেন উহাকে ভেঙ্গে ফেলা উচিত। সে হিসেবে কাকরাইলের মসজিদ খানা সম্পর্কে প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মুসলমান জাহীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কারণ ইসলামের পাঁচ খেনার পরিপন্থী তাবলীগী ছয় উত্তুল প্রচারের জন্য উক্ত কাকরাইলের মসজিদ নামে আবাসিক হোটেলটি আজও নির্ধারিত। মসজিদে মেহরাব থাকে তবে কাকরাইলে তা নেই। কাকরাইলের মসজিদটি মসজিদ নয়, বরং থাকা বাওয়ার উন্নত মানের আবাসিক হোটেল মাত্র।

হুজুরে পাক (সঃ) তথাকথিত মসজিদে ঘিরারকে স্বহস্তে ভেঙ্গে ফেলে সে স্থানে মসজিদে "ফাতেমা" নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। আজ সেই মসজিদ খানা নজদীদের হাতে ধ্বংস প্রাপ্ত। এ ধ্বংসের মূল কারণ এও হতে পারে যে, নজদীগণ কাফের ও মুনাক্কির পন্থী ছিল। হযরত নবী করীম (সঃ) মুনাক্কিরদের নির্মিত মসজিদ যখন ধ্বংস করেছেন তাই তারা প্রতিশোধ স্বরূপ মসজিদে ফাতেমাকে ভেঙ্গে দেয়। এ ছাড়া নজদীগণ উহুদ মরদানে নির্মিত মসজিদে "সানারা" কেও ভেঙ্গে নির্মূল করেছে। মসজিদে "মারোনা" ও মসজিদে "ইজাবা" এর বর্তমান অনুরূপ অবস্থা।

## কতিপয় সহীহ হাদীসের মাধ্যমে নজদী পরিচয়

কা'বার সোজা পূর্ব দিকের একটি মরুময় ঘূর্ণিত অঞ্চলকে "নজদ" বলে। এ অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসীরা আশ্লাম পাকের গজব প্রাপ্ত এবং মহানবী হুজুরে পাক (সঃ) এর অভিশপ্ত। মক্কা বিজয়ের পর হযরত নবী করীম (সঃ) নজদকে আরবের অন্যান্য দেশ হতে পৃথক করে ঘূর্ণিত অঞ্চল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি খানারে কাবার সঙ্গে সম্পর্ক করে বলেন-রোকনে ইরামনী, রোকনে শামী ও রোকনে ইরাকী! কিন্তু এখানে রোকনে নজদী বলে হুজুরে পাক (সঃ) কা'বা শরীফের দিক চিহ্নিত করেন নি। কারণ নজদীগণ প্রকৃত "কা'বা" পন্থী ছিলনা।



মহানবী (দঃ) এর ইসলাম প্রচার কালে কা'বা শরীফের চতুর্দিকের কাকেররা ইসলামী আদেশে মুক্ত হয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। আর মক্কা হতে দূর দূরান্তের অবস্থানরত আধিবাসীরা ইসলাম প্রবর্তক মোহাম্মদ রাসুলুল্লাহ (দঃ) এর চরিত্র ও আদেশে মুক্ত হয়ে কালাম পাক-এর মহাবাণীতে উৎসাহ হইতে তারা "ওফদ" বা ইসলামী দল নাম ধারণ করতঃ মক্কা অভিমুখে রওজানা হয়। সে সময় তাঁদের কারো কারো মূখে উচ্চারিত হইল "ইয়া নবী আল্লাহ" আর কারো মূখে উচ্চারিত হইত। আজানের বাক্যাবলী: আল্লাহু আকবার। তারা দূরদূরান্ত হতে কা'বা শরীফের আগিনাতে উপস্থিত হয়ে হুজুরে পাক (দঃ)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করতঃ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন। এমন কি "নুসিবাইনের" জমীনি জাতি পর্যন্ত হযরত রাসুলে পাক (দঃ) এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে। কিন্তু কমবয়স্ক কোন নজদী হুজুরে পাক (দঃ) এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ইমান লাভ করে নাই। বরং নজদীগণ ঈমান লাভের পরিবর্তে ঈমানদারগণকে নিম্নমভাবে হত্যা করতো। এ কথার জলপথ প্রমাণ নজদের খীরে-মাউনাতে ৭০ জন ঈমানদার মোবারিজ হাফেজে কুরআন সাহাবাকে হত্যা করা ও "রজি" -এর ঘটনাতে হযরত খোবাইব (রাঃ) কে শূলিতে কুলিয়ে হত্যা করা। এই দু'টি ঘটনার বিস্তারিত আলোচনা বোখারী শরীফের মধ্যে বর্ণিত আছে। ইনশাআল্লাহ আমি ইতিপূর্বে এ দু'টি ঘটনার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি।

প্রকৃত পক্ষে নজদীগণ ছিল জন্মগত নাকরমান নাস্তিক ও কাকের। শির নবী হুজুরে পাক (দঃ) নজদ ও নজদীবাসীদের সম্বন্ধে কি কি অভিমত পোষণ করেন সে ব্যাপারে সহীহ সনদ পুস্ত্রে কয়েকটি হাদীস নিম্নে বর্ণিত হল।

(১) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ (رَضِيَ) عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَى الْكَافِرَ مِنْ هَاهُنَا حَيْثُ يَطْلُعُ لَوْنُ الشَّوْطَانِ (بَطَارِي - مُسْلِم)

(১) হাদীসঃ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন যে, শির নবী হুজুরে পাক (দঃ) বলেছেন, মূল কুফর বা প্রধান কাকের পূর্ব দিকে। অর্থাৎ মক্কার পূর্ব দিকে আরব ভূ-খণ্ডের অগ্রভূক্ত ঘণিত প্রদেশ "নজদ" অবস্থিত। রাসুলুল্লাহ (দঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী সৈন্যসেনাই কাকেরদের মূল ঘাটি অবস্থিত। অথবা ঐ এলাকাতে যারা বসবাস করছে তারাই প্রকৃত কাকের। কারন, তথাকারই তথাকথিত শৈখ নজদী শির নবী হুজুরে পাক (দঃ)-কে ঘৃণিত অবস্থার হত্যা করার জন্য আবু জেহেলকে কুপ্ররামশ দিয়েছিল। তাই শির নবী হুজুরে পাক (দঃ) যখনই পূর্ব-মুখী হতেন, তখনই তিনি পূর্ব দিককে অভিশপ্ত আখ্যায়িত করে বন্দোবস্ত করতেন।

মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) এই হাদীসটির দ্বিতীয় অংশে বলেন, ঐই নজদ হতে শয়তানের প্রারাল শিং এর আবির্ভাব হবে। দ্বিতীয় বাক্যটির মধ্যে "করনশ শয়তান" বা শয়তানের প্রথম শিং মিথ্যা নব্বুতের দাবীদার মুসারলামা কাক্জাব এবং দ্বিতীয় শিং দ্বারা মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর উদ্দেশ্যে উপরোক্ত বক্তব্য পেশ করেন। মহানবী হুজুরে পাক (দঃ)-এর এই ভবিষ্যতবানীটি ১৪শত বছরের মধ্যে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তব রূপ ধারণ করেছে। প্রথম শিং-কে দমন করা হয় হযরত আবদুবকর (রাঃ)-এর খেলাফত কালে। আধুনিক কালের শয়তানের শিং অর্থাৎ ১৮০১ইং তিহাবীরা সাউদ বিন আবদুল আজিজের নেতৃত্বে কারবালার পবিত্র ভূমি হতে হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর পবিত্র মাজার ভেঙ্গে দেয়। ১৮০৩ইং সালে মক্কা আক্রমণ করে কা'বা শরীফের গিলাপ ছিঁড়ে ফেলে। আম্বিয়া, আওলিয়া, সাহাবা কৈরামদের কবর ও মাজার সমূহ ভেঙ্গে ফেলে। ১৮০৪ইং মদীনা শরীফ আক্রমণ করে। এই পবিত্র স্থানটি ১৮১০ইং পর্যন্ত তিহাবীদের দখলে ছিল। তাদের অধীনে থাকা অবস্থায় তারা জায়াতুল বাকীর সকল মাজার সমূহ ভেঙ্গে চূরমার করে দিয়েছিল। এমন কি হুজুরে পাক (দঃ) এর রওজা পাকের উপরও ঘণিত কালো।



খাবা বিস্তার করেছিল। ওহাবীরা যে কুফরী কর্মে লিপ্ত হইয়াছিল তা পবিত্র কোরআনে ঘোষিত কাকেরগণও এরূপ অপকর্মে লিপ্ত হয় নি। বড় পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের এতশ্রমশীল দেওবন্দীগণও আবদুল ওহাব নজদীকে সংস্কারক বলে আখ্যায়িত করে আসছে। তারা তার প্রশংসা করে থাকে এবং তারই অভিমত সমূহকে সর্বাঙ্গিকভাবে সমর্থন জানিয়ে তার কুফরী জিহাদ কর্মের সাথে একাধতা ঘোষণা করেছে। এমন কি বর্তমানেও অনুরূপ আকিদা পোষণ করে চলছে। তাদেরই একটি শাখা হল বর্তমান ইলিয়াসী তাবলীগী সম্প্রদায়। তাই সরলপ্রাণ মুসলমান ভাইদেরকে তাদের অপকর্ম হতে দূরে সরে দাঁড়াবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

### নজদী পন্থীদের তায়্যুফ আক্রমণ

তারিফ আচমণের কুকর্ম ওহাবী ফেকা পন্থীদের অন্যতম কুকীর্তি। তারা এ পবিত্র স্থানটি করতলগত করে সেখানকার ইমানদার অধিবাসীগণকে নির্মম ভাবে হত্যা করতে থাকে। তাদের জুলুম সীমা অতিক্রম করে ছিল। তারা মারের সামনে শিশুকে হত্যা করেছে। একদিনের ঘটনা: এক স্থানে কতিপয় লোক কোরআন তেলাওয়াত করছিলেন ওহাবীরা তাদেরকে সেখানে হত্যা করে। অনেক মসজিদের মুসল্লিগণকে নামাজে রত থাকা অবস্থায় হত্যা করে। এই ভাবে তারা একদিনে ২৭০ জন মানুষকে হত্যা করেছিল। ওহাবীরা তারেকের বস্ত্র সমূহে আগুন ধরিয়ে দিইয়াছিল। শব্দ, তাই না এ ছাড়া ওহাবীদের আরো অনেক কুকীর্তি রয়েছে। ১২১৭ হিজরীতে এসব কুকর্ম সংগঠিত হয়। (নজদ ও হেজাজ ১৬২ পৃঃ)

(২) عن ابن عمر (رض) عن النبي صلى الله عليه وسلم  
الذي قال وهو مستقبل المشرق ان الفتنة هاجتنا  
(بخاري - مسلم)

আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি হুজুর আকরাম (সঃ) হতে হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন, একদা প্রিয় নবী হুজুরে পাক (সঃ) পূর্ব মুখী হয়ে অর্থাৎ নজদের দিকে ফিরে বলেছেন, এ দিক হতে ক্ষেত্রনা ফাসাদ আবির্ভূত হবে। এ পূর্ব দিক উল্লেখ করে হুজুরে পাক (সঃ) নজদকেই উদ্দেশ্য করেছেন, বিভিন্ন হাদীসের ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থে এরূপ মন্তব্য করা হয়েছে। (বোখারী, মুসলিম)

(৩) قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الكفر والفسوق  
المشرق والفخر والخيل والى أهل الخيل والابل -  
ولى رواه قال صلى الله عليه وسلم غلط القلوب  
والجفاء بالمشرق والايمن الى أهل الحجاز -

হযরত নবী করীম (সঃ) এরশাদ করেন, মূল কুফর পূর্ব দিকে এবং গর্ব ও অহংকার রাখালদের মধ্যে।

অন্য আর এক বর্ণনাতে রয়েছে যে, কঠিন অন্তর ও জুলুম অভ্যাসের পূর্ব দিকের লোকদের মধ্য থেকে আবির্ভূত হবে। আর “ইমান” হেজাজ এর বাসিন্দাদের মধ্যে থাকবে।

প্রিয় পাঠক। উপরোক্ত হাদীসদ্বয়ের দ্বারা নজদ ও নজদ বাসীদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝানো হয়েছে। কারণ গর্ব ও অহংকার এবং জুলুম ও অভ্যাস তাদের দ্বারা যেমন প্রকাশ পেয়েছে এরূপ আর কোন এলাকার লোকদের দ্বারা তা প্রকাশিত হয় নি।

(ম) قال النبي (ص) يخرج لاس من المشرق يقرؤون القرآن  
لا يجاوزوا اليهم يقرؤون من الدين كما يقرء الصوم من  
الرمية سماعهم التحليل -

হযরত নবী করীম (সঃ) করমান পূর্ব দিক হতে (অর্থাৎ নজদ দেশ হতে) একদল লোক বের হবে, তারা ঠিকই কোরআন পাঠ করবে, কিন্তু



কোরআনের মর্মার্থ তাদের কন্ঠনালীর নীচে অতিক্রম করবে না। অর্থাৎ কোরআনের অর্থ বৃদ্ধবেনা। তারা ইসলাম ধর্ম হতে এমনি ভাবে দূরে সরে পড়বে যেমন তাঁর ধনুক হতে ছড়লে আবার ফিরে আসে না। এসব লোকের সাধারণ লক্ষণ হল তাদের মাথা মূড়ানো থাকবে। ঠিক এই লক্ষণটি পরিলক্ষিত হয়েছে নজদবাসী মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নজদী ও তার অনুসারীদের মধ্যে।

**নোট :** আমাদের ত্রৈমাসিক তথাকথিত একদল মোবাস্লেগ জনসাধারণের মধ্যে খ্যাতি অর্জনের জন্য মাথা মূড়ানো ফেলে। তারা দাবী করে যে, তারা ই প্রকৃত ইসলামের অনুসারী। প্রকৃত পক্ষে তারা হল ইসলামের পরম শত্রু! আর্লাহ ও তাঁর রাসুলের শত্রু! তাই তাদের থেকে দূরে থাকা প্রত্যেক ইমামদারের একান্ত কর্তব্য।

(৫) عن ابن عمر (رض) مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في مدنا ومارعنا وفي مدمنتنا ثم استقبل مطلع الشمس فقال ما هنا مطلع لرن الشيطان ومن ما هنا الزلزال والفتن -

একদা হযরত নবী করীম (দঃ) আরবের শাম, ইরামন ইত্যাদি দেশের জন্য দোয়া করার পর মদীনার মাপ ভোলের যন্ত্রাদির জন্যও দোয়ায় বরকত করেন। অতঃপর তিনি পূর্ব মুখী হয়ে নজদের জন্য বরদোয়া করেন, আর বলেন এ দিক হতে শয়তানের শিং উদয় হবে। অর্থাৎ শরীরাত্ত বিগর্হিত কার্য কলাপ এবং মুসলমানদের মধ্যে বিভেদকারী ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি ও ভূমিকম্প শত্রু হবে। (বোখারী)

**প্রিয় পাঠক :** উপরোক্ত হাদীস দ্বারা নজদের অধিবাসী মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবের ওহাবী আন্দোলনের কথাই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ তারা সংস্কারের নামে ইসলামের মূলোৎপাটনের চেষ্টা করছে।

(৬) عن ابن عمر قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في مدنتنا قالوا وفي لجدنا قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي مدنتنا قالوا يا رسول الله وفي لجدنا فاطفئ قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها مطلع لرن الشيطان (بخارى)

অপর একখানা হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী করীম (দঃ) শাম ও ইরামনের বরকতের জন্য দোয়া করলে সাহাবাদের মধ্য হতে কেহ কেহ আরজ করল। “ইরাম-লাল্লাহ”। আমাদের নজদ সম্পর্কে দোয়া করুন। তখন হুজুর (দঃ) পূর্ববৎ আবারও শাম ও ইরামনের জন্য দোয়া করলেন। বর্ণনাকারী বলেন আমার ধারণা মতে হুজুরে পাক (দঃ) তৃতীয়বারে বললেন, এই নজদ হতেই ভূ-কম্পন এবং বিভিন্ন ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি হবে। এবং তথা হতেই শয়তানের শিং প্রকাশ পাবে। (অর্থাৎ সর্ব প্রকার শয়তানী প্রতিমত প্রকাশ পাবে। যা মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী কঠক প্রকাশ লাভ করেছে)। (বোখারী)



**প্রিয় নবী সাইয়্যেহুল মুরসালীন**  
**হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-সম্বন্ধে ওহাবী**  
**আদোলনের হোতা।**

**আবদুল ওহাব নজদীর কতিপয় কুকাতি**

- ১। শেখ নজদী নবী করীম (দঃ)-কে সংবাদ দাতা ডাকপিয়ন বলেছে। ধর্মের কুংসা করে, আরো সে বলেছে :
- ২। হোদাইবিয়ার সন্ধি একেবারে মিথ্যা ও বাতোরিট।
- ৩। হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ইহকালে ও পরকালে কারো কোন উপকারে আসবে না।
- ৪। চারি মাসহাবের চার ইমাম প্রান্ত ও মিথ্যা।
- ৫। শেখ নজদী দরুদ শরীফ বিরোধী ছিল। কারণ তার মতে দরুদ শরীফের কোন প্রয়োজন নেই।
- ৬। আজানের বাক্যে আশহাব, আমা মোহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ উচ্চারণকারী অনৈক মোয়াজ্জিনকে সে হত্যা করেছে।
- ৭। দালায়েল খাতিরাতে ও দরুনের কিতাব সমূহকে অশুদ্ধ করেছেন।
- ৮। ফৈহা, ভাকসীর ও হাবীসের গ্রন্থসমূহ জ্বালিয়ে দিয়েছেন।
- ৯। কোরআনের তরজমা ইচ্ছামত করেছে।
- ১০। সে কাকের মশরিক ও মুনাক্ককগণকে খাটি ইমানদার বলে আকীদা পোষণ করতো। এ কথার জুলন্ত প্রমাণ তার রচিত কাশ্শুশ্ শুবহাত ও কিতাবত জাওহীদ দুটি পুস্তক।
- ১১। সে যে কোন সম্মী আলিমকে হত্যা করা জায়েজ আকীদা পোষণ করতো।

- ১২। ইমানদার মুসল্লমানদের মালামাল লুণ্ঠন করতঃ জাকাতের নিয়মে ওহাবীদের মধ্যে তা বন্টন করতো।
- ১৩। মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী প্রকৃতপক্ষে কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলনা। তবে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেয়ার জন্য নিজেকে হাম্বলী মাজহাবের অনুসারী বলতো।
- ১৪। শেখ নজদী বাদ নামাজ দোরা করা হারাম আকীদা পোষণ করতো। আর বলতো-নামাজের পর দোরা করে আল্লাহ হতে মজরী জওয়ারই সামীল।

**নোট :** প্রিয় পাঠক বৃন্দ ! আমাদের দেশের বর্তমান দেওবন্দী ও আরেজীগণ অধিকাংশ উপরোক্ত আকীদার অনুসারী। কতিপয় ওহাবী আজও মিলাদকে হারাম বলে এবং আজানের বাক্যের মধ্যে মোহাম্মাদুল রাসুলুল্লাহ বাক্য প্রবণ পর চক্ চন্দন নীতিতে নাজাজেজ বলে।

**ফতোয়ায়ে শামীতে ওহাবী আদোলনের**  
**মঠিক দিক দর্শন।**

(রদখুল মুহতার ৪২৭-২৮ পৃষ্ঠা)

كما وقع في زماننا في الباع عبد الوهاب الشامي  
غرجوا من لجة والغلبوا على الحرمين وكالوا بمتحلون  
مذهب الحنابلة لكنهم اعتقدوا انهم هم المسلمون  
وان من خالف اعتقادهم مشركون - واستباحوا بذلك  
قتل اهل السنة وقتل علمائهم .

ইসলামের সু-প্রসিদ্ধ ফতোয়ার কিতাব শামী কিতাবের লেখক



আললামা শামী (রাঃ) মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর আকীদা বিশ্বাস সম্বন্ধে এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সমস্ত ওহাবীদের আকীদা বিশ্বাস প্রায়েরা আকীদা বিশ্বাসের অবিকল অনুরূপ ছিল। অর্থাৎ তারা হযরত আলী (রাঃ) ও মাযিরার মধ্যে সিক্কিনের যুদ্ধ চলাকালে হযরত আলী (রাঃ) এর মতাদর্শের একেবারে বিরোধী হয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত প্রায়েরা ফেরা হযরত আলী ও মাযিরার (রাঃ) উভয়কে কাফের বলে অভিহিত করেছে। যেমন আজ কাল মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর ওহাবী ফেরা দুনিয়ার সকল মানুষকে কাফের নামে আখ্যায়িত করতেছে। এরা আরব ভূখণ্ডের নজদ হতে আত্ম প্রকাশ করে। (প্রথমে তারা ১৮০১ ইংরেজী সনে কারবালা ও মুজা শরীফ আক্রমণ করে। এবং কাবা ঘরের গিলাফ ছিঁড়ে ফেলে। অতঃপর ১৮০৪ ইং সনে মদীনা শরীফ আক্রমণ করে সেখানকার মাজারসমূহ ধ্বংস করে ফেলে।)

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী হাম্বলী মাহহাবের অনুসারী ছিলনা। তথাপিও সে মনিয়রিক বোকা দৈয়ার জন্য নিজেকে হাম্বলী মাহহাবের অনুসারী বলতো। তার দ্রাভ আকীদার মধ্যে একটি আকীদা এই ছিল যে, তার বিশ্বাসীরাই শূন্য, মুসলমান, যারা তার বিরোধিতা করবে তারা কাফের ও মশরেকী তার এই নীতিমালা অনুসারে সে ওলামায়ে আহলে সুন্নতকে হত্যা করা জায়েয আকীদা পোষণ করতো।

### তাকসীরে সাবীর ভাষ্যে ওহাবী ফেরা

(তম্ব খণ্ড ২৫৫ পৃঃ)

لَوْلَهُ تَعَالَى : اَلْحَمْدُ زَمَنَ لَدُنْهُ عَمَلُهُ " هَذَا الْاِيْمَةُ  
لَرَلَتْ لِي الْخَوَارِجُ الذِّمَّةُ بِحَرَمِ الْوَلَدِ وَبِلِ الْكِتَابِ وَالْمِلَّةِ

وَيَسْتَعْلَمُونَ بِذَلِكَ دِمَاءَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَمْوَالَهُمْ كَمَا هُوَ  
مَشَاهِدُ الْاَنْ لِي لِقَائِهِمْ وَهُمْ لِرُقَّةِ لِي اَرْضِ الْحِجَازِ  
يَقَالُ لَهُمُ الرُّهَابِيَّةُ بِحُصُونِ الْوَهْمِ عَلَى ثَلَاثِ الْاَلْوَمِ مِم  
الْكَاذِبُونَ وَاسْتَحْوِذُوا عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ لَالْمَا هُمْ ذَكَرَاهُ  
اُولَئِكَ حَرْبُ الشَّيْطَانِ اِلَّا اِنْ حَرْبُ الشَّيْطَانِ هُمُ الْطَا  
سِرُونَ -

উল্লেখিত আয়াতটির ব্যাখ্যায় সুবিখ্যাত তাকসীরে সাবীর গ্রন্থকার বলেন  
“প্রত্যেকের কু-কর্মই নিজের জন্য সুন্দর” এ আয়াতটিতে প্রায়েরা ফেরার  
কথা ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই ফেরার সাধারণ পরিচিতি হল এই যে, তারা  
কোরআনের বিকৃত অর্থ করে এবং কোরআন ও হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা  
করে। যদ্বারা মুমেন মুসলমানদের জ্ঞান মাল নষ্ট করা তারা বৈধ মনে  
করে। বর্তমানে যার প্রচলিত প্রমাণ নিদর্শন হয়ে আছে। তাদের পরিচিতি  
এই যে, উহার হিজাজ ভূমির একটি ফেরা, যাদেরকে ওহাবী বলা হয়।  
ওহাবীরা নিজেদেরকে বড় ধন্য মনে করে, প্রকৃতপক্ষে তারা বড় মিথ্যাবাদী।  
তাদের উপর শরতান সওয়ার হয়ে রয়েছে। তাই তারা আল্লাহকে ভুলে  
বসেছে। ওহাবীরা শরতানের দল। হে মুমেনগণ! তোমরা শরতানের  
দল হতে সতর্ক থেকে। তারা পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

নোট : “সাবী” ও শামীর মন্তব্য প্রায় একই সমান। আমরা  
ওহাবী ফেরা সম্বন্ধে কোন তথ্য প্রকাশ করতে চাইনা, তবে উপরে উল্লে-  
খিত কিতাব দুটিতে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তার উপর আমাদের পূর্ণ  
বিশ্বাস।

### দেওবন্দী ফতোয়ায় ওহাবী পরিচয়

ফতোয়ায়ে শামীর ও তাকসীরে সাবীর বর্ণনা মতে আমরা বক্তে  
প্রায়েরা যে, ওহাবী আকীদা বিশ্বাস ছিল প্রায়েরা নাপাক। তবে কতিপয়



দেওবন্দী প্রাণিক প্রাপ্ত আলিমগণের নিম্ন কতোরাগম্হ ফতোয়ায়ে শামীর  
ত্রিকোরেই বিপরীত। যেমন ধরুন :

১। ওহাবী পন্থী হেকিমুল উম্মত আশরাফ আলী খানভী সাহেব  
উম্মত বাকো বলেন : **لجدي مائة من عائلته يخدمونه** নজদীদির  
আকীদা বিশ্বাস বড় পাকা পোক্ত ও মজবুত ছিল। **لجدي مائة**  
**من عائلته**। নজদী আকীদা বিশ্বাস বড় ভাল ছিল।

২। দেওবন্দ মাদ্রাসার বড় মুরব্বী রশিদ আহম্মদ গঙ্গুহী সাহেব  
উম্মত বাকো বলেন : **لجدي مائة من عائلته يخدمونه** নজদীগণ নীতিক রাসুলে করীম (দঃ) এর সম্বন্ধের অনুসারী ছিল এবং  
তারা বড় বীনদার ছিল-নাউজ্জ্বিল্লাহ। (ফতোয়ায়ে রশিদিয়া দেখুন)

গঙ্গুহী সাহেব ফতোয়ায়ে রশিদিয়াতে উৎকল্য ও গৌরব সহকারে  
আরো বলেন : **نجدীগناهك وهاوى بلاءهم**। তাদের আকীদা  
বিশ্বাস অত্যন্ত ভাল ছিল। (আসতাগাফিরুল্লাহ)

৩। সকল দেওবন্দীর অভিমত : প্রত্যেক দেওবন্দী  
এক বাকো নিম্ন অভিমত পোষণ করে : যদি কেউ কাউকে ওহাবী বলে  
তাতে কোন খারাপ অর্থ বুঝাবেনা। কারণ ওহাবী আকীদা ও নজদী  
আকীদার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

আদিকাল থেকে নজদীগণের আকীদা পাকিপোক্ত। মাযহাবের  
দিক দিগে তারা হানাফী। (আল-মুহাম্মাদ)

৪। আশরাফ আলী খানভীর ওহাবী বানানোর মারাত্মক প্রচেষ্টা।  
তিনি 'ইফাযা' নামক পুস্তকের ৩য় খণ্ডে ৬১ পৃষ্ঠার ৮ম লাইনে লেখেন :

**میں لو کہتا ہوں کہ اگر میرے پاس دس غزار روئے  
ہو صبح کی لفظوں کو کہوں بہر غود غی سب وہاں ہی  
جائیں**

খানভী সাহেব বলেন : ওহাবী মাযহাব আমার মনোপ্রসূত মাযহাব।  
আমি আশরাফ আলী বলছি যে, সেই মাযহাবের প্রচার ক্ষেত্রে যদি আমার  
দশ হাজার টাকা খরচ হয় তাতে আমার অসম্মতি নেই। আমার উদ্দেশ্য  
হল হিন্দুস্থানের সকলেই যেন ওহাবী পন্থী হয়ে যার। এ উম্মত বাকো  
খানভী সাহেব ওহাবী মাযহাবকে কড়। সমর্থন দিয়েছেন।

**নোট :** পাঠকবৃন্দ ওহাবীদের ভাল মন্দ আকীদা নিয়ে আমরা  
বিতর্কে উপনীত হতে চাই না। তবে কতিপয় দেওবন্দী ও অন্যান্য ইমাম-  
দার ওলামায়ে কেরামগণ তাদের সম্বন্ধে যা মন্তব্য করেছেন আমাদের বক্তব্য  
ঠিক তাই।

## দেওবন্দী ফতোয়ার জবাবে ওলামায়ে হারামাইন

ওহাবী ফেকর সমর্থনে দেওবন্দীগণ একটি কিতাব রচনা করেন যার  
নাম রাখা হয় তাকবিয়াতুল ইমান। এই কিতাবখানা রচিত হওয়ার পর  
তারা মক্কা মদীনীর ওলামায়ে কেরামদের খেদমতে পেশ করেন তাদের থেকে  
কিতাব খানার সমর্থন আদায় করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মক্কা-মদীনীর  
ওলামায়ে কেরামগণ তাকবিয়াতুল ইমান অর্থি ওহাবী নীতিমালা  
সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করেন যে, ইহা একটি কুফরী ও ধর্মনাশা কিতাব।  
যেমন বলেন :

**لا شك اني بطلان منقول من فتوى الامان بكونه  
مواالللجدة ماخوذا من كتاب التوحيد للقرن**



الشيطان ومولك هذا الكتاب دجال كذاب استحق  
اللعنة من الله تعالى وسلا لكتنه واولو العلم وسائر  
العالمين .

ইসমাইল বেহলভী যে তাকবিরাতুল ইমান নামক তথ্য কথিত পুস্তক  
রচনা করেছেন উহা নিসন্দেহে নজদী আকীদা মোতাবেক লেখা হয়েছে  
এবং ইহা শরতানের শিঃ (মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবের রচিত) কিতাব  
এরই অবিকল ফটো। এ কিতাবখানার রচয়িতা দাম্জাল ও কাব্যাব অর্থাৎ  
ফৈয়সা সৃষ্টিকারী ও মিথ্যাবাদী লালুতের উপযোগী ছিল ইত্যাদি।

ওহাবী ফেকার বিরুদ্ধে ওলামায়ে দেওবন্দ।

১। "নিহাব সাকিব" ৩৭ পৃষ্ঠার জনাব হোসেন আহাম্মদ মদনী  
সাহেব (রঃ) বলেন, মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর প্রশংসা সম্বলিত  
পুস্তকাবলী গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ওহাবী ফেকার একটি বিশেষ বাতিল  
ফেকার। এ ফেকার কোন সুনির্দিষ্ট মাহাব ছিলনা। তারা মাহাবহীন  
ধর্মহীন ও ধর্মহীন ছিল। তাদের আকীদা বিশ্বাস ছিল বদ ও ফাসেদ।  
হোসেন আহাম্মদ মদনী সাহেব আরো বলেন যে, তারা এই ফেকার অনু-  
স্বরণ করবে তারা নিসন্দেহে ধর্মহীন।

২। তৎকালে ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলোচক জনাব আনওয়ার  
শাহ কান্দহারী সাহেব ফরজুলবারী কিতাবে ১৭১ পৃষ্ঠায় মুহাম্মদ বিন  
আবদুল ওহাব নজদীর সম্বন্ধে নিম্ন মন্তব্য করেন :

اما محمد بن عبد الوهاب النجدى كان رجلا مليدا  
قلوب العلم كان يتسارع الى الحكم بالكفر (فوض  
البارى عليه السلام)

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী একজন লম্পট লোক ছিল।  
তার জ্ঞান ব্যক্তি ছিল অতি সামান্য, সে মুসলমানকে কাকের বলার মধ্যে  
ছিল তীক্ষ্ণ। ফরজুলবারী পৃষ্ঠা নং ১৭১।

নোট : আলামা আনওয়ার শাহ দেওবন্দী (রঃ) যে মন্তব্য  
করেছেন তা আমাদের বিশ্বাসযোগ্য। কারণ আমরা ব্রিটিশ গোরেন্দা  
হাম্ফ্রেস ভারতী খানাতে অনুরূপ মন্তব্য পেয়েছি। কারণ মুহাম্মদ বিন  
আবদুল ওহাব নজদী সাহেব চরিত্রহীন। সুফিয়ার বাতী কলে আবদুল হক  
মুতা বিবাহ পালন করে, সে প্রসঙ্গে তিনি সুফিয়ার হাতে পানি মিশ্রিত  
শরাবও পান করেছিল। এই শরাবী ব্যক্তি দেওবন্দীগণের নিকট ধীনদার  
ধর্ম প্রাপ্ত ছিল। (নাউজ্, বিন্লাম)

দেওবন্দ মোনাজ্জিদা বিভাগের প্রধান  
মুফতী মোরতাজা হোসাইনের ভাষে  
ওহাবী ফেকার

জনাব মুফতী মোরতাজা হোসেন দেওবন্দীকে জিজ্ঞাসা করা হল যে,  
প্রত্যেক দেওবন্দী আলেককে কেন কাকের, ধর্মহীন বলা হয়? অথচ  
তাদের ধর্মীর খেদমত প্রসিদ্ধ। তারা হিন্দুস্থানের মধ্যে বহু মাদ্রাসা মন্তব্য  
প্রতিষ্ঠা করেছেন। কোরআন ও হাদীসের উপর বহু গ্রন্থ রচনা করেছে।  
এ ছাড়া তারা নামাজ রোজা পালনে বড় পাকা ছিলেন। তদন্তের তিনি  
বললেন :

جوشخص نماز وروزه کی ادائیگی کے ساتھ ٹھیک  
اسلام کے لئے اور بیک بھنچے جائے اور دعوائے  
ایمان کے ساتھ الہما کو کالیاں دیتا رہے اور خیر  
ریات دین کا الکار کرے اور اجتماع امت کا مخالف ہو وہ



৪। ইসমাইল বেহলভী সাহেবকে গাছরুপ্লাহর জন্য এলমে গারেব এর একেবারে লিখাসী নয়। তিনি বলেন যদি কেহ এক বিন্দু, বরাবর এলমে গারেব যে, গাছরুপ্লাহর জন্য সাবস্ত করবে সে কাফের মশরিকের তুল্য হবে বলে তার রচিত পুস্তক তাকবিয়াতুল ইমানে লিপিবদ্ধ করেন।



মুফতী শফী সাহেব বলেন, যারা এরূপ নবী করীম (দঃ) এর কুৎসা করে তারা নিঃসন্দেহে কাফের ও ধর্মচ্যুত, এরূপ ধর্ম কুৎসাকারীর সাথে ইসলামী মোদ্রামেলা, আদান প্রদান শাদী বিবাহ বৈধ নয়।

## নবীর কুৎসাকারীর শাস্তি

প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এর কুৎসাকারীর শাস্তি সম্বন্ধে শেফা শরীফ ২য় খণ্ড ২০৭ পৃষ্ঠায় নিম্ন কতোরাটি বর্ণিত হয়েছে :

যদি কোন ব্যক্তি নবী করীম (দঃ)-কে গালমন্দ করে অথবা তাঁকে কোন কাজে কমে' দোষারোপ করে অথবা তাঁর শারীরিক গঠনতন্ত্রের ত্রুটি বর্ণনা করে অথবা তাঁর প্রবর্তিত ইসলাম ধর্মের ও বংশ চরিতাবলীর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে অথবা কেহ হযরত নবী (দঃ)-কে এমন কোন বস্তুর সাথে তুলনা বা উপমা দেয় যদ্বারা তাঁর প্রতি কুৎসা বা তাঁর মর্যাদার হানী হয় অথবা তাঁর মর্যাদাকে হেয় করে দেখানো হয় তাহলে এরূপ ব্যক্তিকে ধর্ম অবমাননাকারী বলা হবে। ধর্ম অবমাননাকারীকে হত্যাকরা প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মুসলমানের জন্য ওয়াজিব।

শেফা শরীফের ৪র্থ খণ্ডের ৩৩৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি নবী করীম (দঃ) হতে নিজ বা অপরকে বিজ্ঞ জ্ঞানী ধারণা পোষণ করে সে যেন তাঁকে গালমন্দ করল। এরূপ ধর্ম কুৎসাকারীকে হত্যা করা ওয়াজিব।

اجمع العلماء على ان شاتم النبي صلى الله عليه وسلم  
والمشتق من كافر مرتد والوعيد عليه جار بعد اب  
الله له وحكمه عنه الامة القتل من شك في عذا ابد وكفره  
فقد كفر لان الرضا بالكفر كفر (الموسم الروافض نج  
باب الاول - ٣٢٨ - )

ওলামায়ে কেরামদের ঐক্যমত এই যে, হযরত নবী করীম (দঃ)-এর সমালোচক কুৎসাকারী কাফের। তাদেরকে হত্যা করা ওয়াজিব। যদি কেহ তাদের কাফের হওয়ার মধ্যে সন্দেহ পোষণ করে সেও কাফের হিসেবে গণ্য হবে। কেননা কুফরী কমে'র সমর্থকও কাফের।

প্রিয় পাঠক : দেওবন্দী ওহাবী আকীদা পোষণকারীগণ এই কতোয়ার আওতাভুক্ত কিনা প্রত্যেক পাঠক তা ভেবে দেখুন। আমরা তাদেরকে কাফের বলতে চাই না, তবে তাদের লিখিত কতোরা দ্বারা তাই তারা নিজেরা কাফের হিসেবে সাবাস্ত হতে সক্ষম কিনা? তা আপনারাই বিচার করুন।

## দেওবন্দীগণের তওবাবন্দী

অনেক ইসলামী কতোয়ার দেওবন্দীগণকে কাফের ও ধর্মচ্যুত নামে আখ্যায়িত করা হয়। এরা প্রকৃতগতঃ কারা? সকল দেওবন্দীরাতো কাফের হওয়ারটা অসম্ভব ব্যাপার। আশ্চর্য্য আনওয়ার শাহ্ কান্দহারী, শিববির আহম্মদ ওসমানী ও হোসেন আহম্মদ মাদানীর মতো আরো অনেক প্রখ্যাত প্রখ্যাত আলেমগণওতো দেওবন্দী ছিলেন। এরাতো সন্ত আকীদা পোষণকারী দেওবন্দীগণকে ঘৃণা করতেন। তাঁরা দেওবন্দ মাত্রাসা হতে নজদী ওহাবী আকীদা উৎখাত করার জন্য আশ্রয় চেষ্টা করে গিয়েছেন। তাঁরা কোন দিন কাফের ছিলেন না।

দেওবন্দ মাত্রাসার প্রণিক্ত এক সংঘবদ্ধ দল মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর সন্ত নীতিমালাকে ভারত উপমহাদেশে প্রচারের এক কণিণ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

দেওবন্দীদের উপর অনেক কতোরাতে কুফরী ও ধর্মচ্যুতীর বিধান জপি'ত হয়েছে। আবার দেওবন্দীদের মধ্যে অনেক আলেম নজদী ও



তহাবী নীতিমালাকে বর্জন করে তার বিরুদ্ধে ফতোয়াও রচনা করেছেন। যেমন আলামা আনওয়ার শাহ্ কাস্মীরী শিবির আহম্মদ ওসমানী ও হোসেন আহম্মদ মাদানী প্রমুখ।

আবার দেওবন্দ মাদ্রাসাতে এমনও কতিপয় লোক ছিল যারা নজদী নীতিমালাকে ভারত উপমহাদেশে রূপান্তর করার জন্য আগ্রহ চেষ্টা চালিয়ে ছিল। যেমন ইসমাইল দেহলভী, কাশেম নানুতভী, রশিদ আহম্মদ গুজরাহী, বলিল আহম্মদ আম্বুটি, আশরাফ আলী খানভী প্রমুখ।

দ্বিতীয় ধরনের দেওবন্দীগণ নিজ নিজ অপকর্ম হতে তওবা করে ছিলেন কিনা এই বিষয়ে আশরাফ আলী খানভীকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি এ উদ্দেশ্য বাক্যটি উচ্চারণ করেন :

هم لى اجتنك كسى كتاب وتحرير من الكنى قوله  
هرگز نه ديگه -

অর্থঃ আমি আজ পর্যন্ত কোন কিতাব বা লিখনীর মধ্যে দেওবন্দী-গণের কখনও তওবা করেছে বলে দেখিনি।

জনাব রশিদ আহম্মদ গুজরাহীকে ইসমাইল দেহলভী কতৃক রচিত তথাকথিত "তাকবিয়াতুল ইমান" পুস্তক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। অর্থঃ এই পুস্তকের মধ্যে অনেক ধর্মনাশা উক্তি ও কুফরী কালামে পরিপূর্ণ। তাই অনেকের ধারণা যে, ইসমাইল সাহেব নিজ অপকর্ম ও কুফরী কালাম হতে তওবা করে মৃত্যু বরণ করেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে।

জনাব রশিদ আহম্মদ গুজরাহী জবাব হিসেবে বলেন।

لوجه كونا ان كا بعض ضائل من بعض المترا. هي  
اهل به عت كا - (لتوى رشيد به)

অর্থঃ ইসমাইল দেহলভী যে তাকবিয়াতুল ইমান পুস্তকের কতিপয় বিষয় হতে তওবা করে ছিলেন অভিমতটি বেদগাতীদের মিথ্যা গুজব।

এ ছাড়া আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ওলামাগে কেবাম ইসমাইল দেহলভীর তওবা করে মৃত্যু বরণ করা বা তওবাহীন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করা বিষয় নিয়ে বিমত পোষণ করেন। যারা বলেন ইসমাইল দেহলভী তওবাহীন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে তাঁদের নাম যথাক্রমে এই :

- ১। মাওলানা আব্দুল কালাম আজাদের পরনানা আলামা মনওয়ার উদ্দিন দেহলভী।
- ২। আলামা মাখসু সুল্লাহ, (শাহ আবদুল আজিজ মোহাম্মদেই দেহলভীর প্রাতুষ্পুত্র)
- ৩। আলামা মূসা সাহেব (শাহ রফিউদ্দিন দেহলভীর পুত্র)
- ৪। আলামা ফজলে রাসুল ওসমানী (রহঃ)।
- ৫। আলামা ফজলুল হক খাররাবাদী (রহঃ) (অগ্রনায়ক আজাদী আন্দোলন)
- ৬। আলামা আহমদ রেজাবানের পীর সাহেব।



# নজদী পরিচয়

ব্রিটিশ সম্রাটের গোয়েন্দা অফিসার

মিঃ হামফ্রেসের ডায়েরীতে

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর ইমান

আকীদা ও চরিত্র।

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ, ইসলাম ও মুসলিম বিশ্বের মধ্যে ফাটল ধরাবার উদ্দেশ্যে বহু ভাবাবিদ 'মিঃ হামফ্রেস' কে গোয়েন্দা নিযুক্ত করে। হামফ্রেসের ডায়েরীতে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর ইমান, আকীদা ও চরিত্রাবলীর কথা উল্লেখ রয়েছে। "হামফ্রেস" উক্ত ডায়েরী খানা দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় জার্মানীদের হস্তগত হয়। তখন জার্মান পত্রিকা "ইসপিগল" ডায়েরী খানা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করে। এতে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর ইমান, আকীদা ও চরিত্রাবলীর সন্মত ভাবে জানা যায়।

"হামফ্রেস" ডায়েরী খানাতে মিঃ হামফ্রেস বলেন, আমি যখন তরখানের গোয়েন্দাগিরীতে নিয়োজিত ছিলাম তখন একজন মুসলিম ধর্ম সংস্কারক লোকের সাথে আমার সাক্ষাত হয়। সেই ব্যক্তি তুর্কী, কাসী ও আরবী ভাষায় কথা বার্তা বলতে পারতেন। তিনি দীনীতালেবে ইলমেদর পোষাক পরিধান করে এ দিক সে দিক বেড়াতেন। তিনি বড় উজ্জ্বলদেহী উক্ত মর্যাদাকাণ্ডী ব্যক্তি ছিলেন। মিঃ হামফ্রেস তার পরিচিতি চাইলে, তিনি অত্যন্ত অহংকারের সাথে বললেন, আমি মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী। নজদী সাহেব তৎকালীন তুরস্কের ওসমানী সরকারের প্রতি

অত্যন্ত ঘৃণা পোষণ করতেন। তার দৃষ্টিতে হানাকী, শাফেরী ও মালেকী মাযহাবের কোন মর্যাদা ছিলনা।

নজদী সাহেবের বক্তব্য হল : আশ্চর্যের কারণে বা আছে তাই আমল যোগ্য। মিঃ হামফ্রেস বলেন নজদী সাহেব প্রয়োজন হলে নিজ অভি মতের পক্ষে ইমাম ইবনে 'তারমিয়ার' মতামত প্রমাণ হিসেবে পেশ করতেন। আশ্চর্য্য, সাহাবা ও আওলীয়ায়ে কেরাম তার নিকট ছিল অতি তুচ্ছ। মিঃ হামফ্রেস ভেবে দেখলেন যে, নজদী সাহেবের মত স্বাধীনচেতা লোক আমার দরকার। এরূপ লোক দ্বারা ইসলামী সমাজে ফাটল ধরানো সহজ হবে। তাই তিনি নজদী সাহেবকে তরখানের ডাক বাংলায় আমন্ত্রণ করেন। নজদী সাহেবও আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।

## তরখানের ডাক বাংলায় মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর দাওয়াত

মিঃ হামফ্রেস আমন্ত্রণে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী তরখানের ডাক বাংলায় নিম্নোক্ত সময়ে উপস্থিত হন। যে দিন নজদী সাহেব ডাক বাংলায় উপস্থিত হন সে দিন ডাক বাংলার খাবার টেবিলে শিরা তর্ক-বিব শেষ জাওয়ার কুসুমী সাহেবও উপস্থিত হন। মিঃ হামফ্রেস উক্ত ধর্ম সংস্কারককে খাবার টেবিলে খাবার দেন। খাবার মধ্যে দু'জন সংস্কারক পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে তর্কে লিপ্ত হন। কারণ ওহাবী ও শিরা মত-বাদের মধ্যে মাযহাবী মতভেদ ছিল অনেক।



খাবার পর শেখ জাওরাদ মিঃ হামফ্রেকে গোপনে বলল : এই নজদী সাহেব ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্যাবলীকে কার্যকরী করার জন্য উপযোগী হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তাকে যেভাবেই হউক কাব, করতেই হবে। তাই শেখ জাওরাদ ক্রমে ক্রমে নজদী উজ্জ্বলীলাসী, আবদুল্লাহরীকে জড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করে। এমনকি শেখ জাওরাদ নজদী সাহেবকে ফাঁদে ফেলার জন্য তার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করল। সামান্য কিছু দিনের মধ্যে উভয় ধর্ম সংস্কারকের মধ্যে অস্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে উঠে।

শেখ জাওরাদ বলেন, আমি নজদী সাহেবের সঙ্গে কোরআন হাদীস নবী, সাহাবা ও আওলীয়ারে কেরামগণের সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য প্রস্তাব দিলাম। নজদী সাহেব এ প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

## শিয়া-ওহাবীর মধ্যে ধর্মীয় আলোচনার প্রথম দিনে।

“মৃত্তা বিবাহ” শিরোনামে শেখ জাওরাদ সাহেব মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীকে জিজ্ঞেস করলেন, হে নজদী সাহেব। মহিলাদের সাথে (মৃত্তা) অস্থায়ী বিবাহ করা সম্পর্কে আপনার রায় কি? নজদী সাহেব বললেন, মৃত্তা বিবাহ হারাম এতে কোন সন্দেহ নেই।

শেখ জাওরাদ সাহেব পাশ্চাৎ প্রশ্ন করলেন, যদি মৃত্তা বিবাহ হারাম হয়, তবে কোরআনে উহাকে জারাজ ঘোষণা দেওয়া হল কেন? যেমন সূরা নিসার ২৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, যদি তোমরা কোন মহিলার সঙ্গে মৃত্তা বিবাহ করতে ইচ্ছুক হও তবে তাদের মোহরানা আদায় করে দিও।

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী সাহেব পাশ্চাৎ উত্তর করেন, শেখ সাহেব! আশ্চর্য কোরআনের আসল অর্থ সকলের বুঝে বড় মুশকিল। কোরআনের আয়াত একেবারে নিজ স্থানে সঠিক আছে। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন, মৃত্তা হযরত রাসুলে পাক (সঃ)-এর যুগে প্রচলিত ছিল। এখন আমি উহাকে হারাম বলে ঘোষণা দিলাম। আজ হতে যদি কেই অস্থায়ী বিবাহে লিপ্ত হয়, আমি তার গদনি উড়িয়ে দিব।

শেখ জাওরাদ এই উত্তর শ্রবণে আশ্চর্যবিশ্বত হয়ে বললেন, হে ওহাবী সাহেব! আপনি কি হযরত ওমর (রাঃ)-কে অনুসরণ করেন? অথচ আপনি হযরত ওমর (রাঃ) হতে অধিক জানা! হযরত ওমর (রাঃ) এর কি কমতা আছে যে, সে আশ্চর্য ও রাসুলের বিধানকে নাড়াচাড়া করবে। আর আপনি অস্থায়ী বিবাহকে হারাম বলে ঘোষণা দিয়ে কোরআনের সিদ্ধান্তের বিপরিত করছেন। (আন্তায় ফিরুল্লাহ)

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী আমতা আমতা করে বললেন, আজ হতে আমি মৃত্তা বা অস্থায়ী বিবাহ বৈধ ঘোষণা দিলাম।

শেখ জাওরাদ উক্ত উত্তর পাওয়ার পর ওহাবী সাহেবের যৌন উত্তেজনাতে উৎক্লান্ত করতে লাগলেন। ওহাবী সাহেব যখন মৃত্তা বিবাহ বৈধ ঘোষণা দিলেন তখনও তিনি অবিরাহিত ছিলেন।

শেখ জাওরাদ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি মৃত্তা বিবাহ করে নিজের জীবন আনন্দদায়ক করতে চান?

নজদী সাহেব মাথা নাড়ি দিয়ে মৃত্তা বিবাহের সম্মতি দিলেন। অতঃপর শেখ জাওরাদ ওরাদা দিলেন যে, আমি ইহার একটা ব্যবস্থা করবো। “ইনশাআল্লাহ”। তবে শেখ জাওরাদের ভয় হল যে, ওহাবী সাহেব বসরার সূর্যোদয়ের ভয়ে ভীত হয়ে যার নাকি। কারণ সূর্যোদয় মৃত্তা বিবাহকে হারাম বলেন। শেখ জাওরাদ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবকে বললেন, তাই নজদী! আমার ওরাদা সঠিক পাবে এবং আমার প্রোগ্রাম একেবারে



গোপন থাকবে। এমনকি আপনি যে রব্বানীর সঙ্গে মৃত্যু করবেন তার নিকটও আমি আপনার নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করবোনা।

একথা বলার পর শেখ জাওয়ারদ বলেন, আমি মৃত্যুর খাবছার অন্য নির্দিষ্ট পাড়াতে চলে আসলাম। বসরাত ইংরেজ উপনিবেশ সরকারের পক্ষ হতে চরিত্র নম্বের জন্য খুস্টান এক সুন্দরী রমণী নিয়োজিত ছিল। সে মহিলার নিকট আমি সন্ধিচারে মৃত্যুর পরিকল্পনার কথা বললাম। সে মহিলা মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবের সঙ্গে মৃত্যু করতে রাজীও হল। তখন আমি সে মহিলার তথাকথিত নাম রাখলাম “সুফিয়ার” আর আমি মহিলাটিকে বললাম যথা সময়ে নির্ধারিত ব্যক্তিকে তোমার নিকট নিয়ে আসবে।

নির্দিষ্ট রাতে আমি মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী সাহেবকে সঙ্গে করে তথাকথিত সুফিয়ার নিকট পৌঁছে গেলাম। তিনি এক আশ-রফীর বিনাম্বরে সুফিয়ারকে মৃত্যু বিবাহ করলেন। অতঃপর অবিবাহিত যুবকের স্বাধীন চিন্তাধারার নতুন স্বাদ পান করলো সুন্দরী সুফিয়ার।

## মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী সুফিয়ার যাতাকলে পড়ল

শরাব পান : শেখ জাওয়ারদ ইরানী সাহেব মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীকে মৃত্যু বা অস্থায়ী বিবাহের নাগাল পাশে আবদ্ধ করার পর দিন আবার তার সঙ্গে ধর্মীয় আলোচনার বসেন।

এবার শেখ জাওয়ারদ নজদী সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, হে শেখ সাহেব শরাব সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি? এজিব, মালেক ও সুলতানমানের

মতো বন, উমাইয়্যার খলিফাগণসহ বন, আববাসগণওতো শরাব পান করতেন।

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন, হে শেখ জওয়ারদ! শরাব সম্বন্ধে এত কথার প্রয়োজন কি? শরাবের বিধান হল এই যে, শরাব হালাল তবে শরাবের নেশা হারাম। শরাবের নেশা হতে পরিধান লাভের জন্য হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) শরাবে পানি মিশিয়ে পান করতেন।

শেখ জাওয়ারদ যখন দেখলেন নজদী সাহেব শরাব বৈধ হওয়ার সম্বন্ধে নরম নরম ভাব পোষণ করছেন, তখন শরাবের কথাটা সুফিয়ার কানে পৌঁছাতে দিলেন। শেখ জওয়ারদ সুফিয়ারকে একথাটাও বলে দিলেন যে, মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবকে যত বেশী পার শরাব পান করিয়ে দিও।

পরের দিন মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী শেখ জওয়ারদকে আলোচনার পূর্বাঙ্কশে কানে কানে বললেন, ভাই! আজ সুফিয়ার সঙ্গে বড় আনন্দ পেয়েছি। কারণ সে আমাকে গত রাতে পেট ভরে শরাব পান করিয়েছে। শেখ জওয়ারদ বলেন একথাটা আমার মোটেই বিশ্বাস হয় না। তখন নজদী সাহেব বললেন, আপনি সুফিয়ারকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।

শেখ জওয়ারদ সুফিয়ারকে জিজ্ঞেস করলো কি ব্যাপার? সুফিয়ার শেখ জাওয়ারদকে দেখার সাথে সাথে বলতে থাকে গত রাতে আমার নতুন প্রিয়তম প্রাণ ভরে শরাব পান করেছে। এমনকি তিনি আখ্খারা হয়ে খলস খলস করে কাশতে কাশতে চিৎকার করতে থাকেন। শেষ রাতে তিনি আমার সঙ্গে কয়েক বার মাশগুলও হন। এখনও তার শরাবের নিশা কমেনি।

এই চরম ঘটনার পর মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী সাহেব সুফিয়ারকে পূর্বের চেয়ে অত্যন্ত আদর করতে থাকেন। আর প্রতিটি সপ্তাহে মৃত্যুর সময়সীমা বাড়তে থাকেন।

শেখ জাওয়ারদ বলেন, মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী সাহেব সুফিয়ার আদর সমাদরে মনমুগ্ধ হয়ে আমাকে আর একটি আনন্দময়



ঘটনার গোপন কথা বলতে শুরু করলেন যে, আমি ইসপাহানে ধর্ম সংস্কারের সময় সেখানে আবদুল করিম নামের এক ব্যক্তির সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়ে যায়। আমি সেই ব্যক্তির নিকট আমার সকল গোপন কথা বলতাম। সে আমার জন্য ইসপাহানে একজন অবিবাহিতা রমনীর সঙ্গে মৃত্যু বিবাহ করান। তবে ইসপাহানের মৃত্যুর বিবাহ হতে শেখ জাওহর ইরানী কর্তৃক বিবাহটি আমার নিকট অধিক আনন্দ দায়ক অনুভব হয়েছে। তবে আবদুল করিম সাহেব সিরাজ রাজ্যে আমার জন্য একটি রমনীর সঙ্গে মৃত্যু বিবাহের ব্যবস্থা করেছিল, সেই রমনীটি সুফিয়ার তুলনায় অধিক সুন্দরী ছিল। তবে মেয়েটি ইহুদী ছিল, তার নাম ছিল আসিরা।

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী সাহেব শেখ জাওহরদের নিকট এসব কথা গল্প স্বরূপ ব্যক্ত করে আনন্দ উপভোগ করতেন।

**ওহাবী মাযহাব স্বপ্নের মাযহাব :** শেখ জাওহর বলেন, আমি একদিন মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীকে একটি মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করি, যার বিবরণ নিম্নরূপ। এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে কুরসীর উপর উপবিষ্ট দেখি। তিনি উপস্থিত জনতাকে নমিসহত করছেন। সে মজলিসে অনেক বড় বড় আলেম ওলামা পীর বুর্জগানেদীন উপস্থিত ছিলেন যাদের কাউকে আমি চিনি না। তারা হুজুরে পাক (সঃ) কে ঘিরে বসেছেন। এমনতরকার আমি দেখি আপনি (নজদী) সে মজলিসে আসতে আসতে প্রবেশ করতেছেন। আপনার চেহারা হতে নূরের তাজাঙ্গী বিকশিত ছিল। যখন আপনি হুজুরে পাক (সঃ) এর সম্মুখে পৌঁছলেন, তখনই হুজুরে পাক (সঃ) কুরসী হতে উঠে আপনাকে সম্মান প্রদর্শন করলেন এবং হুজুরে পাক (সঃ) স্বয়ং নিজেই আপনার মাথা চুম্বন করলেন। তারপর তিনি বললেন, হে আমার একই নামের অধিকারী মুহাম্মদ (বিন আবদুল ওহাব) তুমি আমার এলেমের ওয়ারিশ, মুসলমানদের দীনকে বিধে প্রচার করার জন্য তুমি আমার বখাখ খলীফা রূপে চিহ্নিত। হুজুর

পাক (সঃ)-এর এই উপদেশবাণী শুনে আপনি (নজদী) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মানুষের কাছে আমার মনের কথাটি প্রকাশ করতে ভয় হয়। হুজুরে পাক (সঃ) বললেন, হে মুহাম্মদ নজদী! মানুষের ভয়কে অন্তরে স্থান দিবে কেন? তুমি যা কিছ, ভাবনা করছ তার চেয়ে তুমি অনেক বেশী মর্মানীল।

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী সাহেব, শেখ জাওহরদের এই বানোয়াট স্বপ্নের কথা শুনে আত্মহারা হয়ে গেল। তিনি ব্যর্থব্যর্থ শেখ জাওহরকে জিজ্ঞাসা করতে থাকে। ভাই তোমার স্বপ্নকি সলা এইরূপ সত্য হয়? জবাবে শেখ জাওহর তাকে বলেন, আপনি নিশ্চিতে থাকুন।

এই তথাকথিত স্বপ্নের পর হতে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবের মনে ওহাবী মাযহাব পতন দেয়ার আগ্রহ জন্মে। -এই ওহাবী মাযহাবটি পর-বর্তীকালে ওহাবী আন্দোলন ও সংস্কার নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

বর্তমানে আমাদের সমাজে অনেক লোক আছে তাদের সামনে "ওহাবী" কথা বললে, উহা জেনেও নাজানার ভান করে। আর বলে ওহাবী কে ও কারা আমরা জানিনা। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তারা ওহাবী নীতিমালা বোলআনার ঘরিশ আদা পালন করেন।

বড় আশ্চর্য হতে হয় যে, তারা ওহাবী চেনেনা তারা কি করে অকরে প্রকরে ওহাবী মাযহাব পালন করেন? আসলে তারা সব চিনে ও জানে। আসল কথা হল যে, ছুঁতে পেলেন দুরার পিটে। হেঁকিমুল উম্মত চিনেন, প্রথচ শাইখুল হিম্ব চিনেন না?



## ওহাবী আন্দোলনের ৬ দফা কর্মসূচী

ব্রিটিশ উপনিবেশিক পৃথবীসন মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী সাহেব ওহাবী মাযহাব পরিচালনার ক্ষমতা নিম্নে বর্ণিত ৬ দফা কর্মসূচী প্রনয়ণ কর দেন।

- ১। যারা মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর মাযহাবে সামীল হবেনা তারা এক বাক্যে কাফের। তাদের ধন সম্পদ ইচ্ছাকৃত সম্মান বিনষ্ট করা হালাল। তাদেরকে পশুর হাটে নিয়ে বেচা কেনা করা অপরিহার্য।
- ২। মর্ত্তিপূজা রহিত করার বাহানা করে কা'বা ঘরকে ধ্বংস করে দেয়া। মুসলমানকে হজরত থেকে বিরত রাখা এবং হজরত পালনকারীদের জান মাল লুণ্ঠন করার জন্য আরবের মাযাবর জাতিকে উত্তেজিত করা।
- ৩। আরব উপজাতি ওসমানিয়া (তুর্কী) খলীফার আদেশাবলী পালন না করা। খলীফার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে তাদের আসন হতে উৎখাত করা।
- ৪। নবী, সাহাবা, আওলীরা ও বৃজ'গাণে দীনকে অবহেলা করা।
- ৫। মুসলিমদেশ সমূহের মধ্যে মাযহাব প্রচারের নামে কেংনা ফাসাদ সৃষ্টি করা।
- ৬। কোরআন শরীফে যত নবী ওলীর বর্ণনা আছে তা মুছে দিয়ে সংক্ষেপে একটি নতুন আধুনিক কোরআন তৈয়ার করা।

ব্রিটিশ উপনিবেশিক মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী সাহেব বলেন, উপরে উল্লিখিত কর্মসূচী প্রনয়ণ করতে আমাদের অন্তত দু'টি বছর সময় লাগেছে।

১৯৪০ হিজরী সনের মাঝামাঝি সময়ে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী সাহেব আজীরাতুল আরবের মধ্যে তার নতুন ধর্মমত বোখবার জন্য চুড়াশ ইজ্জা প্রকাশ করে। তার মতাদর্শটিকে তার বক্তৃতা, বাস্তবদের মধ্যে প্রচার করে। যখন তার এই গোপন দাওয়াতের কথা আজীরাতুল আরবে প্রকাশ হয়ে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে তার শত্রু বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনকি তার ভাই শেখ সোলাইমান এই দ্রাস্ত নীতির প্রতিবাদ করার কারণে মদীনায় গিয়ে আশ্রয় পেরে থাকতে হয়েছিল। মদীনায় মালেকী, শাফে'রী মাযহাবের ইমামগণ রেসালা ও চিখ'নর মাধ্যমে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীকে সতর্ক করেছেন যে, তুমি তথাকথিত ধর্মমত প্রচার হতে ক্ষান্ত হও।

এই কঠিন মর্হুতে শেখ জাওরাদ ইরানী সাহেব নজদী সাহেবকে এই বলে শাসন দিলেন যে, আপনি বৈধ হাযাবে ন। কারণ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নবুতের প্রাথমিক দিনগুলোতেও এইরূপ কঠিন অংগু হয়েছিল। ইরানী সাহেব আরো শাসনা ও উপদেশ ব্যাখ্যা করেন : যখন আপনি নিজের ধর্মমত প্রকাশ করে ফেলেছেন, আর যারা আপন র নীতিমালায় বিরোধিতা করেন তাদেরকে হলে বলে ভলে তৌশলে বাধ্য করার চেষ্টা করেন। আমিতো আপনার সাথে আছি-ভয় করবেন না।

## ওহাবী ৬ দফার দুরাবস্থা

ব্রিটিশ কর্তৃক দেয়া ৬ দফা কর্মসূচী বাস্তবায়িত করতে গিয়ে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী সাহেব বড় দুরাবস্থায় পড়ে গেল। আজীরাতুল আরব ও তার চিরক্বে বড় শত্রুদের আন্দোলন বাড়ার শুরু গেল। এক দিন ১২ জন আরববাদী শেখ নজদীকে হত্যা করার লক্ষ্যে তার বাসস্থানে



প্রবেশ করে। শেখ জাওরাদ ইরানী সাহেব বলেন, আমি যদি তথ্য না থাকতাম তাহলে তারা মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীকে হত্যা করে ফেলত। আমি অতি প্রতারণার সাথে হতকেপ করে হত্যাকারীদের চোখকে নস্যাত করে ফেলি।

অবশেষে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী আমাকে বলল, ৬ দফার দৃষ্টি অন্যতম দফার প্রচার কার্য আপাতত বন্ধ রাখতে হবে। প্রথমতঃ কা'বাঘর ধ্বংস করা এত সহজ নয়। বিশ্ব মুসলিম উহা সহজে মেনে নিবেন না। এছাড়া হজরত পালনের কাজ বন্ধ করা বড় কঠিন ব্যাপার।

দ্বিতীয়তঃ নতুন কোরআন শরীফ আধুনিক তরীকায় লিপিবদ্ধ করা আরো কষ্টকর কাজ। কারণ ইস্তাম্বুলের শাসকগণ আমার উপর পূর্ব হতে বড় ন্যায্য রেখেছেন। ইবনে ওহাব বলল, আমি যদি কা'বাঘর ধ্বংস করি এবং আধুনিক কোরআন তৈরী করি তবে এতে তুর্কী ও সমানী সরকার আমার বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাবার সম্ভাবনা প্রবল রয়েছে।

শেখ জাওরাদ বলেন, মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবের উপরে উল্লেখিত যুক্তিগাথা কথাগুলো আমার ন্যায় সঙ্গত মনে হলো। তাই আমি তাকে দৃঢ়তার কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রচেষ্টাবন্ধ করে রাখার উপদেশ দিলাম। নজদী সাহেবও এতে সন্মত হলেন।

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী গোপনে গোপনে ৪ দফা কর্মসূচীর প্রচার কার্যে লিপ্ত থাকেন। তারপর ব্রিটিশ পুণর্বাগিন মন্ত্রণালয় সংস্থা নির্দেশ করলো যে, জাজীরাভুল আরবে ওহাবী আন্দোলনকে রাজনৈতিক ভাবে প্রচার করার প্রয়োজন রয়েছে। এই প্রয়োজনের খতিরে ব্রিটিশ সরকার নিজ সংস্থাকে নির্দেশ দিল যে, তোমরা মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ কর। সংস্থা গোপনে গোপনে মুহাম্মদ ইবনে সাউদকে ওহাবী নীতিমালায় ভক্ত করে নিল। তিনি সাউদী বংশের প্রথম বংশধর ছিলেন। তিনি ১১৪৭ হিজরী সনে

ওহাবী মাযহাব গ্রহণ করেন। অন্য দিকে তিনি ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ হতে নজদের শাসনকর্তাও ছিলেন।

ব্রিটিশ সরকার মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব ও ইবনে সাউদ উভয়কে তাকিদ করেন যে, ধর্মীয় বিষয়ের ফরসালার পূর্ণতার মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর উপর ন্যায় থাকবে এবং রাজনৈতিক বিষয়ের দেখাশুনা ইবনে সাউদ করবেন। ব্রিটিশ সরকারের উক্ত ফরমানিকে কার্যকরী করার জন্য নজদের "দারইরা" শহরকে কর্মস্থল ঘোষণা দেন। আর কেন্দ্রীয় সরকার হল স্বয়ং ব্রিটিশ সরকার।

## ৬ দফার সাথে আরো কয় দফা সংযোজন

ইংরেজ প্রণীত ৬ দফা কর্মসূচীর মধ্যে দৃষ্টি দফার বাস্তবায়ন কষ্টকর ও কঠিন মনে করে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব ও ইবনে সাউদ উক্ত ৬ দফার সাথে আরো কয়েকটি ধর্মশাসন দফা সংযুক্ত করল। উহা এই:

১। মহানবী রাসুলে পাক (সঃ)-এর রওজা শরীফ জিয়ারত উদ্দেশ্যে সফর সূচী গ্রহণ করা হারাম ও নিষেধ। যেমন ইবনে তাইমিয়া ৬২৬ হিজরী সনে রওজা শরীফ জিয়ারত করাকে হারাম ফতোয়া প্রদান করছিল। তাই ইবনে তাইমিয়াকে দামেশকের ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ গ্রেফতার করে অবশেষে তাকে দামেশকের কিলার কতল করা হয়।

২। হযরত নবী করীম (সঃ)-এর জীবদ্দশায় অচল মানু্য রূপে চিহ্নিত ছিলেন। সেক্ষেত্রে তাঁর থেকে কোন উপকারের আশা করা যায় না।

৩। হযরত নবী করীম (সঃ)-এর অশ্মের জ্ঞান বৃদ্ধি বলতে কোন কিছু ছিলনা। অর্থাৎ ইলমে গারেব বলতে তিনি কিছুই জানতেন না। গারেব জানার আকীদা পোষণ করা শিরিক। (এই কথার উপর সকল দেওবন্দী ঐক্যমত)।



- ৪। আশ্বিয়া, সাহাবা, খাউস কুতুবদের সঙ্গে মহাবত রাখা হারাম।  
(এ কথায় সকল দেওবন্দীর একমত)
- ৫। সাহাবা, আওলাদে হাসুল ও নবীদের কবর ভেঙ্গে দেয়া ফরজ।  
(বর্তমানে সাউদী সরকার এই ফরজটি মধ্যযথভাবে পালন  
করছে) যারা পবিত্র হজরত পালনের উদ্দেশে পবিত্র মক্কা ও  
মদীনা শরীফে গিয়েছেন তারা অবশ্যই তা স্বচক্ষে দেখেছেন।

**মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর  
ধর্মীয় সংস্কারের নামে রাজনৈতিক  
তৎপরতার অকৃত্রিম ইতিহাস।  
মুক্তি সংগ্রাম ঢাকা-বাংলা একাডেমী  
৩১/১/৮৬ ইং ১৭ই মার্চ ১৩৯২ বাং  
দৈনিক ইত্তেফাক প্রকাশিত।**

ডক্টর এ. আর মলিক "ব্রিটিশ নীতি" গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কয়েক দশক ধরে যে ওহাবী আন্দোলন ভারত উপমহাদেশের বংগীয় এলাকা থেকে শুরু করে সুদূর উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সব'ত ছড়িয়ে পড়েছিলো, এখনই আলোচনার সুবিধার্থে সেই ওহাবী আন্দোলনের গোড়ার কথা বলতে হয়।

ওহাবী আন্দোলনের প্রবর্তক ছিল মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব। তার জন্মতারিখ সম্বন্ধে মহত্বের রয়েছে। তিনি ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক

ভাবে অগারনের পর বিভিন্ন এলাকা পরিভ্রমণ কালে ইসলামের মনগড়া ব্যাখ্যান করেন এবং তাঁর ভাবায় শাসক কর্তৃপক্ষের সমালোচনার মূহুর হন। এ সময় আরবের অধিকাংশ এলাকাই তুর্কের সুলতানের অধীনে ছিল। তাই স্বাভাবিক ভাবেই মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবের এই সব বক্তব্য তুর্কী সুলতানের জন্য শুবই বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং অচিরেই তাকে অব্যাহত বাজি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। শুব, তাই-ই নয় তুর্কী শাসক কর্তৃপক্ষ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীকে সরকার বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে সিরিয়ার দামেস্ক শহর থেকে বহিস্কার করেদেন।

সাহিত্যিক "এলীউল্লাহর" মতে তিনি এই স্থান সেই স্থান পরিভ্রমণে বহুদিন অতিবাহিত করিয়া অবশেষে দেরইয়ার শহরার মুহাম্মদ বিন সৌদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহারই সাহায্যে তিনি বেদুইনদের সমঝারে একটি সশস্ত্র বাহিনী গঠন পূর্বক প্রথম সুযোগে তুর্ক সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এইরূপে অতি অল্প কালের মধ্যে মরু অঞ্চলে বিদ্রোহ করে নজদ প্রদেশে আবদুল ওহাব নজদীর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। মুহাম্মদ বিন সৌদের সহিত তার এক ভগ্ননিকে বিবাহ দিবে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব সমগ্র নজদের শাসন ক্ষমতা তার হাতে অর্পণ করে শুব, ধর্মীয় ব্যাপারে স্বাধীন স্বাধীন কর্তা হয়ে রইলেন। (মুক্তি সংগ্রাম বাংলা একাডেমী ঢাকা ১৯৭৮)

বাগদাদের তুর্কী শাসনকর্তা নজদের মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবকে দমন করার লক্ষ্যে ১৭৫৮ খ্রিঃ বিরাট সেনাবাহিনীর দল প্রেরণ করেন। কিন্তু যুদ্ধে তুর্কীবাহিনী পরাজিত হলে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব একটি নিরামিত সেনাবাহিনী গঠন করেন।

১৭৯১ সালে ওহাবীরা পবিত্র মক্কা নগরী আক্রমণ করে। কিন্তু সম্পূর্ণ সফল হতে পারে নি। ১৭৯৭ সালে তারা বাগদাদ আক্রমণ করে ইরাকের একটি এলাকা নজদের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।



প্রসংগতঃ উল্লেখ্য তুর্কী সুলতান এই ওহাবীদের কাষাকলাপে এতৌদুর বিরাগভাজন হয়েছিলেন যে, এদের হাঙ্গ পালনে নিষেধাজ্ঞা পর্যন্ত জারি করেছিলেন। এখানে আরো একটি ব্যাপার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবের অনুসারীরা সব সময়েই ইসলামের নামে নিজেদেরকে মুবাল্লেগ মুজাহিদ হিসেবে পরিচয় দিতেন। অন্যভাবে গোপনে গোপনে নিজেদের ভ্রান্ত মাহহাব প্রচারে রত থাকতেন।

১৮০১ সালে আবার প্রায় লক্ষাধিক ওহাবী মুজাহিদ পবিত্র মক্কা নগরী আক্রমণ করে। কয়েক মাস ব্যাপী এই যুদ্ধে মক্কা নগরী ওহাবীদের দখলে আসে এবং সে সময়ে তুর্কী শাসনের বিলুপ্তি ঘটে।

১৮০০ সাল নাগাদ ওহাবীরা পবিত্র মদীনী নগরীর উপর আক্রমণ পরিচালিত করে উহার উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করে। সাহাবা আওলীরা ও ওলামা কেরামদের মাজার ও সৌধ ভেঙ্গে দেয়। এমনকি রাসুলে পাক (সঃ) এর রওজা পাকের একাংশও তাদের হাত হতে রক্ষা পায় নি।

এদিকে পবিত্র মক্কা ও মদীনী নগরী দুটি হস্তচ্যুত হওয়ার তুর্কী খলিফা আবুই রাগান্বিত ছিলেন। এছাড়া ওহাবীরা হুজুরে পাক (সঃ) এর রওজাশরীফের অংশবিশেষ ভেঙ্গে দিয়েছে, এ কথাটা এবং অন্যান্য কল্লেকটি অভিযোগ তুর্কীরা সমগ্র বিশ্বে বিশেষতঃ মুসলিম দেশগুলোতে ছুটিয়ে দিল। যার ফলে ১৮০০ থেকে ১৮০৬ খঃ পর্যন্ত বহিরাগত হুজুরাশ্রিতদের সংখ্যা খুব কমে গিয়েছিল।

এই রকম এক পরিস্থিতিতে মিশরের শাসনকর্তা (খেদিব) মোহাম্মদ আলী পাশা তুরস্কের সুলতানের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। ওহাবীদের সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে ইস্তাম্বুলের নিকটবর্তী এলাকার সংঘটিত লড়াইয়ে ওহাবীগণ চরমভাবে পরাজিত হয়।

১৮১২ খঃ মিশরীয় বাহিনীর সেনাপতি "স্কটিশ টমাস কীথ" এক বিরাট বাহিনী নিয়ে মদীনী দখল করে।

১৮১৩ খঃ সেনাপতি কীথ মক্কা নগরীও অধিকার করে নেয়। পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে ওহাবীদের সামরিক শক্তি একেবারেই শূন্যের কোঠায় এসে যায়। অতঃপর বাদশাহী ওহাবীরা ইসলামী মোবাল্লেগ নামধারণ করে খীয়ে খীয়ে গোপনে গোপনে ওহাবী মাহহাব পালন করতে থাকে। যা বিশেষ ভাবে প্রাধান্য পায় ভারতের দেওবন্দ নামক স্থানে।

## ইসলামের পরম শত্রু

### ইমাম ইবনে তাইমিয়ার শোচনীয় মৃত্যু

(জন্ম ৬৫২ হিঃ মৃত্যু ৭২৬ হিঃ শাবান)

ইবনে তাইমিয়া হাম্বলী মাহহাব পন্থী ওহাবী মাহহাবের তথাকথিত একজন ইমাম ছিল। কারণ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব এবং তার ওহাবী মাহহাবপন্থীগণ পূর্বাপর তারই অনুসরণ করে আসছে। ইবনে তাইমিয়ার মাহহাবী নীতিমালাতে রয়েছে, আশ্বিয়া, আওলীরা ও শহীদানদের মাজার শরীফ জিয়ারত করার জন্য সফর করা হারাম। এই নাস্তিক ইমাম যখন দামেস্কে অবস্থান করছিল তখন একটি ফতোয়ার মাধ্যমে ঘোষণা দিয়েছিল যে, মদীনাবী হুজুরে পাক (সঃ)-এর রওজা শরীফ জিয়ারত করার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা হারাম। যদি কোন ব্যক্তি ভুল করে জিয়ারত করার উদ্দেশ্যে সফর করলো তবে তার চলন্ত পথে নামাজ কসর করার আদৌ প্রয়োজন হবে না।

ইবনে তাইমিয়া স্ব ঘোষিত ফতোয়াতে আরো বলেন, রাত ও দিন পরস্পর লক্ষ লক্ষ ফেরেশতা যে, মদীনাবী হুজুরে পাক (সঃ) এর দরবার শরীফে আর্গমণ করতেছেন বলে মুসলমানদের মধ্যে প্রবাদবাক্য রয়েছে, তা একেবারে মিথ্যে কথা। যদি ফেরেশতা দৈনন্দিন রওজা পাকে অবতরণ করে থাকেন তা সত্য হলে তারিফ হারাম কাজে লিপ্ত হচ্ছে।



ইবনে তাইমিয়াহ উক্ত ধর্ম কুবদাম্বলিত ফতোয়াখানা বোধিত হও-  
রাত পর মিশর, শাম ও দামেশ্কে ধর্ম প্রাণ মুসলমানদের অন্তরে আঘাত  
লাগে। বিশেষ করে শামদেশীয় মুসলমানগণ ইবনে তাইমিয়াহ ফতোয়া-র  
প্রতিবাদ করেন। এ নাস্তিক ইমামের উক্ত কুফরী ফতোয়ার পরিপ্রেক্ষিতে  
তাকে শরীয়ত সম্মত কি না তা বিবেচনা হইবে সে সম্বন্ধে ওলামায়ে কেরাম  
হইতে ফতোয়া প্রদত্ত করা হয়।

আব্বাসা বোরহান বিন আব্বাহ্ ফজারী ও আব্বাসা শিহাব বিন  
জাব্বাল উক্ত ধর্মের মূফতী সাহেবান কোরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক একটি  
৪০ পৃষ্ঠার ফতোয়া প্রদত্ত করেন। সে ফতোয়াতে ইবনে তাইমিয়াহকে  
তাদের ও ধর্মমুক্ত বলে ফতোয়া প্রদান করেন। আবার সেই রচিত ফতো-  
য়াখানাকে হানাফী, শাফে'রী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবীর কাজীগণের  
সমীপে পেশ করা হয়।

১। কাজী আব্বাহ বিন জামহা, যিনি শাফে'রী মাযহাবের সরকারী  
কাজী ছিলেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, ইবনে তাইমিয়াহকে এরূপ মিথ্যা  
ও ভ্রান্ত ফতোয়া দেয়া হইতে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হউক। সে  
এই আদেশের বিরোধিতা করলে তাকে গ্রেফতার করে শিটুনীর নির্দেশ  
প্রদান করেন।

২। কাজী মোহাম্মদ বিন জারিরী, যিনি হানাফী মাযহাবের কাজী  
নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ঘোষণা দেন যে, ইবনে তাইমিয়াহকে বিনা শর্তে  
গ্রেফতার করে কতল করা হউক। কারণ ধর্ম কুবসাকারী ধর্মভ্রাতেরই  
শামিল।

৩। কাজী মোহাম্মদ বিন আব্বাহর যিনি মালেকী মাযহাবের  
ইমাম ও কাজী নিযুক্ত ছিলেন, তিনি বলেন, ইবনে তাইমিয়াহকে এরূপ  
ভ্রান্ত ফতোয়া দেয়া হইতে বিরত রাখা হউক।

৪। কাজী মোহাম্মদ বিন ওমর মাকদাসী যিনি হাম্বলী মাযহাবের  
কাজী নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন, ইবনে তাইমিয়াহকে সাধারণ শাস্তি  
দেয়া হউক।

উক্ত চার জন কাজীর মতের মধ্যে হানাফী মাযহাবের কাজীর মতকে  
প্রাধান্য দিবে ইবনে তাইমিয়াহকে শাবান মাসের ৭২৬ হিজরী দামেশ্কে  
কিৎলাতে বন্দী করা হয়। ৭২৮ জিলকদ মাসের ২০ তারিখ বন্দী অবস্থায়  
দেখানো বড় দুঃখস্বাদ মৃত্যু মৃত্যু পতিত হয়। (সাক্ষ্যসাক্ষিক আলোমা  
কাওসারী ১৫৬ পৃষ্ঠা)

## খারেজী মাযহাব

খারেজী মাযহাব : ইহা ইসলাম বহির্ভূত প্রতারকদের মতন  
আবিষ্কৃত মাযহাব। এই তথাকথিত মাযহাবটির নামকরণ ও উৎপত্তির  
ব্যাপারে ইসলামে বিস্তারিত ইতিহাস রয়েছে। প্রকৃত পক্ষে খারেজী  
মাযহাবের উদ্ভাবক হল ইহুদী গোষ্ঠী। তারা মুসলমানদের মধ্যে ফাটল  
ধরানোর উদ্দেশ্যে সিকিফিনের যুদ্ধে ইসলামের বড় দরদী হয়ে আমীর  
মাবিরার সৈন্য দলে শামিল হয়। এ যুদ্ধ চলা কালে হযরত আলী (রাঃ) এর  
আরবী সৈন্য দলের মোকাবিলায় পরাস্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখে প্রতারণ।  
মূলকভাবে তারা তীরের মাথায় কোরআন শরীফ বেঁধে আর চিৎকার  
করতে করতে হযরত আলী (রাঃ) এর সৈন্য দলের সম্মুখে উপস্থিত হইলে  
যুদ্ধ বন্ধ করার কথা বোঝানো করল। আর উভয়ের মধ্যে সঠিক ফয়সালা  
করবে ঐ কোরআন বা আমাদের তীরের মাথায় বঁধা রয়েছে।

শ্যামী সৈন্য দলের তীরের মাথায় আব্বাহ পাকের কোরআন বঁধা  
বেখে হযরত আলী (রাঃ) এর সৈন্য দল যুদ্ধ করা কোরআন অবমাননাকর  
কর্ম মনে করেন। তাই তারা হযরত আলী (রাঃ) কে বললেন যে, আমরা  
এমতাবস্থায় যুদ্ধ চলাতে পারি না। যখন হযরত আলী (রাঃ) এর সৈন্য  
দল যুদ্ধ বন্ধ করে দিলেন, তখন পরপরই আমীরে মাবিরার শ্যামী সৈন্য



দল হযরত আলী (রাঃ) ও মাযিনা (রাঃ) উভয়কে কাফের আখ্যায়িত করে সৈন্য দল হতে খারিজ হয়ে যায়। এমনকি হযরত আলী (রাঃ) এর ২০ হাজার সৈন্যের অনেকেই তাঁর দল ত্যাগ করে এবং তারা সৈন্য দল হতে খারিজ হয়ে “খারিজী” তে সংঘবদ্ধ হয় তারা ধর্মপ্রাণ মুসলমানকে কাফের বলার জন্য কতিপয় নীতিমালা প্রণয়ন করে।

হযরত আলী (রাঃ) পরবর্তীতে এই খারিজীদের সাথে যুদ্ধও করেন। সেই যুদ্ধে অধিকাংশ খারিজী মৃত্যু বরণ করেছিল। তন্মধ্যে ৯ জন খারিজী বেঁচে ছিল, তারা নিজেদের মুনগড়া আকীদা নীতিমালার তবলিগ করতে থাকে তবে আজ পর্যন্ত কোন ইসলামীদল এ দলের শামিল হয়নি। কেবল মাত্র বর্তমান ওহাবী নজদী ও বেওবন্দীদল কতিপয় কাজে খারিজীদের অনুসরণ করে চলেছেন। তাই ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ এদের প্রাক্ত আকীদা সম্পর্কে সতর্ক থাকে অপরিহার্য কতবা।

## নজদী প্রণীত এবং কুফরী কালাম সম্বলিত দু'টি কিতাব

১। কিতাবুত তাওহীদ। ২। কাশফুশ শুবহাত।

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী প্রণীত দু'টি ধর্মশাস্ত্র কিতাব রয়েছে। প্রথম কিতাবটির নাম “কিতাবুত তাওহীদ”। দ্বিতীয় কিতাবটির নাম “কাশফুশ শুবহাত”।

প্রথম আরবী পুস্তকখানার উদ্দেশ্য অনুবাদ করেন মৌলভী ইসমাইল দেহলভী সাহেব। যার নাম রাখা হয় “তাকবিরাতুল ইমান”। কিতাবুত তাওহীদ হউক বা তাকবিরাতুল ইমান কিতাব দু'টি কুফরী মতবাদের পূর্ণ সমর্থ দিয়ে লেখা হয়েছে। তাকবিরাতুল ইমান কিতাব খানার প্রচারের লক্ষ্যে সমগ্র হিন্দুস্থানে সোজার হয়ে উঠে ১২ই রাবিউস্-সানী

১২৪০ হিজরীতে ইসমাইল দেহলভী সাহেব ওহাবী মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করার জন্য দিল্লীর জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে এক তরফ বহু লিঙ্গ হয়। ইসমাইল সাহেব তাকে পরাজয় বরণ করতঃ তাঁর দু'জন সাথী মৌলভী আবদুল হাই ও মৌলভী আবদুলগণি মাহামীকে সভা মণ্ডের উপর রেখে পলায়ন করেন। অতঃপর দিশাহারা হয়ে ইসমাইল সাহেব ওহাবী মতবাদ প্রচার লক্ষ্যে আফগানিস্থানে গমন করেন। সেখানেও ইসমাইল সাহেব আফগানী ওলামাদের হাতে ধরা পড়ে বড় অপদস্ত হন। এই দু'স্থানে অপদস্ত হওয়ার পর ইসমাইল সাহেব প্রকাশ্যভাবে খারিজী মাযহাব প্রচার বন্ধ করে দেন। ইসমাইল প্রকাশিত পুস্তক খানার মধ্যে পরিস্কার ভাষায় তিনি লেখেন, পির নবী হুজুরে পাক (রাঃ) মরে মাটি হয়ে গেছেন। (নাউজ, বিম্বাহ)

## নজদী সাহেব প্রণীত কাশফুশ শুবহাত (সংশয় নিরসন)

এই পুস্তক খানার মূল প্রণেতা হলেন, মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী। একজন বাংলাদেশী সৌদী সরকারের অনুমতি ক্রমে পুস্তক খানার বঙ্গানুবাদ করে নিজকে ধন্য মনে করছেন। বঙ্গানুবাদে তিনি বলেছেন যে, ইসলাম ধর্ম দু'ভাগে বিভক্ত। (১) ভেজাল যুক্ত ইসলাম (২) ভেজাল মুক্ত ইসলাম। মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী দ্বিতীয় প্রকারের সংস্কারের জন্য আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত হয়েছেন। অর্থাৎ ভেজাল যুক্ত ইসলামকে ভেজাল মুক্ত ইসলামে পরিণত করার জন্য আল্লাহ পাক তাকে নির্দেশ দিয়েছেন। অনুবাদক উক্ত পুস্তকের পূর্ব ভূমিকায়ও বলেছেন যে, মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী ধর্ম সংস্কারক বা রিফর্মার ছিলেন।



অনুবাদকের বর্ণনা মতে, মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ :

মহানবী হুজুরে পাক (সঃ) কতৃক প্রবর্তিত ইসলাম ধর্ম জীবিত মৃত, ইমাম ও পীর, খাজা, ওলী, দরবেশ, মাজার, দরগাহ ভূত, প্রেত ঠিকাদি এসে আল্লাহ পাকের আসনে চেপে বসেছিল। মহানবী হুজুরে পাক (সঃ) নিজেই এসব কুসংস্কারগুলোর উদ্ভাবক ছিলেন। কারণ তিনি কবর জিয়ারত করে কবর পূজার সূচনা করান। মানুষ ও জমীন জাতিকে তিনি নিজ হাতে বাইরেত করিয়ে দূনিয়ার বৃক্ষে পীর মৃতীদের ছিলাছিল। কারণে করেন। এই সমস্ত কুসংস্কারকে দূনিয়ার বৃক্ষ হতে নিঃশেষিত করার জন্যই আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে সে মনোনীত হয়।

উক্ত কুসংস্কার রহিত করণের লক্ষ্যে তিনি তার সংগ্রাম পরিচালনা করে অনেক ক্ষেত্রেই সাফল্য অর্জন করেছেন। ইসলাম প্রচারের প্রারম্ভ কালে যে বাইরেতে রাসূল এবং পরে বাইরেতে ছাহাবা প্রচলিত ছিল তারও তিনি মলোৎপাটন করতে চেয়েছিলেন। অথচ হুজুরে পাক (সঃ) হোদারবিয়ার সন্ধির সময় হযরত ওসমান (রাঃ) এর মৃত্যু সংবাদে প্রতিবাদে লোকদের যে বাইরেত করান এবং মজা বিজয়ের সময় হযরত ওমর (রাঃ) এবং হযরত আবুবকর (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবা কতৃক লোকজনের যে বাইরেত করান তারও তিনি বিরোধীতা করেন। প্রকৃতপক্ষে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী হুজুরে পাক (সঃ) ও ছাহাবা প্রভৃতি কিছই মানতনা। তার একমাত্র বিশ্বাস ছিল আল্লাহ পাকের একত্বের উপর। সে মজা বাসীদের চিরচরিত একত্ববাদে বিশ্বাসী হয়ে ইসলাম ধর্মসেই বেতে উঠেছিল। তার রচিত কাশ্ফুশ্ শুব্হাত পুস্তকে যে সমস্ত ইসলাম বিরোধী উক্তি সে করেছে এবং আরব বাসীর মৌলবাদের পূণ্য প্রচার করেছে। আমার অগ্র কুরু পুস্তকে সে সবার সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রশ্নোত্তর আকারে করতে চেষ্টা করেছি। সুন্দের পাঠক এ আলোচনা থেকে কিঞ্চিৎ উপকৃত হলেই আমার শ্রম সার্থক মনে করব।

**সম্মানিত পাঠকবৃন্দ :** আমি যে কাশ্ফুশ্ শুব্হাত বইখানার আলোচনা করেছি সেই ধর্মনাশা বইখানা এম, এ, বারী কতৃক আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউজ, ১৮ নং রাস পুর রোড ঢাকা হতে মুদ্রিত। উক্ত বইখানার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬০।

## মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী কতৃক কতিপয় ধর্ম নাশা কটুক্তি

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী বজানুবাদ কাশ্ফুশ্ শুব্হাত পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রিয় নবী হুজুরে পাক (সঃ) এর ঘোষণাপ করে বলেন :

১। হযরত মোহাম্মদ (সঃ) মজার নেজার কাফেরদের মূর্তি ভেঙ্গে অন্যায় কাজ করেছেন। নজদী সাহেবের নিকট মূর্তি নির্মাণ নেক কাজ রূপে গণ্য ছিল এবং মূর্তি ভাঙ্গা অপরাধে গণ্য ছিল।

২। কাফেররা ইবাদত, হজ্জ, দান দরগাহ ইত্যাদি নেক কাজ পালন করতো। বিশেষ করে তারা আল্লাহ পাককে অধিক মাত্রায় স্মরণ করতো।

৩। মশুরেকগণ সাক্ষা দিতো আল্লাহ পাক এবমাত্র সৃষ্টিকর্তা, রিষ্টিকর্তা, জীবনদাতা ইত্যাদি। (কাশ্ফুশ্ শুব্হাত প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় পৃষ্ঠা)

৪। মহানবী হুজুরে পাক (সঃ) যে সব মশুরিকদের বিরুদ্ধে জেহাদে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তারা তোহীদ এর রুব্বিয়ারতে এর পূর্ণ বিশ্বাসী ছিল। তারা আল্লাহ পাকের রুব্বিয়ারতে এর গুণাবলী মেনে নিয়ে ছিল। অথচ আল্লাহ পাকের প্রিয় রাসূল তাদেরকে সেই তোহীদের অন্তর্ভুক্ত করেন নি। (দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় পৃষ্ঠা)







আমি আব্বাছ পাকের প্রেরিত রাসূল। জীবিতদেরকে ভয় প্রদর্শনের জন্য ও কাফেরদের কুফরী কর্ম ধ্বংসের জন্য আবির্ভূত হয়েছি। হে কাফেরের বংশ! ইসলামে দীক্ষিত হয়ে যাও। হে অগ্নি পূজক বাদশাহ! তুমি যদি আমার কথা অমান্য কর তবে, অন্যান্য অগ্নি পূজকদের পরিণাম যা হয়েছে তোমারও তাই হবে।

পঠখানা সন্ন্যাসের হস্তগত হওয়ার পর সন্ন্যাসী প্রাণাধীন হয়ে বসলো, “মোহাম্মদ” আমার প্রজা হলে আমার নামের উপর তাঁর নাম লিখল। পরক্ষণেই সন্ন্যাসী পঠখানা টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেললো। আর হুজুরে পাক (দঃ) এর শান বিধোখী কতক কটুক্তি করল এবং এই পবিত্র পঠখানার কোন উত্তরও দিল না।

ইতাবসরে হযরত নবী করীম (দঃ) এর নিকট যখন পঠখানা ছিড়ে ফেলার সংবাদ পৌঁছল, তখন তিনি সন্ন্যাসীর জন্য নন্দোত্তাপ করলেন। “হে মহান আব্বাছ! যে আমার ধর্ম আহবানের পঠখানা এভাবে ছিড়ে ফেললো তাকে এবং তার রাজত্বকে এভাবে ছিড়ে ফেলো।

ইয়েমেনের শাসন কর্তার নিকট উক্ত সন্ন্যাসী এই মর্মে পত্র লিখে যে, হেজাজ প্রদেশে নাকি একজন নবীর আবির্ভাব হয়েছে। সে দু'জন লোক মারফত আমার নিকট তাঁর ধর্ম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে পত্র লিখেছে। ওঁর এই ধ্বংসাত্মক জবাব দেওয়া প্রয়োজন।

আপনি তাঁকে আমার নিকট ধরে নিয়ে আসুন। ঐ মোহাম্মদ ব্যক্তি পত্র লেখার আদবটুকু পর্যন্ত শিখে নাই। সাত প্রদেশের বাদশাহর নামের উপর তাঁর নাম লিখে বাদশাহর নামের অবমাননা করল।

অতঃপর ইয়েমেনের শাসন কর্তা “বাজান” বাদশাহর হুকুমে দু'জন বিজ্ঞ লোক “বানুইয়া” ও “খারখারা” কে এই মর্মে পত্র লিখে পাঠান যে, হে মোহাম্মদ! আপনি এই পঠখানা পাওয়া ব্যতীত বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হন। উক্ত পত্র বাহক উক্ত পঠখানা সঙ্গে করে তারোফে উপস্থিত হয়। এবং সেখানে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার ঠর আব্বাসুফিয়ানের

সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে। তারা আব্বাসুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করল মোহাম্মদ (দঃ) কোথায়? আব্বাসুফিয়ান উত্তর করে, সেতো মদীনায় অবস্থান করেন।

এদিকে তাদের পেয়ে আব্বাসুফিয়ান মনে মনে খুব খুশী হল। কেননা সে একজন সন্ন্যাসীকে তার পক্ষ হিসেবে পেল। যাহোক, পত্র বাহক দু'জন ঐ পত্র নিয়ে মদীনায় গমন করল এবং হুজুরে পাক (দঃ) এর হস্তে উক্ত পঠখানা অর্পণ করল এবং বলল আপনাকে বাদশাহর দরবারে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা নির্দেশিত। আপনি খুশী মনে আমাদের সঙ্গে চলুন। নচেৎ বাদশাহ রাগান্বিত হয়ে আপনাকে এবং আপনার সঙ্গীদের সহ মদীনায় ধ্বংস করে দিবেন।

হুজুরে পাক (দঃ) পত্র গ্রহণ করে ঐ দু'ব্যক্তিকে দেখে স্মিত হাসো বললেন, তোমরা দাঁড়ি মোঁচ কেন কেটেছ। তারা বললো, এটা আমাদের বাদশাহর নির্দেশ। হুজুরে পাক (দঃ) বললেন, আমার বাদশাহর নির্দেশ দাঁড়ি লম্বা করার ও মোঁচ ছাটার।

অতঃপর হুজুরে পাক (দঃ) পত্রবাহক দু'জনকে তাঁর নিকট বসালেন। তারা বসল এবং হযরত রাসূলে পাক (দঃ)-এর সান্নিধ্যে তাদের দু'জনেরই দেহ ও মনে কম্পন শুরু হয়ে গেল। তারা ভয়ে ভয়ে হযরত নবী করীম (দঃ)-কে বলল, হুজুর। আপনার সন্ন্যাসীর দরবারে উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন নেই, আপনি শুব্ব একখানা পত্র লিখে দিন আমরা “বাজানের” নিকট ফিরে যাই। অন্যথায় বাদশাহ আমাদেরকে দেহী করার দরুন কতল করে ফেলবে।

হুজুরে পাক (দঃ) বললেন, আজ তোমরা এখানে অবস্থান কর। আমি দেখি, যিনি দোজাহানের বাদশাহ তাঁর আমাকে কি নির্দেশ দান করেন।

পরদিন পত্র বাহক দু'জনকে ডেকে হুজুরে পাক (দঃ) বললেন, তোমাদের বাদশাহ আজ নিহত হয়েছেন, নিজ পুত্রই তাকে হত্যা করেছে।



তোমরা বাজানিকে বলো, সে যদি খীনে ইসলামে দীকিত হয় তবে তাকে পারস্যের বাদশাহী দান করা হবে। আর এর অন্যথা করলে বাদশাহর অনুরূপ পরিণাম তারও ভাগ্যে ঘটবে।

পত্রবাহক দু'জন হুজুরে পাক (দঃ) এর সান্নিধ্য ত্যাগ করে বাজানের নিকট গিয়ে অনুসারি'ক সব ঘটনা বর্ণনা করলে বাজান স্তম্ভিত হয়ে গেল এবং বললো, নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহর নবী।

শেষ পর্যন্ত ইরামনের শাসনকর্তা (বাজান) নবী পাকের নির্দেশের মর্মানী বহন করে সাত প্রদেশের সম্রাট হয়েছিল।

পারস্য সম্রাট কেস্‌রার নিকট হুজুরে পাক (দঃ) বেরূপ ভয় ভীতি পরিহার করে ইসলাম ধর্মে দীকিত হওয়ার চরম পত্র দিয়েছিলেন, অনু-রূপ চরম পত্র নিম্নলিখিত বাদশাহগণের নিকটও প্রেরণ করেছিলেন। চরম পত্রগুলো নিম্নরূপঃ

بسم الله الرحمن الرحيم - من محمد رسول الله على الله  
عليه وسلم الى كسرى - اما بعد فعالموا الى كلمة سواء  
بوشنا وبينكم ... الى قوله تعالى يا ايها الملوك

“হে কাসসার, হে কেস্‌রা, হে নাজ্‌জাসী” এই পত্রখানা আল্লাহর রাসূল মোহাম্মদ (দঃ) এর নিকট হতে প্রেরিত হয়েছে। তোমরা সকলে ইসলাম ধর্মে দীকিত হয়ে যাও। অন্যথায় তোমাদের পরিণামও তোমাদের পূর্ববর্তীদের অনুরূপ হবে।

এই ইসলামী দাওরাতে চরম পত্রখানা যখন পারস্য সম্রাটের হস্তগত হয়, তখন সে পত্রখানা না পড়েই ছিঁড়ে ফেলেছিল। এদিকে হুজুর (দঃ) অদৃশ্য জ্ঞানের মাধ্যমে জানতে পারলেন যে, তাঁর পত্রখানার অবমাননা করা হয়েছে, তখন তিনি তার প্রতি বদদোয়া করলেন, “যে আমার পত্রখানা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে সে যেন ধ্বংস হয়ে যায়”। হুজুরে পাক (দঃ) এর এই অভিশাপের ফলে অল্প দিনের মধ্যেই সে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

অনুরূপ একখানা পত্র কাসসারের নিকট গিয়ে পে'ীছার পর সে পত্র খানাকে যথাসম্ভব সম্মান দিয়েছিলেন এবং এই পত্রটিকে তিনি সবতনে তার সিন্দুকের মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন। যদিও তিনি তার প্রজা সাধারণের ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে পারেন নি কিন্তু হুজুরে পাক (দঃ) এর এই পত্র-খানাকে শ্রদ্ধা, সম্মান দেওয়ার বদৌলতে তার রাজত্ব ঠিক রয়েছিল। এমন কি তার বংশধরগণও অনেক দিন ধরে রাজত্ব করেছিলেন। তাদের সম্পর্কে হুজুরে পাক (দঃ) ও এতুপই বোঝা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন “এক বিশেষ সময় পর্যন্ত কাসসারের অবপতন পর কাইজান বংশ রাজত্ব করে যাবে।” আল্লাহ পাকের নবীর দোয়া বিফলে যায়নি। এই কারণেই আজ পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত সারা বিশ্বে খ্রিস্টানদের রাজত্ব চলছে।

বাদশাহ নাজ্‌জাসী যখন অনুরূপ পত্র টপলেন, তিনিও খুব যত্নের সঙ্গে পত্রের মর্ম উদ্ধার করে ইসলামের দাওরাত কবুল করলেন। বাদশাহ নাজ্‌জাসী মুসলমানদের অনেক সাহায্য করেছেন। ইরানের সাথে যথা সময়ে তাঁর মত্বা হলে হুজুরে পাক (দঃ) মদীনায় থেকেই তা অদৃশ্য জ্ঞানের বলে জানতে পারেন এবং তাঁর জন্য গারোবানা জানাযা পড়েন।

## মহানবী (দঃ) কতৃক ইসলাম ধর্মে দীকিত হওয়ার আর একখানা পত্র

بسم الله الرحمن الرحيم - من محمد بن عبد الله  
ورسوله الى المتولين عظيم القبط - السلام على من اتبع  
الهدى اما بعد قالوا ادعوك بدعامة الاسلام -  
اسلم لحلم ...



বঙ্গাব্দবাদঃ আল্লাহ পাকের রাসুল মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহর পক্ষ হতে সম্রাট মাকুকাশের নিকট প্রেরিত হলঃ

শান্তি বর্ষিত হোক, এই ব্যক্তির উপর যে আমার আহবানে সাড়া দিবে আমি তোমাদিগকে ইসলাম এর দিকে আহবান করছি। তোমরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হও, শান্তি পাবে। আর তার বিপরীত করলে তোমাদের পরিণতি তোমাদের পূর্ব পুরুষ কিবতী কাওমদের মত হবে। মাদারাজে নব্বুত গ্রন্থে লিখেছে যে, হুজুরে পাক (দঃ) হাতেব (রাঃ)-কে নিজ হস্তে লিখিত পত্রসহ সম্রাটের নিকট পাঠান। পত্রখানা সম্রাটের হস্তগত হওয়ার পর তিনি এর যথাসাধ্য সম্মান প্রদর্শন করেন এবং হুজুরে পাক (দঃ)-এর কতিপয় বৈশিষ্ট্যের কথা পত্র বাহকের সঙ্গে আলোচনা করে বলেন, ইনিতো সেই নবী, যার সংবাদ পূর্বতন নবী হযরত ঈসা (আঃ) বিশ্ব মানবের কাছে রেখে গেছেন।

তখন পত্রবাহক বললো, বাদশাহ নামদার আপনি পত্রখানার সম্মান করলেন অথচ আপনার এই দেশেই পূর্বকালে জনৈক বাদশাহ নিজেই খোদার নবী করেছিলেন।

উত্তরে বাদশাহ বললেন, বিশ্ব মানবের জন্য আদিকাল থেকে একটি বিশেষ ধর্ম রয়েছে। আমি চাই সেই প্রকৃত ধর্মের সূশীতল ছায়া তলে নুগর জীবন অতিবাহিত করি। তবে ইসলাম ধর্ম সম্মত। তখন পত্র বাহক বললো, জনাব আপনি অতি মহান একে কোন সন্দেহ নেই। তবে হুজুরে পাক (দঃ)-এর নিকট আপনি একখানা পত্র লিখুন। যা আপনার একবার প্রমাণ স্বরূপ আমরা হুজুরে পাক (দঃ) এর দরবারে পেশ করতে পারি।

আমি কিওতী বংশের, মিশরের বাদশাহ আল্লাহ পাকের রাসুল মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহর নিকট একখানা পত্র প্রেরণ করলাম।

আপনি যে বাহক দ্বারা একখানা পত্র প্রেরণ করেছেন, তা আমি সূক্ষ্ম মস্তিষ্কে পাঠ করেছি ও এর মর্ম অনুধাবন করেছি। এবং আপনার পত্র বাহককেও সাধামত সম্মান করেছি। আর আপনার জন্য দু'টি বাদী ও একটি খজুর উপঢৌকন পাঠালাম। পত্রবাহক পত্রসহ হুজুরে পাক (দঃ) এর দরবারে উপস্থিত হল এবং হুজুরে পাক (দঃ)-তার বেওয়া উপঢৌকন গ্রহণ করলেন কিন্তু সাথে সাথে মিশরের বাদশাহর জন্য বদদোয়াও করলেন। এক নির্দিষ্ট সময় হযরত ওমর (রাঃ) এর যুগে মিশরের রাজ্যসহ বাদশাহ খবংস প্রাপ্ত হয়ে যায়।

রোম সম্রাট হিরাকলিয়াসের সঙ্গে

মহানবী হুজুরে পাক (দঃ)-এর

পত্রালাপের কারণ

মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) কে মজা হতে বের করে দেয়ার পর তিনি মদীনায় পলাপন করে সেখানে গঠন করেন বিস্তারিত মুসলিম সংগঠন। সাংগঠনিক রূপে প্রিয় নবীর প্রধান কাজ ছিল ইসলামী আন্দোলন। ইসলাম প্রচারের খাতিরে তিনি সবহায়ে পরিচালনা করেন বিভিন্ন যুদ্ধাভিযান। বদর ও হুন্দ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পর হতে মজার কাকেরগণ প্রায় দূরবল হয়ে পড়ে এবং সাহায্যের জন্য তারা বিভিন্ন বেনে পলাপন করে। অন্যদিকে মুসলমানদের সহায়ক ও সাহায্যকারী ছিলেন শূদ্দমাত আল্লাহ পাক। কুফ্কারে মজার পক্ষে খ্যাতি সম্পন্ন আরব দলপতি আবু সুফিয়ান মুসলমানদের বিপক্ষে যুদ্ধ পরিচালনার সাহায্যার্থে গমন করেছিল 'গাজওয়ান' শহরে। সে সময় মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) প্রেরণ করেছিলেন রোমের সম্রাট হিরাকলিয়াসের নিকট একখানা ইসলামী দাওয়াত পত্র। এ পবিত্র ইসলামী দাওয়াতে স্ফুলের সঠিক রূপ রেখে আমি বর্ণনা করছি যোবারী



শরীফে বর্ণিত একটি হাদীসের মাধ্যমে। এই পবিত্র হাদীস গ্রন্থে রোম সম্রাটের সঙ্গে প্রিয় নবী হুজুর (দঃ) এর যে পরালাপ হয় তা আমি নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

## রোম সম্রাটের নিকট ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত

মহানবী (দঃ)-এর পত্র : প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) মক্কার ভূমিভাগ করে মদীনাতে হিজরত করার পরপরই কয়েকটি বড় বড় যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যুদ্ধচলমান অবস্থায় প্রিয় নবী বিভিন্ন স্থানে কখনো কখনো সাহাবা মোবাশিলগ প্রেরণ করছিলেন। যেমন প্রেরণ করেছিলেন "নজদের নেতা আবুত তোফায়েলের নিকট। তেমনি তিনি অন্য দিকে শত্রু করেন সম্রাট, রাজা, বাদশাহদের নিকট পত্রপ্রেরণ। যেমন : রোমের সম্রাট "হিরাকলিস" এর নিকট একখানা পত্র প্রেরণ করেন সেই পত্রের শিরোনামে প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) লিখেছিলেন : **اسلم الاسلام** ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যাও তাতে শান্তি নিহিত রয়েছে। পত্র বাহক পরখানা সম্রাটের হাতে তুলে দেয়ার পর সম্রাট ভীত হয়ে স্বশরীরে কপিতে থাকে। সম্রাট উপস্থিত দরবারীদের মধ্যে ঘোষণা দেন যে, যেভাবে হটক এবং যেখান থেকে হটক একজন আরবী ভাষীকে আমার দরবারে উপস্থিত কর। এই ঘোষণা দিলে সম্রাট প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) এর প্রেরিত পবিত্র পত্র খানাকে স্বসম্মানে সংরক্ষণ করেন। দরবারীগণ বহু স্থানে তালাসী দিলে কোন আরবভাষীকে পেলো না। তবে একজন দরবারী খোজতে খোজতে "গাজওয়ান" শহরে পৌঁছল। সেখানে সে বনিক দলের মধ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনাকারী এবং আরব বিখ্যাত নেতা আবুসু-

ফিয়ানকে পেল। আবুসুফিয়ান আরবী ভাষা ভাল জানতেন। সম্রাটের প্রেরিত ব্যক্তি আবুসুফিয়ানকে বলল, আমার সঙ্গে সম্রাটের দরবারে চল। আবুসুফিয়ান আতঙ্কিত হয়ে বলল, আমি নিরপরাধ মানুষ, আমি ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে এখানে আগমন করেছি। কিন্তু সম্রাটের প্রেরিত লোক তাকে হাত ছাড়া করলো না অর্থাৎ সঙ্গে করে আবুসুফিয়ানকে সম্রাটের দরবারে উপস্থিত করলো। আরব নেতা আবুসুফিয়ান করজোড় হয়ে বলল যে, আমি নিরপরাধ মানুষ, এ শহরে অর্থ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে এসেছি। কারণ আমাদের মধ্যে হতে মোহাম্মদ নাম্মী একজন আরবীর নাম ইসলাম নামে একটি নতুন ধর্মমত প্রচারে লিপ্ত রয়েছে এবং আমরা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত আছি। কয়েকটি যুদ্ধে তাঁর সহচরগণ আমাদের বোকাগণকে হত্যা করে তাঁর তরবারী পর্যন্ত হিনিরে নিয়েছে। এখন আমাদের যুদ্ধ পরিচালনা অচল হয়ে পড়েছে। হে সম্রাট! আমি গজওয়ান শহরে যুদ্ধ অর্থ যোগানের জন্য উপস্থিত হয়েছি। এছাড়া আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। হে সম্রাট! আপনি আমাকে অপদত্ত করবেন না এ আমার শেষ অনুরোধ।

সম্রাট আবুসুফিয়ানের বক্তব্য শুনে বললেন। তুমি নিরপরাধী, তোমাকে অপদত্ত করার জন্য উপস্থিত করাইনি। বরং তোমাদের আরবের একজন মোহাম্মদ নামের লোক আমার নিকট পত্র প্রেরণ করেছেন, তাকে তুমি চিন? আবুসুফিয়ান বলে উঠলো মোহাম্মদকে চিনবনা কেন সেতো আমার নিকটতম আত্মীয়, তাঁর ইসলামী ধর্মমতের বিরুদ্ধে আমরা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করছি। সম্রাট বললেন, তোমার সেই আত্মীয়তো আমার নিকট একখানা পত্র প্রেরণ করেছেন যা এখনও আমি পাঠ করিনি। তবে পরখানা হস্তগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত শরীরে কম্পন শুরু হয়ে গেছে। হে আবুসুফিয়ান। মোহাম্মদ (দঃ) এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দিতে পার? আবুসুফিয়ান প্রথম পরিচিতিতে বলল, মোহাম্মদ (দঃ) আমার আত্মীয়, সে ইসলাম নামের একটি নতুন ধর্মমত প্রচার করছেন,



আমরা তাঁর ধর্ম মেনে নিতে পারছি না। সম্রাট বলল, কেন তাঁর ধর্ম মেনে নিতে পারছি না? আব্দুলকিয়ান বলল, আল্লাহর "এলাহ বান" থাকতে মোহাম্মাদ (দঃ) এর "ইসলাম" কে মেনে নেয়ার আদৌ প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করিনা।

সম্রাট পুনঃ প্রশ্ন করলেন, মোহাম্মাদ এর চরিত্র কেমন? প্রতি উত্তরে আব্দুলকিয়ান বলল, মোহাম্মদ (দঃ) যদিও গরীব কিন্তু বংশ মর্যাদার দিক দিয়ে আরবের সকল বংশ হতে তাঁর বংশ অত্যন্ত উচ্চ। তাঁর দাদার হাতে আল্লাহর ঘরের চাবি ছিল। যতজনে যাই বলুকনাকেন, মোহাম্মদ (দঃ) এর মধ্যে কতিপয় বিশেষ গুণ রয়েছে। সে বাল্য বেলা হতে মিথ্যা বলে না। কখনো প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেনা সে সমগ্র আরবের মধ্যে একক বিশ্বাস সত্য।

আব্দুলকিয়ানের বক্তব্য শুনার পর সম্রাট রাজদরবারের সামনে হযরত নবী করীম (দঃ)-এর প্রেরিত পত্রখানা খুলতে নির্দেশ দিলেন। পত্র পাঠের পর দরবারীগণের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে গেল। সে সময় পত্র বাহক চিৎকার দিয়ে ঘোষণা দিল যে, পত্র প্রেরক অর্থাৎ মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) সাফল্য লাভ করেছেন। রোম সম্রাট পত্রখানা পড়ার পর স্ব-সম্মানে উহাকে সিদ্দুকের মধ্যে সংরক্ষণ করেন। বতদিন এই পবিত্র পত্রখানা সিদ্দুকে সংরক্ষিত ছিল ততদিন সম্রাটের আত্মীরদের মধ্যে বাদশাহী সীমিত ছিল।

**পাঠক :** আমি এখানে আলোচনা শেষ করার পূর্বে একটি কথা বলতে চাই যে, প্রিয় নবী রাসুলে পাক (দঃ) এর প্রেরিত পত্রের শিরোনাম বিষয় ছিল কি? বাদাগতভাবে বলতে হবে তিনি রাজা বাদশাহর নিকট ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছেন। দীনে এলাহী বা আল্লাহর প্রভু ও একত্ববাদ প্রচার করেননি। কারণ আল্লাহ পাকের মনোনিত ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পর কাফের কৃত্রিম "দীনে এলাহী" নামের ধর্ম রচিত হয়ে যায়।

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী শূন্য খোদা বিশ্বাসী ছিলেন। তাই সে কুফরী আকীদার বিশ্বাসী হয়ে আরব ভূখন্ডের কুখ্যাত চিহ্নিত

কাফেরদের কুফরী কর্মের সমর্থ দিয়ে বলেন : কাফেরগণ আল্লাহকে অধিক মাত্রায় স্বরণ করতো। দান খরচাত করতো তারা তাওহীদে রব্বিয়ারাতের পূর্ণ বিশ্বাসী ছিল। আল্লাহ পাকের রাসুল শত্রুতা করে তাদেরকে একত্ববাদের অন্তর্ভুক্ত করেননি। প্রকৃত পক্ষে নজদী সাহেব হযরত মোহাম্মদ রাসুলুল্লাহের খোদা প্রদত্ত নবুয়ত ও রেসলাতের মোটেই বিশ্বাসী ছিল না। মজার কাফেরদের কৃকর্ম কুপ্রচার সমর্থন দিয়ে সেও কাফের দলের অন্তর্ভুক্ত হল।

আল্লাহ পাকের একত্ববাদ ও রব্বিয়ারাতের স্বীকার উক্তি প্রত্যেক নেক ও বদ সকলেই রোজে আজলেই **الصلى بربكم قالوا بلى** বাক্যের মধ্যে করেছে। এখন আর আল্লাহ পাকের একত্ববাদ প্রচার করার আদৌ প্রয়োজন নেই। তবে এখন শূন্য একত্ববাদের বিশ্বাসী হওয়াই যথেষ্ট। কিন্তু আল্লাহর মনোনিত ইসলাম ধর্মের প্রচার ও তাবলীগ প্রত্যেকেরই ফরজ কাজ রূপে নির্ধারিত। ইবলিশ শত্রুতান ও আল্লাহ পাককে এক বলে বিশ্বাস করতো তার পরও ইবলিশকে আল্লাহ পাক কাফের নামে আখ্যায়িত করেন। ইবলিশ কখনও মূশরিক ছিলনা। তবে ইবলিশ হযরত আদম (আঃ) এর নবুয়তের অবিশ্বাসী হয়ে কাফেরে পরিণত হয়। আল্লাহ পাকের একত্ববাদের পরিচিতি লাভ হয় নবুয়তের আয়নাতে। যদি নবীই না হয় তবে আল্লাহ পাকের পরিচিতি লাভ হবে কোথা হতে। কোরআন মাজিদ প্রিয় নবীর আগমনের বহু পূর্বে লৌহে মাহকুমে সংরক্ষিত ছিল। আমরা এই কোরআনের সত্যান পেয়েছি হযরত মোহাম্মদ রাসুলুল্লাহের মাধ্যমে। আল্লাহ পাকের একত্ববাদ ও রব্বিয়ারাতের বিশ্বাস করা কোন দীন ও ধর্ম নয়। কারণ আল্লাহ পাকের নিজস্ব কোন ধর্ম নেই। যারা খোদা বিশ্বাসকে ধর্ম রূপে মেনে নিয়েছে ইহা তাদের মনুগড়া ধর্ম। এই মনুগড়া ধর্ম পালনের দ্বারা দোষণে বাবে। বেহেশতে যাওয়ার একমাত্র সুপথ হল নবী পাকের আনিত ইসলাম ধর্ম পালনের মধ্যে।



## মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর ধর্ম নাশা কটুক্তির জবাব এবং মৌলবাদের জন্ম কথা।

(১) ইসলাম : হযরত মোহাম্মদ (দঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মের নাম ইসলাম। এ ধর্মটি আরব ভূখণ্ডের বৃক চিরে বিশ্ব জগতে বিস্তৃত হওয়ার পূর্বে সে আরবে দীনে তাওহীদ বা দীনে এলাহী নামের ধর্ম মতের প্রচলন ছিল। যখন আরবের বৃকে ইসলাম ধর্মের সূচনা হয় তখন "দীনে এলাহী" চিরতরেজ জন্য বিদায় নেন। যখন প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ পাকের নির্দেশ মোতাবেক ইসলাম প্রচারের জন্য নির্দেশিত হয়ে সর্ব প্রথম তিনি মক্কার কাফেরদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার আহ্বান করেন। তখন কতিপয় কাফের প্রিয় নবীকে "দীনে এলাহী"তে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আহ্বান জানায়। এ আহ্বানের জবাবে হযরত নবী করীম (দঃ) কাফেরদের এই উত্তর দিলেন **لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ** তোমাদের জন্য তোমাদের পূর্ব ধর্ম মত এবং আমি আমার ধর্মের উপর আছি। তাফসীরে কুরতুবীর গ্রন্থকার বলেন : তোমরা নিজ ধর্ম মতে থেকে হুজুরে পাক (দঃ) এর এ নির্দেশটি পরবর্তিকালে জেহাদের নির্দেশিত স্রোতে দ্বারা রহিত হয়ে যার। পক্ষান্তরে এখন শূধ, 'দীন ইসলাম' মেনে চলতে হবে।

উপরে উল্লিখিত আলোচনার দ্বারা পরিস্কার বৃক্য গেল যে, 'দীনে এলাহী' কাফেরদের জন্য ধর্ম মত ছিল বিশেষ যুগ পর্যন্ত। এ ধর্ম মতের পরিবর্তে পাশাপাশি মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত ছিল ইসলাম ধর্ম। দীনে এলাহী ধর্ম মতটি আরবের বৃকে সামান্য কিছুদিন প্রচলিত ছিল। পরবর্তিতে দীনে এলাহীর পরিবর্তে দীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য প্রিয় নবী নির্দেশিত

হন। আল্লাহ তাঁকে এমন বৃক্য নির্দেশের মাধ্যমে বললেন : কাফের মূশ-রিকদেরকে যেখানে পাও হত্যা কর। এই নির্দেশ পালন কল্পে প্রিয় নবী (দঃ) কুরবী মতবাদকে রহিত করার জন্য কাফেরদের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধ পরিচালনাও করেন। তাঁর এ যুদ্ধাভিযানের সমাপ্তি ঘটে মক্কা বিজয়ের পর। মক্কা বিজয়ের পর আল্লাহ নবীকে নির্দেশ দিলেন যে, ইসলাম ধর্মে জোর জবরদস্তি নেই, এখন হতে ইসলাম আদেশের মাধ্যমে প্রচার করা হোক। আল্লাহ ইসলাম পন্থীগণকে নির্দেশ দেন যে, ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম আমার নিকট গৃহিত নর, তাই তোমরা ইসলাম ধর্মের উপর হুঁর থেকে মৃত্যু বরণ কর। ধর্ম মত হিসেবে ইহাই একমাত্র নাজাতের পথ। কাফের মতবাদীগণ আমার একত্ববাদে অংশীবাদ সামিল করে বিনষ্ট করেছে। হে নবী! আপনি নিজ মূখে ঘোষণা দিন যে, আমি এক, আমার কোন অংশীদার নেই। আমাকে কেহ জন্ম দেয়নি এবং আমিও কাউকে জন্ম দেইনি। শেষ পর্যন্ত ইসলামী সংগ্রামের মাধ্যমে কাফেরদের দীনে এলাহীর পরিবর্তে ইসলাম ধর্ম কার্যে হল। বিশ্ব জগতে এখন কেহ যদি বলে আমি পূর্ব প্রচলিত দীনে এলাহীর বিশ্বাসী হয়ে থাকবো এবং আমি ইসলামকে মানব না! এরূপ দাবীদারের দাবী আল্লাহ পাকের নিকট গ্রহণীয় হবেনা। কারণ ইসলাম ধর্মের সূচনা হবার পর পূর্বকার সকল ধর্ম মত রহিত হয়ে যায়।

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী মক্কার কাফের মূশরিকদের দীনে এলাহী মতাদর্শের সমর্থন দিয়ে কাফেরে পরিণত হল। নিঃসন্দেহে সে আল্লাহর বিশ্বাসী ছিল, তবে তার এই বিশ্বাস ধর্ম বিশ্বাসের সামিল নয় বিধায় মুসলিম উম্মাহর ঐক্যমতে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী কাফের ও মূশরিক এবং মৌলবাদের উদ্ভাবক ছিল। যদি নজদীকে মুসলমান বলা হয় তবে বৌদ্ধ, হিন্দু, ও খ্রিস্টপূজক সকলকে মুসলমান বলা উচিত। কারণ এরাও সকলে আল্লাহর বিশ্বাসী ছিল এবং আছে।



**একটি ঘটনা :** হযরত আবু, জাফর নোহাস (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, একদা একজন দীনে এলাহী পন্থী ওয়াজেজ কুফার মসজিদে ওয়াজ করছিলেন। কোরআনের আয়াত **مُشْكُونَ** **وَمِنْ أَهْلِ** **الْبَيْتِ** অর্থাৎ সকলেই আল্লাহ পাকের দীনের অন্তর্ভুক্ত হও। তার ওয়াজের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত কোথাও নবী পাকের কথা ছিলনা। সে শূন্য, আল্লাহ পাকের ভর দেবারে সমস্ত উপস্থিত জনতাকে খোদাপন্থী বানাবার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ হযরত আলী (রাঃ) কুফার মসজিদে উপস্থিত হয়ে জনতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ওয়াজেজ সাহেব কে? জনতা বলল, আমরা তাকে চিনি না, তবে তিনি অশ্রু, কন্নানো ওয়াজ করছেন। হযরত আলী (রাঃ) বললেন : এই ব্যক্তিকে খাড় ধরে মসজিদ হতে বের করে দাও। বেহেতু তার আকীদা বিশ্বাস খারাপ। তাকে বের করার পূর্বে ইসলামী শরীয়াতের একটি মাস্‌আলা জিজ্ঞাসা কর। উপস্থিত জনতা ওয়াজেজ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করল : কোরআনের আয়াতের নাসেখ মানসুখের বিধান কি? ওয়াজেজ সাহেব বললেন : এই ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা নেই। অতঃপর তাকে খাড় ধরে কুফার মসজিদ হতে বের করে দেয়া হল। (তাঃ আজিজ)

**পাঠকবৃন্দ :** আমাদের এতদেশের মসজিদ সমূহ আজ ইলিয়াসী পন্থীদের পূর্ণ দখলে। জম্মাতে নামাজ গেয়ে ইমান সাহেবের সালাম ফিরানোর সাথে সাথে একজন লোক দাঁড়িয়ে বলে : দীনী ভাগ্নেয়া। নামাজ পর একটু, বসবেন, দীনের তালীম হবে। মুসল্লীমগন সন্মত নফল শেখ করার আগেই একজন দীনীভাই দাঁড়িয়ে “তাবলীগী নেসাখ” খানী তাদের নিকট রাঁহা কোরআনের সমান্ মযদি রাখে হাতে ধরে একটানা পাঠ করতে থাকে। এই দলের প্রবন্ধা আর কুফার মসজিদের ওয়াজেজের অবস্থা একই। তারা আল্লাহর অত্যন্ত রহদী হয়ে শূন্য দীনে এলাহী কারোম করতে চায়। তাদের আলোচনার মদীনার ইসলাম মোটেই স্থান পায়না।

**ধর্মজোহিতা :** ইসলামের পূর্ণ বিজয় সূচীত হওয়া পর্যন্ত অন্তত আট বছর মক্কার কাফেরগণ ইসলাম ধর্মের ঘোর বিরোধী ছিল। তাদের বড় নেতা আবু সুফিয়ান এর নেতৃত্বে কাফেরগণ মহানবী হুজুর (দঃ) এর ইসলামী নীতিমালার বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধে উপনীত হয়েছিল। মদীনার ধর্মপ্রাণ সামান্য বাহিনী মক্কার বিশাল কাফের বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করে টিকিয়ে থাকা তামাহুর মেহেরবানী ছাড়া আর কিছ, ছিলনা। মক্কা বিজয় কালে এই বিশাল বাহিনীর প্রধান আরব নেতা আবু সুফিয়ান মহানবীর চাচার হাতে ধরা পড়ে আত্ম সমর্পন করলো। তারপর হতে শুরু হল ইসলামের পূর্ণ জয় সূচী। আবু সুফিয়ানের আত্ম সমর্পনের পর হতে ইসলাম বিরোধী আন্দোলন চির তরের জন্য বিদায় নের। মক্কার চতুর্দিকের মানুখেরা ইসলামী আদর্শে মূগ হয়ে স্বেচ্ছায় মক্কার আধিনায় দলে দলে উপস্থিত হতে থাকে।

### ছাদীস শরীফে বর্ণিত আছে :

من عكروا ومقاتل : ورد من اليمن سبع مائة الف مؤمنين طائعين بعضهم يؤذون وبعضهم يقرؤون القرآن وبعضهم يهللون -

অর্থাৎ ইরামন প্রদেশের সাত শত লোকের একটি সম্ভবত্ব দল বিজয় ভাবে মহানবী (দঃ) এর বেদমতে উপস্থিত হয়। উপস্থিতকালে তাদের কারো মধ্যে উচ্চারিত ছিল আজানের বাক্য। আর কেউ কেউ কোরআনের আয়াত পাঠ করতে করতে মহানবী (দঃ) এর আন্তানায় উপস্থিত হয় আর কারো মধ্যে আল্লাহ, আকবার ও ইরাসুলাল্লাহ ধর্মনি উচ্চারিত ছিল। হযরত নবী করীম (দঃ) তাদের সকলকে ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের বাইয়াত করান।

আল্লাহ পাক মহানবীর এ আন্দোলনকে ইসলামী আন্দোলন নামে আখ্যায়িত করেছেন। তবে ধর্মপ্রোহী নজদী পন্থী ও এযুগের তাবলীগীগণ প্রিয়নবীর ইসলামী আন্দোলনকে ত্রাহদী আন্দোলন নামে আখ্যায়িত



করেন। অর্থাৎ নবী করীম (দঃ) নাকি আল্লাহর তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইসলামী আন্দোলন গড়ে তুলেন। তারা এই অশুপার্থ্য করে শূঁধু, খোদা বিশ্বাসকে ইমানে বলতে থাকে। তারা মজা বিজ্ঞ কালের ঘটনাকে উপলক্ষ করে বলে যে, এ সময় মানুষ শূঁধু, খোদা পন্থী ছিল। তাদের ভাষ্যে ইসলামের দ্বিতীয় নাম দীনে এলাহী। দুনিয়ারবুকে মৌলবাদের জন্মদাতা হল নজদী পন্থী তাবলীগী দল। ইসলাম ধর্মে মৌলবাদের স্থান মোটেই নেই, যার প্রামাণ্য দলিল হল হযরত আলী (রাঃ) এক মৌলবাদী ওয়াজেজকে কুফার মসজিদ হতে ঘাড় ধরে বের করে দেন।

**পাঠকবৃন্দ :** আপনাদের প্রত্যেকের জানা আছে যে, সন্ন্যাসী আকবর বেদীন কাফের মহিলা বিবাহ করার সুবিধার্থে “দীনে এলাহী” নামে একটি মৌলবাদী নতুন ধর্মের ভিত্তিস্থাপন করতে চেয়েছিল। হযরত মোজাদদেদে আলফেসানী (রহঃ) তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মূখর হয়ে সন্ন্যাসী আকবরের “দীনে এলাহী” বা “মৌলবাদ”কে চিরতরের জন্য ভেঙ্গে দেন। তিনি বলেন যে, আমাদের মধ্যে মদীনার ইসলাম ধর্ম বিদ্যমান থাকতে শূঁধু, খোদা বিশ্বাসীদের দীনে এলাহী নামের নতুন মতবাদের আদৌ প্রয়োজন নেই।

এতশেষের ধর্মপ্রাণ সাধারণ মুসলমানগণ আজ ওহাবী তাবলীগী ফেকারি খপ্পরে পড়ে ইমানে আকীদা বিনষ্ট করছে। তারা তাবলীগের ছত্রছায়ায় মদীনার ইসলামের বিরুদ্ধে দীনে এলাহীর দাওরত দিচ্ছে। তারা নবীর নাম উচ্চারণ না করে তাদের মুরব্বিদের নামের উপমা নিতেছে। দীনে এলাহীর দাওরাত দেয়ার সুবিধার্থে মানুষকে দীনী ভাই নামে ডাকেন। তাদের ইমানে হল শূঁধু, আল্লাহর উপর বিশ্বাস। তবে সঠিক ইমানের সংজ্ঞার সাথে তাদের ইমানের আদৌ মিল নেই। প্রকৃত ইমানে হল আল্লাহর উপর বিশ্বাসের পাশাপাশি প্রিয় নবী মোহাম্মদ রাসুলুল্লাহ (দঃ)-কে সমভাবে বিশ্বাস করা। আল্লাহ পাকের বিশ্বাস ইমানের সূচনা।

আর নবী পাকের বিশ্বাস ইমানের পরিপূরক। আল্লাহ পাকের তাওহীদ শূঁধু, বিশ্বাসের জন্য, আর নবী পাকের বিশ্বাস ইসলাম ধর্ম পালনের মধ্যে নিহিত। শূঁধু, আল্লাহ পাকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা কুফরী কর্ম এবং দোষের পথ।

**কোরআন হাদীসের আলোকে মুসল-**

**মান ধর্ম পন্থী এবং কাফের খোদা**

**পন্থীর মধ্যে তুলনামূলক**

**পার্থক্য।**

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী একজন অধিতীয় সেরা ধর্ম নাস্তিক ছিল। সে মজার অন্যান্য চিহ্নিত কাফেরদের মত ইসলাম ধর্মের সমালোচনায় কুৎসা রটনার বিভোর থাকত। তার বড় দাবী ছিল যে, সে খোদার বিশ্বাসী তাই সে কখনো হুজুরে পাক (দঃ)-এর প্রবর্তিত ইসলাম ধর্মের একেবারে তোরাজা করতো না। তাই সে ইসলাম পরিভ্রাণ করে কুফরী মতবাদের বিশ্বাসী হয়ে যায়। মুসলমানদের ধর্মীয় কর্মকে কুফরী কর্মের উপর প্রাধান্য দেয়। কাশফুল শুবহাত নামক নজদী পন্থকে পরিস্কার ভাষায় সে বলেছে যে, আল্লাহর একত্ববাদ ও রব্বিয়ারতকে কাফেরেরা যতটুকু বুঝে নিরেছিল তা মুসলমানেরা বুঝে নিতে পারে নি। তার বর্ণিত কিতাব খানার ভাষ্য পরিস্কার বুঝা যাচ্ছে যে, মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী শূঁধু, খোদার বিশ্বাসী ছিল। নবীর বিশ্বাসী ছিলনা।—



আমি এবার ধর্ম পন্থী ও বোদা পন্থীর মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য দেখাব। প্রথমে আমি জিজ্ঞাসা করবো যে, এ দুনিয়াতে যে লক্ষ লক্ষ আশ্বিনায়ে কেরামগণের আগমন ঘটেছিল, তা কোন লক্ষ্যে ছিল। তীর্থাত্মিক আব্লাহ পাকের প্রভু ও একত্ব বিকাশের জন্য আবিস্কৃত হয়েছিলেন, না ধর্ম প্রচারের জন্য।

### ধর্ম ও তাওহীদের পার্থক্য

ইসলামের ইতিহাস ও সমস্ত আসমানী কিতাবই পূর্ণসাক্ষী রয়েছে যে, সমস্ত আশ্বিনায়ে কেরামদের দুনিয়াতে শূভাগমনের মূল লক্ষ্য ছিল স্ব-স্ব ধর্ম প্রচার। যেমন হযরত মুসা (আঃ) দীনে মূর্ভীর প্রবর্তক হয়ে স্ব-ধর্মই প্রচার করেন। হযরত ইসা (আঃ) দীনে ইসারীর প্রচারক ছিলেন। তদ্রূপ প্রিয় নবী হুজুরে পাক (সঃ) ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হয়ে শূধু ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছেন। তিনি কখনো আব্লাহ পাকের একত্ববাদ বা রব্বাবিয়াত বিভাগে আশ্ব নিয়োগ করেন নি। ইসলাম ধর্মের সূচনা কালেও পৃথিবীতে আব্লাহ পাকের একত্ববাদ প্রাতিষ্ঠিত ছিল। তাই আব্লাহ পাক তার প্রিয় রাসুলকে নির্দেশ দেন শূধু ইসলামের নীতিমালা প্রতিষ্ঠা করার জন্য। তাই প্রিয় হুজী রাসুলে পাক (সঃ) কুফরী মতবাদের বিরুদ্ধে ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠাব লক্ষ্যে বিভিন্ন যুদ্ধে উপনীত হন। যখন ইসলাম ও কুফরের যুদ্ধ চলছিল তখন মজার বদুকে আব্লাহ পাকের তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ছিল। যদি আব্লাহবাদই ধর্ম হত, তবে তিনি ইসলামকে কায়ম করার নির্দেশ দিলেন কেন? এ কথাটির সঠিক উত্তর হল যে, কাবা শরীফের হজর ও তওরাফ পালন এবং কাফেরদের সমাজ সেবামূলক সকল প্রকারের ভাল মন্দ কাজ হতে আব্লাহ পাক অত্যন্ত নারাজ ছিলেন। কারণ এইসব কাজ ইসলাম ধর্মের নীতিমালা মোতাবেক পালন করা হত না। যে

সব কাজ ইসলামী নীতিমালার পরিপন্থী রূপে পালিত হয় তা আব্লাহর নিকট গৃহীত হয় না। তাই মুসলমানগণ প্রথমে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে অতঃপর ইসলামী নীতিমালা অনুসারে এবাদত বন্দেগী হজর রোজা ইত্যাদি বিভিন্ন নেককাজ যথারীতি রূপে পালন করেন। সেক্ষেত্রে মজার কাফেরেরা ইসলাম গ্রহণ করল না তারা নিজ প্রবর্তিত কুফরী মতবাদ পালন করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী ইসলামী নীতির বিপক্ষে কুফরী নীতি সমর্থন দিয়ে কুফরী মতবাদী হল।

মৌখিক ধর্ম প্রচার ক্ষেত্রে হাবীবে বোদা হযরত মোহাম্মদ (সঃ) আব্লাহ পাকের নির্দেশ মোতাবেক সর্বপ্রথম নিজ চাচা আবু লাহাবকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার আহবান জানান। আবু লাহাব ইসলামী আহবানকে এ অজ্ঞাত পেশ করে প্রত্যাখ্যান করলো যে, আমিতো প্রথম হতে আব্লাহ পাকের একত্ববাদের বিশ্বাসী হয়ে হজর, তওরাফ, সারী পালন করে আসতেছি এবং দারুন নবভা কমিউনিটি সেণ্টারের সদস্য হিসেবে আমার অনেক নৈক কাজের ও সমাজ সেবার অবদান রয়েছে। এমতাবস্থায় মোহাম্মদ কর্তৃক প্রবর্তিত নতুন ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার আদৌ কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করিনা। আব্লাহ পাক তার কুফরী মূর্ভীর প্রতিবাদ করতঃ সূতা লাহাব নাফিল করে আবুলাহাবকে দোযখী দোযখা দেন। এখন প্রশ্ন হল আবুলাহাব হজর তওরাফ ও সারী পালন করা সত্ত্বেও তাকে দোযখী বলা হল কেন? সেওতো আব্লাহ পাকের রব্বাবিয়াত ও একত্ববাদের বিশ্বাসী ছিল। একত্ববাদের বিশ্বাসের দ্বারা পরকালের নাজাত পাওয়া যায় না। তবে মূর্ভীর একমাত্র পথ হল হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত ও আনিত ইসলাম ধর্মের উপর বিশ্বাস স্থাপন করার মতো।



## ধর্ম পন্থী ও খোদা পন্থীর পার্থক্য

সূরা সাহাবের অন্তর্গত সূরা আসরের মধ্যে তাকসীরে কুরতুবীর গ্রন্থকার ধর্ম পন্থী ও খোদা পন্থীর দৃষ্টান্ত মূলক পার্থক্য বর্ণনা করেছেন : এই সূরার প্রথম আয়াতের **وَالْعَصْرَانِ الْاِلَٰهَانِ لَفِيْ غَسَرٍ** এর মধ্যে স্বরং আল্লাহ পাক যুগ জামানার কছম করে বলেন যে, কতিপয় খোদাপন্থী মানুষ পরকালে অত্যন্ত কীভিন্ন হবেন, তাকসীর গ্রন্থকার এই খোদাপন্থীদের নাম যথাক্রমে এই বলেন : ১। আবু জেহেল। ২। অলীদ বিন মোগীরা। ৩। আস বিন ওরারেল এবং ৪। আবদুল মন্তালিহের পুত্র আস ওয়াদ (নবীর চাচা)।

এরা চারজন চরম পন্থী চিন্তিত কাকের ছিল। তবে তারা আল্লাহর রবুবিয়াত ও একত্ববাদে বিশ্বাসীও ছিল। তারা খোদাপন্থী হলে হজরত ওরাক ও সাফা মারতুয়াহ এর মধ্যে দৌড়ানোড়ী করতো এছাড়া তারা দারুন নবওয়ার কমিটি সদস্য হিসেবে অনেক অনেক সামাজিক নেক কাজ ও করেছিল। তবে তারা সকল মৌলবাদী ছিল। এ দলের বিপক্ষে নিম্ন চারজন লোক ধর্মাবলম্বী ছিল। তাদের নাম যথাক্রমে এই :

- ১। হযরত আব্দুলকর শিশিক (রাঃ) তিনি ইসলামী জগতের প্রথম মুসলমান। তিনিই অল্প বিশ্বাসে প্রিয় নবী হুজুরে পাক (সঃ) এর ধর্মকে বিশ্বাস করে ইমান এনেছিলেন।
- ২। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) তিনি মহানবী রাসুলে পাক (সঃ) এর ধর্মের উপর ইমান আনার পর অনেক ধর্মীর খেদমত আজাম দিয়েছেন।
- ৩। হযরত ওসমান গণি (রাঃ) তিনি ইমানদার মুসলমান হওয়ার সাথে অধিতীয় সত্যবাদী ছিলেন।

৪। হযরত আলী (সঃ) তিনি ইসলামী জগতের প্রথম খালিফ মুসলমান এবং ধৈর্যধারণকারী ইমানদার ছিলেন।

উপরে উল্লিখিত দুই প্রকৃতির লোকের মধ্যে প্রথম বর্ণিত লোকেরা শূন্য, খোদার বিশ্বাসী ছিল যেমন আবু জেহেল ইত্যাদি। আর দ্বিতীয় প্রকৃতির বর্ণিত লোকগণ ছিলেন ধর্মপ্রাণ ইসলাম দরদী। আল্লাহ পাক প্রথম বর্ণিত ব্যক্তিবর্গ সম্বন্ধে সূরা আসরের মধ্যে প্রকাশ্য ঘোষণা দেন যে, তারা পরকালে বহু কীভিন্ন হবেন এবং দোষণে প্রবেশ করবে। আল্লাহ পাক একই সূরার মধ্যে দ্বিতীয় দলের পক্ষে এ সুসংবাদ দেন যে, তারা ইমান আনার পর নেক আমল করার দরুন বেহেশতী। এই সূরার মূল ভাষা হল যে, শূন্য, আল্লাহ পাকের একত্ববাদের বিশ্বাসী হওয়ার মধ্যে নাজাত নেই। নাজাত শূন্য, ধর্ম পন্থী হওয়ার মধ্যে নিহিত রয়েছে।

দেওবন্দী ও হাবীগণ আল্লাহর বাণী প্রিয় নবী (সঃ)-এর ইসলামী নীতিমালার পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলনা। তারা নজদী নীতিমালার উপর যতটুকু ভিত্তি করত ততটুকু ভিত্তি তাদের ইসলামী নীতিমালার উপর ছিলনা। ইসলামী নীতিতে রয়েছে সকল কাকের ঘোষণা। সেক্ষেত্রে দেওবন্দের বড় মুরব্বী গদুহী সাহেব ফতোয়া রশিদিয়াতে চিত্রিত কাকের অর্থি আবু জেহেলকেও আল্লাহ পাক মাফ করে বেহেশতে নেয়ার আকাংখা রাখেন। আর আরবের নজদী সাহেব পরিষ্কার ঘোষণা দেন যে, কাকেরগণ তওহীদ বাদী ছিল তারাও বেহেশতে যাবে।

## ধর্ম ও একত্ববাদের মূল্যায়ন

প্রত্যেক আশ্বিনায়ে কেরামতের স্ব স্ব ধর্ম তাদের জন্য ছিল খাছ। যেমন আমাদের প্রিয়নবী হযরত রাসুলে পাক (সঃ)-এর জন্য ইসলাম ধর্ম খাছ। প্রত্যেক নবীদের ধর্মের স্বীকৃতি দাতা ছিলেন মহান আল্লাহ পাক।



যেমন হযরত রাসুলে পাক (৭ঃ)-এর ধর্মের স্বীকৃতি প্রদান করেন আল্লাহ পাক। আল্লাহ পাক প্রিয় নবীর ধর্মের বৈশিষ্ট্য ও মর্মাদি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন : **ان الدين عند الله الاسلام** ইসলাম আমার মনোনিবেশিত ধর্ম এই ধর্মের প্রচারক রূপে হযরত মোহাম্মদ (৭ঃ) কে নিযুক্ত করেছি। তাই হযরত মোহাম্মদ (৭ঃ) ধর্মের নীতিমালাগুলোকে বিস্তার করেন। আর খালা এই ধর্মের অনুসারী হন তাদেরকে মুসলিম নামে আখ্যায়িত করেন। যেমন আল্লাহ পাকের পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে **موسماكم المسلمين** অর্থাৎ আমি ইসলাম ধর্ম অবলম্বীগণকে মুসলমান নামে নাম করণ করেছি এবং ইহা আল্লাহর একমাত্র ঘোষণা। এই ইসলামী দলের পরিপন্থী আর একটি দল রয়েছে যাদেরকে “কাফের” বলা হয়। এই দলকে আল্লাহ পাক **بما هم الناس** অর্থাৎ তাদেরকে শূন্য, মানুষ হিসেবে গণ্য করেন, এদের কোন সম্মান-বৈশিষ্ট্য নেই। বরং তাদের বৈশিষ্ট্য হল যে, তারা নাফরমান এবং দোষখী।

আল্লাহ পাকের পবিত্র কোরআন পাকে আরো ঘোষণা দেয়া হয়েছে **ولا للمؤمنين الا والتم مسلمون** অর্থাৎ তোমরা ইসলামী নীতিমালা পালন করে মরো। তোমাদের জন্য একমাত্র মৃত্যুর পথ হল “মিল্লাতে ইসলাম”। আল্লাহ পাক কখনো ঘোষণা দেন নি যে, আল্লাহর প্রভু ও একত্ব বিশ্বাসের মধ্যে পরকালের মৃত্যু নিহিত রয়েছে। বরং ইসলামী মিল্লাতের প্রচোজন মৃত্যুর আগে ও পরে সবকালেই রয়েছে। আমরা মৃত্যুর পূর্বে ইসলামী কালেমা পাঠ করে থাকি এবং মৃত্যুর পর মর্দাকে **بسم الله على ملة رسول الله** পাঠ করে কবরস্থ করি। ইসলামের “১৪শ” বছর অতিবাহিত হল কেহ মর্দাকে **بسم الله على ملة الله** পাঠ করে কবরস্থ করতে শূন্য যায় নি। আল্লাহর প্রবু বিস্তার একত্ববাদ শূন্য, অন্তরের বিশ্বাসের জন্য, কর্মক্ষেত্রে বাস্তব রূপদানের জন্য নয়। ধর্মের গুরুত্ব আল্লাহর একত্ব প্রভুত্বের চেয়ে বেশী। দেখুন কবরে প্রত্যেক মানুষকে তিনটি প্রশ্ন করা হয়। তোমার প্রভু কে? তোমার ধর্ম কি? এবং

তোমার নবীকে? এই তিনটি প্রশ্নের দু’টিই ধর্ম সংক্রান্ত, শূন্য, একটি প্রশ্ন আল্লাহ পাক সম্পর্কীয়। এ আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল যে, শূন্য, আল্লাহর বিশ্বাসের দ্বারা কারও নাজাত নাই।

## দীনে তাওহীদের মোকাবিলায় ইসলাম ধর্ম

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী আরো বলেছেন, ইসলাম ধর্মের সূচনাকালের মুসলমানগণ হতে মতান্তর কাফেরগণ হজরত ওমরা পালনে অগ্রগামী ছিল। কাফেরগণ হজরত পালন করতো হীনে এলাহীর অনুসারী হয়ে সেক্ষেত্রে মুসলমানেরা পালন করতো ধর্ম ও ইসলামের নীতি। নজদী সাহেব ইসলাম ধর্মকে মোটেই মেনে নিতে চাননি। তবে কালামুল্লাহ ইসলাম ধর্মকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আর দীনে এলাহীর ওয়াকিবত মহাবাদকে নিম্ন আশ্রিত দ্বারা রহিত করেছেন। যেমন আল্লাহ পাক বলেন :

**الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَالْحَمْدُ عَلَيْكُمْ لِعَمَلِكُمْ  
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا**

হে মুসলমানগণ। আজই আমি তোমাদের ধর্ম ইসলামকে পরিপূর্ণ ঘোষণা দিলাম এবং উহা আমার মনোনীত ধর্ম। মুসলিম উম্মার ঐক্যমতের উপর উল্লেখিত আয়াতটি প্রিয় নবী হজরত পাক (৭ঃ) আল্লাহর দ্বারের ইসলামিক পদ্ধতিতে হজরত কর্ম সম্পন্ন করে তিনি যখন আরাফাত মরদানে উপস্থিত হন সেই মৃত্যুতে উল্লেখিত আয়াতটি প্রাণিল হইল।



আব্বাস পাক প্রিয় নবীর হজর পালন পদ্ধতিকে স্বীকৃতি দিয়ে বলেন, আমি দীনে তাওহীদ বা দীনে এলাহী পালনকে গ্রহিত করে আপনার সঠিক পদ্ধতিতে হজর পালনকে স্বীকৃতি প্রদান করলাম। আপনি কাবাতে যে, হজর কার্য পালন করেন আমি তার নাম রাখলাম সঠিক হজর। অতএব আপনি ইসলামী পদ্ধতিতে হজরপর্ব পালনের জন্য উপদেশ প্রদান করুন। আপনি ঘোষণা দিন যে, আজ হতে আব্বাস পাকের নির্দেশে দীনে তাওহীদ বা দীনে এলাহী নামের ধর্মটি গ্রহিত হয়ে গেল। মক্কার চির-চিরিত কাফেরগণ ইসলাম ধর্মের সূচনাকালে কুফরী পদ্ধতিতে হজর তওরাফ পালন করতো। যেমন কা'বা ঘরের চতুর্দিকে চক্র বেরা কালে ব্যক্তি চারে লিঙ্গ হওয়াতে সঠিক তওহীদ পালন মনে করতো। একদিন আসাপ (পুরুষ) ও নারেল। (মহিলা) উভয়ে কা'বার আঙ্গিনাতে ব্যক্তিচারে লিঙ্গ হয়। আব্বাস পাক এ কুপদ্ধতির হজর পালনে নারাজ হয়ে শান্তি স্বরূপ পুরুষ ও মহিলা উভয়ের বৈধিক আকৃতি বিকৃত করে দেন। কা'বার অন্যান্য হজর পালনকারীগণ এই নারী ও পুরুষের মৃত দেহকে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের তলদেশে পাশাপাশি দাফন করে। কাফেররা এই কুপদ্ধতিতে হজর পালন করেও নিজেদেরকে তাওহীদ পন্থী বলে ঘরানা করতো।

আজ কাল যারা ইসলাম ধর্মের নীতিমালার পরিবর্তে কুফরী নিরম নীতি পালন করছেন তারা ভুল পথে পরিচালিত হচ্ছেন। আজকাল ওহাবী পন্থী তথাবিত্ত তাবলীগবাদী অনেক লোকের পরিভাষাও বদলিয়ে গেছে, তারা দীনে ইসলামের বদলে দীনে এলাহী ব্যাকটি বলে, ধার্মিক শব্দের বদলে খোদা ভক্ত বলে। মুসলমান ভাইয়ের বদলে দীনী ভাই বলে। ধর্মীর খেবমতের বদলে একরামুল মুসলিমীন বলা চালু করেছে। তাদের এসব শব্দ বা পরিভাষা প্রয়োগের মধ্যে শত মতলব লুকায়িত আছে। প্রকৃত পক্ষে তারা আব্বাস পাকের দোহাই দিয়ে ইসলামী নীতি মালাকে ধবসে করেছে। তাবলীগের নামে ইলিয়াসী প্রথা চালু করেছে। বড় মুরব্বী ইসমাইল সাহেব তার পীর সাহেবকে আব্বাস পাকের হাতে

মুরীদ করিয়ে জন্ম তরীকত চালু করে। ইলিয়াস সাহেব শব্দের গুরুত্ব বর্ণনা করার লক্ষ্যে তাবলীগী প্রথা চালু করেছে। বড় দুঃখ ওহীর মাধ্যমে প্রাওয়া বহু মূল্যহীন। যদি তাবলীগ বাদীদের ইসলাম বাদের দাবী থাকে তবে ও উহুলের পরিবর্তে ইসলামের পাঁচ স্তোকনের প্রচার করতে আপত্তি কেন?

### মুন্তি' নিম্নানের সমর্থনে ওহাবী নজদী

ওহাবী প্রধান শেখ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী সাহেব তার রচিত পুস্তক কাশ্বুশ শুবহাতের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পৃষ্ঠায় মক্কার কাফেরদের কুফরী কর্মের অর্থিক মুন্তি' নিম্নানকে সমর্থন প্রদান করেছে। ওহাবী সাহেব উক্ত পুস্তকের মধ্যে আব্বাস পাকের হাবীব রাসুলে পাক (৭ঃ) কে দোখী সাব্যস্ত করে বলে, মক্কার কাফেরগণ ছিল নেতার। হযরত মোহাম্মদ (৭ঃ) সেই নেক লোকদের মুন্তি' সমূহ ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ করে বদকার হন।

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর এই বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সে স্বয়ং কাফের মুন্তি' পুজক ছিল। নচেৎ সে কি করে তার পুস্তকে ইসলাম বিরোধী এই কঠাক্য উক্তি করল। প্রিয় নবী হুজুরে পাক (৭ঃ) যে মক্কার কাফেরদের মুন্তি' সমূহ ভেঙ্গে চূর্ণকার করেন তাও আব্বাস পাকের নির্দেশক্রমে। এ মুন্তি' ভাঙ্গার প্রাথমিক কারণ ছিল যে, কাফেরগণ ইসলাম কবুল না করার জন্য, একটি পন্থির মাধ্যমে একটি সন্ধি করেছিল, যার পূর্ণ বর্ণনা আব্বাস পাকের পবিত্র কোরআনে সূরা কাফেরনের মধ্যে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে। এই পবিত্র সূরাটি প্রিয় নবী হুজুরে পাক (৭ঃ) এর উপর মক্কার অবস্থান কালে অবতীর্ণ হয়েছিল।



কাফেরদের দলপতি যেমন ওলীদ, আহ, আসওয়াদ ও উমাইরা প্রিয় নবী হুজুরের পাক (দঃ) এর আশ্রান উপস্থিত হয়ে বললো, আমরা আল্লাহকে পাওয়ার জন্য কতিপয় প্রতিমা নির্মাণ করেছি। আপনি যদি আমাদের এই প্রতিমা সমূহের বিরোধীতা না করেন, তাহলে আমরা আপনার প্রভুর পূজা করতে কোন আপত্তি করব না। তদন্তেরে হুজুর পাক (দঃ) বললেন, আমি ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক ও প্রচারক। ইসলামে মূর্তি পূজার কোন স্থান আদৌ নেই। মূর্তি পূজাতো ধর্মনাশা কার্য। তাই আমি এই কুকর্ম পালনে কাওকে অনুমতি দিতে পারিনা এবং এই কুকর্মের সমর্থনে তোমাদের সাথে কোন সন্ধি স্থাপন করবো না। আমি অচীরে আরব ভূখণ্ড হতে মূর্তি পূজা বন্ধ করার চেষ্টা করবো। এই জবাব প্রদান করতঃ নবী করীম (দঃ) নিজ বক্তব্য শেষ করলেন।

আরবের কতিপয় চিহ্নিত কাফেরদের সাথে উল্লেখিত প্রমোক্তর পর প্রিয় নবী হুজুরের পাক (দঃ) কিছুকাল মক্কার অবস্থান করেছিলেন। তবে তিনি মূর্তি ভাঙ্গার কোন সুযোগ লাভ করতে পারেননি। তিনি ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে হিজরত করে মদীনার চালা যাওয়ার পর হিজরী ৬ সনে খানায় কা'বার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে ১১/১১ শত সাহাবাগণকে সঙ্গে করে মক্কাভিমুখি হয়েছিলেন, তবে তাঁর সে উদ্দেশ্য সফলকাম হয়নি।

হিজরী ৮ সন মোতাবেক ৬৩০ খঃ প্রিয় নবী রাসুলে পাক (দঃ) ৭৯ হাজার সাহাবাদেরকে সঙ্গে নিয়ে মক্কাভিমুখি হন এবং পথিমধ্যে আরব কাফের নেতা আবু সুফিয়ান মুসলমানদের হাতে ধরা পড়ে। প্রিয় নবী হুজুরের পাক (দঃ) সর্ব প্রথম কা'বা গৃহে প্রবেশ করে নির্দেশ দিলেন যে, কা'বা ঘর হতে সমস্ত মূর্তি গুলো ভেঙ্গে চূরে ধূঁরে ফেলে দাও। স্বরূপে তিনি جاء الحق وزحج الباطل এই আয়াত খানা পাঠ করতে করতে মূর্তি সমূহের উপর ধারংকার আঘাত করতে থাকেন। একের পর এক একটি মূর্তিকে ভেঙ্গে আল্লাহ পাকের ঘর (কা'বা শরীফ)-কে প্রতিমা মূর্ত্য করেন।

মূর্তি ও প্রতিমা সমূহকে ভাঙ্গার পর অকসাহের ঘরে ইসলামী তরীকার হজর ও তাওরাতের সঠিক পদ্ধতি চালু করেন। ইতিপূর্বে কাফের কতৃক যে হজর প্রথা চালু ছিল তা ছিল কুফরী কর্ম। মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী সাহেব ইসলামী হজর পদ্ধতিকে পরিহার করে কুফরী পদ্ধতির হজর পালনকে সমর্থন দান করে বলেন, হযরত মোহাম্মদ (দঃ) নেককার কাফেরদের মূর্তি ভেঙ্গে আল্লাহর ঘরে ইসলামী পদ্ধতিতে হজর প্রচলন করার কি প্রয়োজন ছিল।

**সম্মানিত পাঠকবৃন্দ :** মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী তার রচিত ১। কিতাবুত তাওহীদ। ২। কাশফুশ শুবহাত নাম্মী দুটি পুস্তকের মধ্যে ইসলাম ধর্ম ও আল্লাহ পাকের রাসুলের বিরুদ্ধে শতশত কঠাক্ষ উক্তি করেছেন। ধর্মনাশা উক্ত দু'খানা পুস্তক গোপনে গোপনে এতদেশে বাংলা ও উর্দু ভাষায় বহুল প্রচারিত হয়েছে। প্রথম পুস্তকটির মধ্যে লেখা রয়েছে যে, প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ) মরে মাটিতে মিশে গেছেন। হুজুর পাকের বিন্দু, দ্রাষ্টা অদৃশ্যের এলিম ছিলনা ইত্যাদি আরও বহু বাতিল কথা বলেন। দ্বিতীয় পুস্তক খানাতে নজদী সাহেব বলেছে : হযরত মোহাম্মদ (দঃ) কাফের কতৃক নির্মিত মূর্তি ভেঙ্গে অন্যায় করেছেন। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়াটাই অন্যায় হয়েছে। তৎকালীন মুমলমান হতে কাফের মূর্শরিকগণ প্রত্যেক দিক দিয়ে সম্মত ছিল ইত্যাদি ইত্যাদি আরো বহু কুফরী কালাম উক্ত বইখানাতে নজদী সাহেব লিপিবদ্ধ করেছেন। আমি উল্লেখিত পাঠে তার প্রত্যেক কুফরী কালামের জবাব দিয়েছি। আপনারা জবাবগুলো কোরআন সুন্নাহ ভিত্তিক হল কিনা একটু বিবেচনা করুন।



## দ্বিতীয় পাঠ ভারত উপমহাদেশে তরীকত শিক্কার মাধ্যমে ধর্ম প্রচার

অনেকেই ধারণা যে, ভারত উপমহাদেশে স্বয়ং হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) পদার্পন করে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। কিন্তু ইহা ভুল ধারণা, তবে সত্য কথা যে, তাঁরই চেষ্টার মাধ্যমে ভারতে ইসলাম প্রচার সূচীত হয়। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) সর্ব প্রথম কতিপয় সাহাবায়ে কেরামকে ধর্ম প্রচারের লক্ষ্যে ভারতে প্রেরণ করেন। যাদের প্রধানের নাম ছিল 'সাহাব' বিন সাকরা (রাঃ)। তিনি তাঁর কতিপয় সঙ্গী সাহাবাকে নিয়ে প্রথম ভারতের "সিন্দু" ও পাজাবে আগমন করেন। কয়েক বছর পর্যন্ত তাঁরা সে স্থানে অবস্থান করে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে ইসলাম ধর্মের বিধি বিধান প্রচার করতে থাকেন। সাহাবা কেরামদের পর ভারত উপমহাদেশে আওলীয়া কেরামগণ ধারাবাহিক ভাবে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। যাদের কতিপয় আওলীয়াদের নাম যথাক্রমে এই : হযরত খাজা মুয়িযুদ্দীন চিশ্তী (রহঃ)। হযরত দাতাগঞ্জ বখস (রহঃ)। হযরত গাজে শকর ফরিদ (রহঃ)। হযরত গাউস বাহাউল হক (রহঃ)। হযরত মোজাফ্ফদ আলফ সানী (রহঃ)। আরও বহু, আওলীয়ায়ে কেরামগণ ভারত যথেষ্ট বহু, আত্মত্যাগের মাধ্যমে প্রিয় নবী হুজুরে পাক (সঃ) এর প্রবর্তিত ইসলাম ধর্মের বিধি বিধানকে যথারীতি প্রচার করেন।

ধর্ম প্রচারকগণের কারো কারো জন্মভূমি ভারত উপমহাদেশ হলেও তাঁদের অনেকের পূর্ব পুরুষগণ ছিলেন নবী, সাহাবী ও আওলীয়ায়ে কেরামগণ। আওলীয়ায়ে কেরামদের প্রথমে ধর্ম প্রচারের মাধ্যম ছিল

মৌখিক। পরবর্তী যুগে মৌখিক প্রচারের সঙ্গে সংযোজন করা হল তরীক-কারে তরীকত বা বাইয়াত। এই দুই পদ্ধতির মাধ্যমে আওলীয়ায়ে কেরামগণ যুগ যুগ ধরে ধর্ম প্রচারে আত্ম নিয়োগী হন।

একদল ক্ষুদ্রজ্ঞানী মৌলভীগণ বলেন যে, আওলীয়াগণ যে তরীকত ও বাইয়াত এর যে, নিয়ম চালু করেছেন তা শরীরত সম্মত নয়। কারণ প্রিয় নবী রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর যুগে এই দু'টি নিয়ম নীতির আদৌ প্রচলন ছিলনা। আওলীয়ায়ে কেরামগণ এই প্রথাকে আবিষ্কার করেছেন। প্রত্যেক নতুন পদ্ধতি বা আবিষ্কার বেদআতের শামিল।

আমরা বলি যে, যদি আওলীয়াগণ বাইয়াত বা তরীকত শিক্কার প্রচলন না করতেন তবে ভারত উপমহাদেশের মানব অমুসলিম থেকে যেতো। আওলীয়াদের এই অবদানের ফলে আজ আমরা মুসলমানের দাবীদার হইছি।

## বাইয়াতে রাসুল ও বাইয়াতে সাহাবার মাধ্যমে তরীকত শিক্কা

বাইয়াত ও তরীকতকে আবিষ্কার বা বেদআত বলা প্রকাশ্য অজ্ঞতা। কারণ স্বয়ং মহানবী হুজুরে পাক (সঃ) বাইয়াতে রেদওয়ান প্রতিষ্ঠা করে এ সুপ্রথার প্রচলন করান। আর মক্কা বিজয়ের দিন সাফা পাহাড় ও মকার আশিনার হযরত আবুবকর সিন্দিক (রাঃ) ও হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর হাতে মহানবী হুজুর (সঃ) সকল বিধমণীকে বাইয়াত হবার নির্দেশ দেন। এতে প্রমাণিত ও প্রতিয়মান হল যে, উপরে উল্লেখিত দু'টি প্রথার প্রচলন নবী ও সাহাবাদের যুগেও প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক যুগের আওলীয়ায়ে কেরামগণ ইসলাম প্রচার কেটে উক্ত দু'প্রথার অনুসরণ করে আসছেন। বাইয়াত ও তরীকত এই দু'প্রথা শব্দ, ধর্ম প্রচার কেটে



প্রযোজ্য। যেমন মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) শূদ্ধ ইসলামী আন্দোলন কে সম্মত করার লক্ষ্যে সাহাবায়ে কেরামদের হাতে অঙ্গীকার নেন। এই ইসলামী অঙ্গীকার পরবর্তীতে সুন্নাতে রাসুল রূপে আখ্যায়িত হয়। আর সাহাবায়ে কেরামগণের কর্ম অনুসরণ পদ্ধতি সুন্নাতে রূপান্তরিত হয়। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে : **عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين** রাসুলে পাক (দঃ) এরশাদ করেন, হে আমার উম্মতগণ। তোমাদের উপর আমার কৃতকর্মকে যে রূপে যথাযথভাবে পালন করা সুন্নাত, ঠিক তেমনই খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল পদ্ধতিকে যথাযথভাবে পালন করাও সুন্নাত। হুজুরে পাক (দঃ) এর কর্ম অনুসরণ ও সাহাবায়ে কেরামদের কৃতকর্ম পালন পদ্ধতি সুন্নাতে রূপান্তরিত হওয়ার মূল কারণ হল যে, সাহাবায়ে কেরামগণ কর্ম পালন ক্ষেত্রে হুজুর (দঃ) এর পূর্ণ অনুসরণ করতেন। সে হিসেবে সাহাবাগণের অনুসরণ করা হুজুরে পাক (দঃ) এর অনুসরণের নামমাত্র। আর আওলীয়ায়ে কেরামগণ মহানবী ও সাহাবায়ে কেরামগণের কর্মের অনুসরণ করতেন। তাঁরা ভারত উপমহাদেশে তরীকতের মধ্যে যতটুকু ধর্ম প্রচারে অগ্রসর হয়েছেন তাঁদের এই অবদানের ফলে আজ আমরা মুসলমান হওয়ার দাবীদার হই। যদি তাঁরা কোন বেদীনকে শূদ্ধ ইসলামী কালেমা পাঠ করায় তরীকতহীন বা লাগামহীন ভাবে ছেড়ে দিতেন তাহলে তাদের এই ইমানী কালেমা পাঠ হয়ত অর্থহীন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল অতি প্রবল।

সাহাবায়ে কেরামগণ প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) এর কর্ম পালন পদ্ধতিকে অকরে অকরে অনুসরণ করেছেন। তদ্রূপ এক আওলীয়া পূর্ববং আওলীয়ার কর্মের পূর্ণ অনুসরণ করেছেন। যেমন হযরত খাজা মুরিশ-নুদ্দীন চিশতী (রহঃ) এর পূর্ণ অনুসরণ করেন হযরত মোজাম্মেদে আলফে সানী (রহঃ)। তাঁদের পর খাটি ওলী উল্লাহগণও তরীকত প্রচার ক্ষেত্রে সামান্য বজার রেখে চলেছেন। ভারত উপমহাদেশের পূর্ববং সকল আওলীয়াগণ বংশগত দিক দিয়ে প্রায় সম্পর্কিত ছিলেন নবীর বংশের

সাথে। অথবা সাহাবা অথবা আওলায়ে রাসুল বর্গের সাথে। যেমন শাহ জালাল (রহঃ) ছিলেন মহানবী রাসুলে পাক (দঃ) এর প্রশংসিত ইয়ামন প্রদেশের অধিবাসী। তাঁই তাঁকে শাহ জালাল ইয়ামনী বলা হয়। মোজাম্মেদে আলফে সানীকে আল ফারুকী বলা হয়। কারণ তিনি হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর বংশধর। খাজা মুরিশ-নুদ্দীন চিশতী (রঃ) ছিলেন শাহ আবদুল কাদের জীলানী (রহঃ) এর ভাগনে। আবার তিনি ছিলেন হযরত হাসান হোসেন (রাঃ) এর বংশধর।

উপরে উল্লেখিত আওলীয়ায়ে কেরামগণের বদৌলতে ভারত বর্ষে ইসলাম প্রচার সূচীত হয়। তাঁরা ইসলামের রীতিনীতিকে যথাযথ ভাবে পালনের জন্য একটি নতুন পথ আবিষ্কার করেন, যার নাম হল তরীকত। এই খাটি তরীকত পরিপন্থী বস্তুগুলো নতুন পথ বের করা হয়েছে সেগুলো হল বাস্তব পথ। সেই পথের পথিক হলে দোখখে ঘাওরা ছাড়া অন্য কোন উপার নেই।

### ভারতে নতুন তরীকত উদ্ভার :

ভারত উপমহাদেশে ওহাবী তরীকা আনয়নকারী জনাব ইসমাইল দেহলভী স্বমাতৃভূমি ভারতে একটি নতুন তরীকত উদ্ভার করেন। যার নাম ছিল "তরীকতে তাওহীদ"। অর্থাৎ আন্লাহর পথের পথিক হওয়া। তবলীগী তরীকত যে রূপে প্রাপ্য ছিল, তদ্রূপ এই নতুন তরীকত খামাও স্বপ্নে পাওয়া ছিল। দেহলভী সাহেব স্বপ্নে দেখলেন যে, আন্লাহ পাক তার বক্তৃ সৈয়দ আহমদ গেলভীকে নিজ হাতের মশো রেখে ফরজ প্রদান করেছেন। সৈয়দ সাহেবকে এই স্বপ্নের কথা যখন বলা হল তখন তিনি খোদার হাতের মুরীদ হওয়ার দাবীদার হয়ে প্রথম মুর্তাদ বানালেন ইসমাইল সাহেবকে। এই নতুন তরীকতের বিস্তারিত কাহিনী ইসমাইল



কর্তৃক প্রকাশিত সিরাতুল মুস্তাকীম নামক ফার্সী কিতাবের ১৬৪ পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে। খোদার তরীকত হতে ভারত উপমহাদেশে সুন্নী নীতি-মালার পরিপন্থী আর একটি নতুন পদ্ধতি চাল, হয়। এ নতুন তরীকতের অনুসারী হলেন প্রত্যেক ওহাবী ফেকর লোকেরা।

## সম্রাট আকবরের ‘দীনে এলাহী ও মোজাহেদে আলফে সানী (রহঃ) এর মোজাহেদিয়া তরীকা

সম্রাট আকবরের আমলে ওলীয়ে কামেল ইমামে রব্বানী হযরত মোজাহেদে আলফে সানী (রহঃ) তাঁর গবেষণামূলক বিশেষ নিরূপণ নীতির তরীকতের মাধ্যমে ভারত উপমহাদেশের মানুষকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। তাঁর সেই নীতি সমূহের মধ্যে অন্যতম নীতি ছিল লঙ্গর খানা ও খানকার ব্যবস্থা। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে শাসক, অধোলিত সাধারণ জনতা যারা বড় গরীব দুঃখী এবং দুঃবেলা খাবার পেতনা তারা এই লঙ্গর খানার এসে ভিড় জমাত। মোজাহেদে আলফে সানী (রহঃ) এসব গরীব দুঃখী-দের মধ্যে খাবার পরিবেশন করতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে ইসলা-মের নীতিমালা বিস্তার করতে থাকেন। মোজাহেদে আলফে সানীর এই সুন্দর নীতি দেখে ধীরে ধীরে জনসাধারণ মোজাহেদুনদীয়া তরীকার শামিল হতে থাকে।

সম্রাট আকবর দেখলেন যে, মোজাহেদুনদীয়া তরীকা পালন করতঃ ভার-তের সাধারণ অসাধারণ মানুষ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যাচ্ছে। তখন সে এই তরীকার পরীপন্থী একটি নতুন ধর্ম হত প্রচার শুরু করেন, যার নাম ছিল ‘দীনে এলাহী’ মোজাহেদে আলফে সানী (রহঃ) সম্রাট আকবরকে

কুৎসালেন যে, প্রিয়নবী (দঃ)-এর ‘দীনে ইসলাম’ বিদ্যমান থাকতে আপনার মনগড়া ধর্মের কোন মূল্য নেই। এ ছাড়া আল্লাহ পাকেরতো কোন খাছ ধর্ম নেই। ধর্ম তো নবীগণের ছিল। আপনার দীনে এলাহীকে ধর্ম নাম করণ করেন তবে সে ধর্মের প্রবর্তকের নাম কি? অর্থাৎ হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এর ইসলাম ধর্মের স্থানে আপনার ‘দীনে এলাহী’ ধর্মটি বাতিল ধর্ম রূপে গণ্য। আপনি এ বাতিল ধর্ম প্রচার হতে বিরত থাকুন। শেষ পর্যন্ত মোজাহেদে আলফে সানী (রহঃ) আমোদন করে সম্রাট আকবরের দীনে এলাহী নামের তথাকথিত ধর্মকে বাতিল ধর্ম বলে ঘোষণা দেন। অন্য দিকে মোজাহেদে আলফে সানী (রহঃ) ভারত বর্মের মানুষকে তরীকত পন্থী করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে তোলেন। তাঁর তরীকতের রূপরেখা নিম্ন রূপ :

ইমামে রব্বানী হযরত মোজাহেদে আলফে সানী (রহঃ) ছিলেন :  
১। নকশ্বন্দীয়া। ২। চিশ্তীয়া। ৩। কাবেরীয়া। ৪। সহরাওয়ারীয়া। ইত্যাদি সকল তরীকার একজন কামেল পীর ও খলিফা। তবে তাঁর নিজের নকশেবন্দীয়া তরীকাটি পালনক্ষেত্রে অত্যন্ত সরল সহজ ছিল। তাই এই তরীকাটি ভারত উপমহাদেশে জনপ্রিয় হয়।

## খ্যাতনামা জ্ঞান ডান্ডার শাহ ওলী উল্লাহ মোহাম্মদে দেহলভীর তরীকত প্রশিক্ষণ

শাহ ওলী উল্লাহ মোহাম্মদে দেহলভী (রহঃ) এর পিতা শেখ আব-দুর রহীম (রহঃ) হতে তিনি তরীকত শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর উক্ত শিক্ষা লাভ হয়েছিল মক্কা ও মদীনার বিশিষ্ট আলেমগণ হতে। তিনি প্রথমে



ভারত উপমহাদেশে প্রায় নব্বী হুজুর (দঃ) এর হাদীস শাস্ত্রে বিস্তারের প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাই তিনি ইমামে আহলে সুন্নাত নামে খ্যাত তিনি ভারত উপমহাদেশে এলমে দীন বা ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারের জন্য ৬০টি বিশাল গ্রন্থাবলী রচনা করেন। ভারত উপমহাদেশে শাহ ওলী উল্লাহ (রহঃ) এর সুভাগমণ না হলে আমার মনে হয় এতশেষের সকল মানুষ মূর্খ জাহেল ও অজ্ঞ থেকে যেত। তৎকালে ভারত উপমহাদেশের মুসলমানগণ আল্লাহ পাকের বাণী পবিত্র কোরআন পাকের শূন্য তেলা-ওয়ারত করাই জানতো। কোরআনের মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারতো না। সর্ব প্রথম তিনি ভারত উপমহাদেশে ফার্সী ভাষায় কোরআনের অর্থ প্রকাশ করাইলেন। কেননা তৎকালীন রাস্ট ভাষা ছিল ফার্সীতে। তাঁর এ বিরাট অবদানকে তৎকালীন কুদ্রজ্ঞানী তথাকথিত আলেমগণ বরদাশত করতে পারে নি। তার বিরুদ্ধে অর্থাৎ ফার্সী ভাষায় কোরআনের অনুবাদ করাকে কোরআন অবমাননাকর বলে প্রতিবাদের প্রবল কড় তুলেছিল। শাহ সাহেব এই অবুদ্ধ মৌলভীগণকে বুকায় সামাল দিতে বড় কষ্ট হইয়াছিল। তারা শূন্য ফোরকানীয়া মাদ্রাসা স্থাপন করে কোরআন শিক্ষা করা কোরআন নাজিল এর প্রধান লক্ষ্য ছিল বলে অনুধাবন করতো। শাহ সাহেব (রহঃ) বুকায় কোরআন নাজিল হওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য হল কোরআনের মর্মার্থ অনুধাবন করা। যে কোন ভাষাযেই হোক না কেন কোরআনের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা বর্ণনা করা কোরআন নাজিলের উদ্দেশ্যের শামিল। শেষ পর্যন্ত উক্ত মৌলভীগণ শাহ সাহেবের কোরআনের ফার্সী অনুবাদকে ধর্মীয় খেদমত বলে আখ্যা দিতে বাধ্য হয়। শাহ (রহঃ) সাহেব অনুবাদ রচনা ও গ্রন্থাবলী দ্বারা যেচরুপ ভারতে ইসলামের শিক্ষা বিস্তার করেন, তদ্রূপ তিনি মোহাম্মদে আলফে সানীর তরীকত শিক্ষাকে অকরে অকরে পালন করে ধর্ম শিক্ষার প্রচলন করেছিলেন। শাহ সাহেবের পর তাঁর স্মরণ দন্য ছেলেরাও তাঁর উল্লেখিত দুই ধরনের ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে আত্মনি-দেগ করে ছিলেন। তবে শাহ সাহেবের এক নীতি যার নাম ছিল মৌলভী

ইসমাইল দেহলভী সে বাপ দাদার সমুদ্রত সুন্নী নীতিমালার বিরুদ্ধে একটি নতুন তরীকত উদ্ঘাটন করেন যার নাম ছিল "খোদার তরীকত"। কিন্তু এই আধুনিক তরীকতটি অন্ধুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়।

শাহ ওলী উল্লাহ মোহাম্মদে দেহলভী (রহঃ) মানুষের মধ্যে রচনাবলী ও গ্রন্থাবলী দ্বারা যেচরুপ শিক্ষার আলো বিস্তার করেছিলেন তদ্রূপ তার পাশাপাশি তিনি আর একটি নতুন পদ্ধতি চালু করেছিলেন। যার নাম তরীকত শিক্ষা। এই তরীকত দ্বারা সাধারণ মানুষ বিশেষ ভাবে উপকৃত হত। শাহ সাহেব এই দুই পদ্ধতির মাধ্যমে আজীবন ভারত উপমহাদেশে ধর্ম বিস্তারের সংগ্রামে আত্মত্যাগ করেছিলেন। তাঁর বুদ্ধ বয়সে তাঁর বড় ছেলে আললাম শাহ আবদুল আজিজ (রহঃ) মোহাম্মদে দেহলভীর হস্তে উপরে উল্লেখিত দুই বিষয়ের ইসলামী খেদমতকে যথা যথভাবে পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। তিনি ও তাঁর পিতার উপদেশ ও নির্দেশকে অকরে অকরে পালন করেন। তবে তাঁর শেষ জীবনে আহলে সুন্নাতের নীতিমালা ও ধর্ম বিরোধী দু'টি ভ্রান্ত মতবাদী দল মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। প্রথম দলের নাম শিরামতবাদী এবং দ্বিতীয় দলের নাম মহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর অনুসারী ওহাবী ফেকা।

### শাহ আবদুল আজিজ কর্তৃক শিয়া দমন :

শাহ আবদুল আজিজ মোহাম্মদে দেহলভী (রহঃ) শিয়া দলকে দমন কর্পে 'তোহফা ইসনা আশারীয়া' নামক একটি বিশাল গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেই গ্রন্থাবলীর মধ্যে সুন্নী ওলামায়ে কেতামদের সংহস্ত দস্তখত রয়েছে। এই দমন নীতির পর হতে শিয়া দল ভারত উপমহাদেশ হতে চিরতরেই জন্ম গ্ৰহণ করে যায়। ওহাবী ফেকা পন্থীগণ শিয়া দলের সমর্থনে বহু ফতোয়া রচনা করেও বাধ্য হয়। শাহ সাহেব বহিরাগত ধর্ম শত্রুদেরকে



দমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর বংশের ইসমাইল দেহলভী নামক একজন সুন্নী নীতিমালার পরম শত্রুকে দমন করতে সক্ষম হননি। সে একটি পারিবারিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের নীতিমালার উপেক্ষা করে জন্ম দিল ভারতের বৃহৎ ওহাবী ফেকা বনাম খারেজী মাযহাব। আমি এখন ওহাবী মাযহাব প্রবর্তনের ঘটনা বর্ণনা করছি।

### ভারত বর্ষে ওহাবী ফেকা

ইসমাইল দেহলভী ছিল ইমামে আহলে সুন্নাত শাহ আবদুল আজিজ মোহাম্মদে দেহলভীর আপন ভাতিজা। ইসমাইল সাহেব বাল্য শিক্ষা হতে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত সম্পন্ন করেছিল শাহ সাহেবের নিকট। তবে সে একটি পারিবারিক বিবাদকে কেন্দ্র করে খৃঃ হার। হয়ে ভারত উপমহাদেশে ওহাবী নামের এক নতুন ফেকার উদ্ভব ঘটায়।

শাহ আবদুল আজিজ মোহাম্মদে দেহলভী (রহঃ) সকল ভাইদের মধ্যে বড় ছিলেন। ইচ্ছাকালের পূর্বে তিনি তাঁর পিতার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিকে একটি বন্টক নামার মাধ্যমে প্রত্যেক হুকদারের মধ্যে ভাগ বাট-ওয়ারা করেন। ইসমাইলের পিতা তার বাদা বিদ্যমান থাকতে মৃত্যু বরণ করার কারণে সে তার দাদার সম্পত্তি থেকে আল্লাহর আইনেই বঞ্চিত হয়। তারপরও দয়া করে শাহ আবদুল আজিজ দেহলভী নিজের অংশ ও অন্যান্য ভাইদের অংশ হতে কেটে এই পরিমান সম্পত্তি ইসমাইলের জন্য নিধারণ করেন যাতে সে শাহ বংশে বসবাস করতে পারে। কিন্তু ইসমাইল আপত্তি করল যে, আমি আমার বাবার পুরো অংশ চাই, নচেৎ আমি মোটেই কিছু নিবনা। শাহ আবদুল আজিজ দেহলভী (রাঃ) বুঝালেন যে, তুমি আল্লাহ পাকের আইন মোতাবেক সম্পত্তি মোটেই পাছনা সে ক্ষেত্রে আমি তোমার জন্য উল্লেখিত হারে কিছু সম্পত্তি নিধারণ করছি। তুমি আমার এই সিদ্ধান্ত মেনে নাও।

ইসমাইল দেহলভী চাচার বন্টকী সিদ্ধান্তের অবহেলা করে ঘর ছাড়া হয়ে নতুন বৃদ্ধি খাটার। ইসমাইল বড় বক্তা ছিল, অনেক দিন পর্যন্ত দেশে দেশে গ্রামে গঞ্জে ওয়াজ নসিহত করে বেড়ায়। মানুষ তাকে শাহ ওলী উল্লাহ মোহাম্মদে দেহলভী (রহঃ) এর নাতি হিসেবে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করতো।

ইসমাইল সাহেব দেশে ফিরে কিছ, দিন পর শাহ আবদুল আজিজ মোহাম্মদে দেহলভী (রহঃ) এর এক জামাতা মৌলভী আবদুল হাই (মাহমী) কে পক্ষ করে শাহ সাহেবের কিছ, সম্পত্তি জবর দখল করে নেয়। আর প্রকাশ্য বন্টক নামার উপেক্ষা করতে থাকে। এতে ইসমাইলের কোন লাভ হল না, কারণ শাহ আবদুল আজিজ সাহেবের অন্যান্য ভাইগণ বন্টন নামার পক্ষে ছিলেন। তাঁরা সকলে একত্রিত হয়ে ইসমাইলকে সম্পত্তি হতে বদখল করে দিলেন।

ইসমাইল সম্পত্তি পুনঃ দখল করার জন্য ভারত বিখ্যাত শরীর চর্চাবিদ এবং বড় লাঠিওয়াল নৈয়দ আহম্মদ রেলভীর নিকট গমন করে। রেলভী সাহেব বললেন সম্পত্তির দখল করার পূর্বে শাহ আবদুল আজিজ মোহাম্মদে দেহলভীর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ইমামত দখল করে লও। অথবা তাঁর এই ইমামতের বিপক্ষে নতুন কোনরকীকা কার্যে মর। ইসমাইল সাহেব বহু চিন্তা ভাবনা করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিপক্ষে প্রথমে খারেজী মাযহাব সমর্থন করে। পরবর্তীতে এই মাযহাব খানাকে ওহাবী মাযহাবে রূপান্তর করেন। অন্য দিকে নৈয়দ আহম্মদ রেলভী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ইমামতের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য শাহ আবদুল আজিজ মোহাম্মদে দেহলভীর শিষ্য লাভ করেন। কিছু দিন বেতে না বেতে শাহ সাহেবকে বলে আমার জাহেদী শিক্ষা বন্ধ করুন। আমি কালো অক্ষর সাদা দেখছি। শাহ সাহেব বৃদ্ধিতে পারলেন যে, নৈয়দ আহম্মদের মতলব খাড়াপ। কালো অক্ষর সাদা দেখ-নির তথাকথিত অর্থ এই যে, সে কামালিয়ারের দরজার পৌঁছে গেছে।



তখন শূধ, বাকী রয়েছে আমার থেকে আহলে সুন্নাতের খেলাফতটা নেয়া। শাহ আবদুল আজিজ মোহাম্মদে দেহলভী (রহঃ) এই কুমতলবী ছাত্রের উপর রাগান্বিত হয়ে নিজ ভাই শাহ আবদুল কাদের দেহলভীকে বললেন, তেলভীকে আমার পাঠশালা হতে বের করে দাও। শাহ আবদুল কাদের (রহঃ) তাকে বের না করে কিছ, দিন পর্বন্ত নিজেই শিক্ষা প্রদান করেন। কিন্তু তেলভীর শিক্ষালাভের একই নতিজা দাড়ালো যা আবদুল আজিজ দেহলভী (রহঃ) এর নিকট দাঁড়িয়েছিল।

শাহ আবদুল আজিজ মোহাম্মদে দেহলভী (রহঃ) এর উল্লিখিত তেলভী ও ইসরাইল দুজন বিদ্রোহী ছাত্র কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শাহ সাহেবের সুন্নী নীতিমালাকে বধনাম করার জন্য নতুন আন্দোলন শুরু করেন। সৈয়দ আহাম্মদ তেলভী সাহেব হজর পালনের ভান করে মক্কার গিরে ওহাবী নীতিমালার কিতাবত তাওহীদ নামক পুস্তক খানা কতিপয় নজদবাসীর মাধ্যমে দিল্লী প্রেরণ করান। উক্ত বই খানা ইসমাইলের হস্তগত হওয়ার পর তিনি বইখানার উদ্ অনুবাদ করে হিন্দুস্থানে প্রচার শুরু করেন। এই অনুবাদের নাম রাখা হয়েছিল তাকবীরাতুল ইমান।

### ওহাবী ফেকার সাথে সুন্নীদের

#### প্রথম বহছ :

এই ধর্মনাশা পুস্তকের সমর্থন নেয়ার জন্য ১২৪০ হিজরী সনে ইসমাইল সাহেব মৌলভী আবদুল হাই এবং মৌলভী আবদুল গণি মাহমী সাহেবানকে সঙ্গে করে দিল্লী জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে সুন্নী ওলামারে কেরামদের সঙ্গে তর্ক বহছে উপনীত হন। বহছের বিষয় বস্তু অনেক ছিল তন্মধ্যে প্রথম বিষয় ছিল যে, হযরত নবী করীম (সঃ) একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন এবং আমাদের মত মানুষ ছিলেন।

সুন্নী ওলামারে কেরামগণ উল্লিখিত মিথ্যা ও ভ্রান্ত প্রশ্নের দাঁত ভাঙ্গা উত্তর দিলেন। তখন ইসমাইল দেহলভী নিরোত্তর হয়ে পালাবার চেষ্টা করেন এবং পালায়েও গেলেন।

ইসমাইল সাহেব বহছে অপদত্ত হওয়ার পর বিশেষরূপে সৈয়দ আহাম্মদ তেলভীর নিকট গিয়ে বললেন যে, তর্ক বহছ দ্বারা ওহাবী নীতিমালা বাস্তবায়ন করা অসম্ভব, তাই এখন হতে আমার নতুন তরীকত পন্থী হতে হবে। তাই আপনি আমাকে সেই নতুন তরীকতের সবক প্রদান করুন। এই কথা প্রাতি উত্তরে সৈয়দ সাহেব বললেন, আমার নিজেরই তরীকতের বাইরাত নেই সেক্ষেত্রে আমি তোমাকে তরীকতের সবক দিলে তা বিশ্বাস করবে কে? ইসমাইল সাহেব নিরাশ হয়ে তেলভী সাহেবকে বললেন, আমি আপনার জন্য তরীকতের সবকেব বিশেষ ব্যবস্থা করছি আপনি শান্ত থাকুন। শেষ পর্বন্ত ইসমাইল সাহেব সৈয়দ আহাম্মদ তেলভী সাহেবকে নিন্ম নিয়মে আম্লাহ পাকের হাতে বাইরাত করালেন। এই আধুনিক নিয়মের এই তথাকথিত বাইরাতের ঘটনাটি ইসমাইল দেহলভী তার ফার্সী কিতাবের মধ্যে নিন্মরূপে বর্ণনা করেন।

#### খোদার হাতে প্রথম যুরীদ হন কে :

روزے حضرت جل وعلا دست راست ایشان را به دست  
قدوس خاص غود گرفتند و چیز را از امور الله سید که رفیع  
و به سج بود پیش روئے حضرت ایشان که ده لرمود که  
لرا چنیس دادم و چیزهایی دیگر خواهم داد - (صراط  
المستقیم لارسی مصنفه محمد اسماعیل صاحب عمده  
مطبوعه مجتبیائی)



ইসমাইল দেহলভী সাহেব বলেন : একদা আল্লাহ পাক জন্মকু  
সৈয়দ আহাম্মদ রেলভী সাহেবের হাতকে চেপে ধরে কতিপয় উচ্চমানের  
অমিতীয় পাক পবিত্র বস্তু তাঁর হাতে প্রদান করে বলেন, হে সৈয়দ !  
এই মৃত্যুতে আমি তোমাকে এতটুকু ফরজ দিলাম। পরবর্তীতে আমি  
তোমাকে আর অনেক ফরজ প্রদান করতে ইচ্ছা রাখি। অর্থাৎ এতমুদে  
পীরগণ সাধারণ মানুষকে যেমন মুরীদ করার জন্য পীরের হাতের উপর  
মুরীদের হাতকে রেখে বাইয়াত করান, অবিকল সেই রূপ আল্লাহ পাক  
সৈয়দ সাহেবের ডান হাতকে তাঁর নিজ হাতে রেখে মুরীদ করেনিলেন।

لرمود له كه امر وز حق جل وعلا بمحض عنایت خود  
بلا توسط احدی اختتام بصوت چشمتی بما ارزائی داشت  
(صراط المستقیم ۱-۱۶۶)

সৈয়দ আহাম্মদ রেলভী সাহেব আল্লাহ পাকের হাতের মুরীদ হওয়ার  
পর একটি ঘোষণা দিলেন যে, আল্লাহ পাক নিজেই করুণা করে কোন  
মানুষের উসিলা ছাড়া একক ভাবে আমাকে চিশতিয়া তরীকা বখশিস  
করলেন। অর্থাৎ শাহ আবদুল আজিজ মোহাম্মদে দেহলভীর মোজা-  
ন্দেদিয়া তরীকার আমার আদৌ প্রয়োজন নেই।

اذان طرق حکم شد که هر که بر دست او بصیعت خواهد  
کرد خرمیگ را کفایت خواهم کرد (ص ۱۶۵) -

আল্লাহ পাক সৈয়দ সাহেবকে মুরীদ করার পর এক ঘোষণার মাধ্যমে  
বললেন : হে সৈয়দ সাহেব ! তুমি যাকে ইচ্ছে কর (হিন্দু বৌদ্ধ) সকলকে  
মুরীদ করতে পার, এতে আমার সম্পদ সন্মতি রয়েছে।

অর্থাৎ সৈয়দ আহাম্মদ রেলভী আল্লাহ পাকের হাতে মুরীদ হওয়ার  
পর একটি ঘোষণা দিলেন যে, আমি চিশতিয়া তরীকার পীর। যার যার  
ইচ্ছে এই চিশতিয়া তরীকার বাইয়াত হতে পার। এই ঘোষণার পর পরই  
সর্ব প্রথম ইসমাইল দেহলভী সাহেব সৈয়দ সাহেবের হাতে মুরীদ হলেন।

আর তিনি হিন্দুস্থানের মধ্যে ঘোষণা করে দিলেন তোমরা মোজান্দেদিয়া  
তরীকা পরিহার করে চিশতিয়া তরীকার মুরীদ হও। কারণ এ চিশতিয়া  
তরীকার উদ্ভাবক হলেন শ্বরং আল্লাহ পাক।

অতঃপর ইসমাইল দেহলভী সাহেব ওরাজ নছিহতের ডান করে সৈয়দ  
সাহেবের তরীকত প্রচারের জন্য আফগানিস্থানে গমন করেন। সেখানেও  
তিনি এই আধুনিক তরীকত বিস্তার করতে গিয়ে আফগানী ওলামাদের  
হস্তে বহু নাজেহাল হন। সকলেই খোদা প্রাপ্ত তরীকতের কথা শুনেন  
অবাক হন। কারণ আল্লাহ পাক হলেন নিরাকার তাঁর হাত পা নেই,  
সেক্ষেত্রে সৈয়দ সাহেব আল্লাহ পাকের হাতে কিরূপে মুরীদ হলেন ?  
একথাটি কোন অজ্ঞ বুদ্ধিহীনও মনে নিবে না।

### আল্লাহ পাকের তরীকত বর্টন :

অতঃপর ইসমাইল দেহলভী সাহেব শ্বরং পাগল। মনে হিন্দুস্থানের  
অলিগলী দেশ দেশান্তরে পৰ্য্যন্ত পেঁচেগিয়েও তার পীর সাহেবের আধুনিক  
খোদা প্রদত্ত চিশতিয়া তরীকা বিস্তার করতে পারলেন না। অবশেষে তিনি  
বঙ্গ মর্যাদা হয়ে ১৮২০ ইং সৈয়দ আহাম্মদ রেলভী সাহেবকে সঙ্গে করে  
কলিকাতায় উপস্থিত হন। এ উপস্থিতির মূল উদ্দেশ্য ছিল যে, মানুষদেরকে  
সৈয়দী তরীকত যাতাকলে আবদ্ধ করা। ঠিক সে সময় শিখদের বিরুদ্ধে  
ভার্য পীর মুরীদ দৃষ্টিতেই জিহাদ করার জন্য কলিকাতায় অধিবাসীদেরকে  
আহবান করেন। কলিকাতার অধিবাসী মুসলিমগণ ইসমাইল দেহলভীকে  
জিজ্ঞাসা করলেন যে, আপনি শূন্য শিখ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার  
জন্য সৈয়দ সাহেবের হাতে বাইয়াত নিতে চাচ্ছেন, তবে মুসলমানদের পরম  
শত্রুদল (ইংরেজ জাতি) তাদের বিরুদ্ধে কিছ, বলছেন না বেন ? ইসমাইল  
সাহেব তদোত্তরে বললেন যে, ইংরেজ জাতি হতে আপাতত আমাদের তত্ত



ক্ষতি হচ্ছে না। তাই আপনারা শিশু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য পীর সাহেব কেবলার সঙ্গে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হউন।

ইসমাইল সাহেবের এই অশ্রুঙ্করা ওয়াজ শ্রবণ করার পর অনেক লোক শিশুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার লক্ষ্যে সৈয়দ আহাম্মদ ব্রেলভীর সঙ্গে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। তবে কলিকাতার কোন মুসলমান সৈয়দ সাহেবের হাতে তরীকতের বাইরাত হন নি। আমাদের অগ্র দেশের অনেক লোক ভুল ধারণা পোষণ করে চলেছেন যে, সৈয়দ আহাম্মদ ব্রেলভী সাহেবের হাতে অনেক বাঙালী মুরীদ হয়েছিল ইহা ভুল ধারণা মাত্র।

(ভাওয়ালিখে আজিবা পৃঃ নং ৭০ তারিখে মাযহাবে ইসলাম লাহোর হতে প্রকাশিত ৬৬০ পৃঃ দেখুন)

ইসমাইল দেহলভী যখন সৈয়দ আহাম্মদ ব্রেলভীকে আল্লাহ পাকের হাতে মুরীদ করে গোমরাহ করলেন তখন ভারত উপমহাদেশে শূখ, মোজাম্মেদিয়া তরীকার প্রচলন ছিল। এই তরীকার প্রধান পীর ছিলেন ইমামে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত আল্লামা শাহ আবদুল আজিজ মোহাম্মদসে দেহলভী (রহঃ) তিনি সৈয়দ সাহেবের খোদা প্রাপ্ত তরীকতের কষ্টে নীতির হাল চালা দেখে বড় অসন্তুষ্ট হন।

অতঃপর শাহ সাহেব তাঁর মোজাম্মেদিয়া তরীকার পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব ভার শাহ সুফী মাওলানা নূর মোহাম্মদ (রহঃ) এর উপর অর্পণ করেন। সুফী সাহেব যখন কলিকাতা হতে নেজাম পুর হিজরত করে আসেন তখন তিনি এই মোজাম্মেদিয়া তরীকার পরিচালনার দায়িত্ব ভার মাওলানা ফতেহ আলী বখশমানীর হাতে অর্পণ করে আসেন। এ তরীকাটি পরবর্তীতে চলে আসে হযরত মাওলানা আব্দুসসব্বির সিংহীকীর নিকট।

## শাহ সুফী গাজী নূর মোহাম্মদ (রহঃ)

### এর বঙ্গ ভারতে আগমন :

"আনউল্লাহুন নিরাইন" কিতাবে আলোচিত রয়েছে যে, শাহ সুফী নূর মোহাম্মদ (রহঃ) এর পূর্ব পুরুষগণ গজনির অধিবাসী ছিলেন। তাদের বঙ্গ-ভারতে আগমন উপলক্ষে একটি সুন্দর কাহিনী রয়েছে। গজনির বাদশাহ্‌গণের মধ্যে বখতিয়ার নামক এক সুবরাজ ছিলেন। তাঁর পিতা তাঁকে কুতুবুল আলম নামে ডাকতেন। বাল্যকালে এই ছেলেটি পিতৃ হারা হয়ে পড়েন। মৃত্যু কালে তার পিতা তাঁকে তাঁর এক মামার কাছে রেখে যান এবং বলে যান যে, আমার বিধব সম্পত্তি আপনার নিকট আমানত রইল, আমার ছেলে বড় হলে তাকে উক্ত সম্পত্তি বন্টিয়ে দিবেন।

বখতিয়ার (কুতুবুল আলম) বড় হলেন নিজেই মামার নিকট বিধব সম্পত্তি দাবী করলে মামা তাকে তা কিরিরে দিতে অস্বীকার করেন। এমন কি তার উপর জুলুম করে মামা তাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করেন।

বখতিয়ার নিরুপার হয়ে তার পরিবার পরিজন, ছেলে ফিরোজ শাহ ও কন্যা মারমুনো এবং অন্যান্য আরও কতিপয় লোক সমবাহারে দিল্লীর সন্ন্যাসের ধরবারে উপস্থিত হন। সন্ন্যাস বখতিয়ারের অপরিচীত বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা দেখে মুগ্ধ হন এবং তাকে "গোড়" নামক স্থানের শাসন কর্তা নিযুক্ত করলেন। তিনি তার কাজে বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দেন। কিন্তু সন্ন্যাসের বাস্তব জ্ঞানের অভাবের দরুন পরিশেষে গোড় নামক স্থানের পতন দেখা দিল।

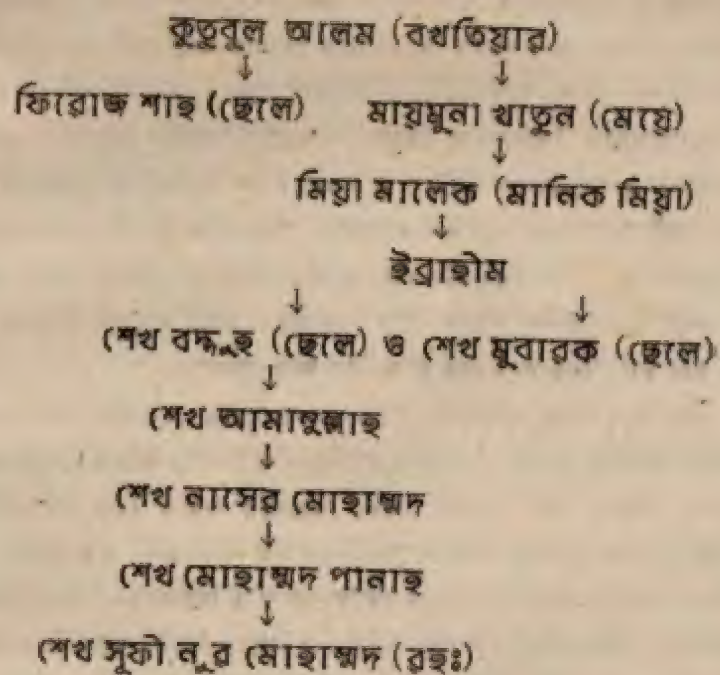
বখতিয়ার আবার আগ্রহ হীন হয়ে পড়লেন এবং পুত্র ফিরোজ শাহ ও কন্যা মারমুনো এবং তার গৃহগৃহীদের সঙ্গে করে বঙ্গ দেশের নোয়াখালী জিলার তৎকালীন "বানদিয়া" নামক স্থানে এসে বসতি স্থাপন করলেন।



পরবর্তী সময় এখানেই বখতিয়ারের বংশধরগণ খ্যাতি অর্জন করেন। মারমনাকে সেনাপতি সজ্জা খানের নিকট বিবাহ দেন। ফলে মারমনাকে কেন্দ্র করে তার বংশ বিস্তার ঘটতে থাকে।

এই বংশেরই মহারানার পূর্বপুরুষ শেখ মোহাম্মদ পানাহ হতে শেখ সূফী নূর মোহাম্মদ (রহঃ) এর জন্ম হয়। শেখ সূফী নূর মোহাম্মদের পূর্ব পুরুষগণ ছিলেন গজনীর অধিবাসী। আর তিনি স্বয়ং জন্মসূত্রে বাংলাদেশী।

## শাহ সূফী মাওলানা নূর মোহাম্মদ (রহঃ) এর পূর্ব পুরুষের বংশ তালিকা :



শেখ শাহ সূফী মাওলানা নূর মোহাম্মদ (রহঃ)-এর মাজার শরীফ বর্তমানে নিম্ন ঠিকানায় অবস্থিত :  
গ্রাম : মিঠানালা-সূফীয়া, ডাকঘর : সূফীয়া মাজ্রাসা  
উপজেলা : মিরসরাই, চট্টগ্রাম।



## শেখ সূফী মাওলানা নূর মোহাম্মদ (রহঃ)-এর সংক্ষিপ্ত শিক্ষা জীবন :

শেখ সূফী মাওলানা নূর মোহাম্মদ (রঃ) তাঁর সুশিক্ষিত পিতা 'পানাহ' এর নিকট হতে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। এ সময় হতেই তিনি তাঁর পরবর্তী জীবনের জন্য আদর্শ জীবন গড়ে তোলার অনুপ্রেরণা লাভ করেন। বাল্য শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি কলিকাতায় যান। সে সময় কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ছিলেন মাওলানা ওয়াজি উল্লাহ। এই নেকবৃত্ত মাওলানা ওয়াজি উল্লাহর আমলেই তিনি আলিয়া মাদ্রাসার সর্ব-উচ্চ ডিগ্রী লাভ করেন (বর্তমান কামেল)। প্রথমে তাঁর উপাধী হয় কথরুল মোহাম্মেদীন। তিনি যখন কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যাপক করেন তার বহু বছর পর দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। অথচ প্রদেবশীও অনেকে ভুল করে তাঁকে দেওবন্দী বলে আখ্যায়িত করে থাকেন।

শেখ সূফী নূর মোহাম্মদ (রহঃ) এর বদৌলতে আমাদের এই দেশে হাদীস শিক্ষার উন্নয়ন সাধিত হয়। হাদীস শিক্ষার তাঁর আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত বিরল। তাঁর হাদীস শিক্ষা বিস্তারের পদ্ধতি ছিল শাহ ওলী উল্লাহ ও শাহ আবদুল আজিজ (রহঃ) এর মত অবিকল। শাহ আবদুল আজিজ সাহেব সূফী সাহেবের তরীকতের পীর ছিলেন। তিনি যখন কলিকাতা হতে প্রত্যাবর্তন করে চট্টগ্রামের মিরের সরাইর অভয়গত মলি-আইশে আগমন করেন তখন তাঁর সঙ্গে ছিল কৈরান, হাদীস ও ফেকাহ শাস্ত্রের এক বিপুল ভান্ডার। এ থেকেই মলিআইশের সূফীয়া মসজিদে একটি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মলিআইশই ছিল শেখ সূফী নূর মোহাম্মদ (রহঃ) এর শেষ আশ্রয় নিবাস।

অত্র লাইব্রেরী থেকে সংগৃহীত আশআতুল লোম'আহ (ফারসী) কিতাব থানা আজও আমার কাছে সংরক্ষিত রয়েছে।

## পাক-ভারত উপমহাদেশে সূফী নীতি- মালার তরীকত বণ্টনকারী ইমামগের নামের তালিকা (উপর হতে নীচের দিকে)

- ১। ইমামে রববাণী মোজাম্মেদে আলফে সানী শেখ আহাম্মদ ছারহান্দী আল-ফারুকী (রহঃ)।
- ২। হযরত শেখ আদম বিন নূরী (রহঃ)।
- ৩। আল্লামা সৈয়দ আবদুল্লাহ (রহঃ)।
- ৪। হযরত আল্লামা শাহ আবদুর রহীম (রহঃ)।
- ৫। হযরত আল্লামা শাহ ওলী উল্লাহ মোহাম্মেদে দেহলভী (রঃ)।
- ৬। হযরত আল্লামা শাহ আবদুল আজিজ মোহাম্মেদে দেহলভী (রহঃ)।
- ৭। হযরত মাওলানা কুতুবুল আক্‌তাব শেখ শাহ সূফী নূর মোহাম্মদ (রহঃ)।
- ৮। হযরত মাওলানা কুতুবুল ইরশাদ সূফী ফতেহ আলী বর্ধমানী মোরশেদাবাদী (রহঃ)।
- ৯। আমীরে শরীফত হাদীয়ে দাওরান মাওলানা শাহ সূফী আব-বকর সিদ্দিক (রহঃ)।

নোট : উপরে বর্ণিত ইমামে তরীকতগণ প্রত্যেকের নীচের স্বনাম ধনা ব্যক্তিকে যারা বাহ্যিক ভাবে নিজ নিজ খালফা নিযুক্ত করেন। ৬নম্বর বর্ণিত অর্থাৎ শাহ আবদুল আজিজ মোহাম্মেদে দেহলভী সাহেব তিনি সৈয়দ আহাম্মদ দেহলভীকে তরীকতের খেলাফত দেয়ার ইচ্ছে করেছিলেন।



পরে আবার গ্রহীত করে দেন। কারণ শাহ আবদুল আজিজের জীবদ্দশায় তরীকতহীন রেলভাী সাহেবই ইসমাইল দেহলভাী নাম্নী খারেজী আকীনা পন্থীকে মুরীদ করেন। এবং সৈয়দ সাহেব পন্থঃ ইসমাইল দেহলভাীর সহায়তার খোদার হাতে মুরীদ হয়েছিলেন। শাহ আবদুল আজিজ মোহাম্মদে দেহলভাী (রঃ) লক্ষ্য করলেন যে, সৈয়দ আহাম্মদ রেলভাীকে যদি বলিফা নিযুক্ত করা হয় তবে আহলে সুন্নাতের তরীকত ও খেলাফত খারেজী খেলাফতের মামূল হয়ে যাবে। তখন তিনি রেলভাীর খেলাফতকে কেটে সেই তরীকতের খেলাফতকে দিল্লী হতে বঙ্গ-ভারত মুখী করেদেন অর্থাৎ সুফী নূর মোহাম্মদ (রঃ)-কে শাহ আজিজ (রঃ) এর পীরানে তরীকতের স্থানান্তরিত করেন। এই অভিমত ভারত উপমহাদেশ বিখ্যাত ঐতিহাসিক গোলাম মেহেরের।

সুফী নূর মোহাম্মদ (রঃ) শিখ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রসঙ্গে রেলভাীর সঙ্গে ঐক্যমত পোষণ করেছিলেন। তবে এটা বিশেষ প্রয়োজন কেড়ে রাজনৈতিক বাপার ছিল তাঁর। নচেৎ সুফী নূর মোহাম্মদ (রঃ) এর মত ভারত উপমহাদেশ বিখ্যাত প্রখ্যাত আলেম ও ওলী উল্লাহ, সৈয়দ আহাম্মদ রেলভাীর মত মুখ জাহেদের হাতে তরীকতের সবক নিজে ছিলেন কেহ বললে তা কোন অজ্ঞ ব্যক্তিও বিশ্বাস করবেনা। সৈয়দ আহাম্মদ সাহেব শূদ্ধ, মুরীদ চর্চা বিদ ছিলেন ইহা তার একমাত্র বৈশিষ্ট্য ছিল।

সৈয়দ আহাম্মদ রেলভাী সাহেবের তরীকতের মাধ্যম ছিল আকবিক। এবং তিনি ছিলেন আল্লাহর হাতে বাইরাত প্রাপ্ত মুরীদ। এই আজিব তরীকাপন্থীর শূদ্ধ, একজন মুরীদ ছিলেন ইহজগতে-বার নাম ইসমাইল দেহলভাী সাহেব। আবার তিনি ছিলেন ওহাবী খারেজী মাযহাবের আধুনিক প্রবর্তক। বড় মজার কথা হল ওহাবী তরীকত আসলে ইসমাইল দেহলভাীর মাধ্যমে, আবার তাদের তরীকতের শিক্ষা বিস্তার হল হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজিরে মজী (রঃ) এর মাধ্যমে। যে, তরীকত বিভিন্ন রূপে রূপান্তরিত হতে পারে তা, বেশী দিন টিকিয়ে থাকার কথা নয়। হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজিরে মজী ছিলেন ভারত উপমহাদেশ বিখ্যাত এবং

অন্যতম আলেম। তাঁর হাতে অনেক দেওবন্দী আলেম মুরীদ হয়ে ছিল, যখন তিনি দেখলেন তাঁর মুরীদগণ তাঁরই অনুসরণ করছেন। তখন তিনি তাঁর তরীকতের সিলসিলাটি বাতিল ঘোষণা দিয়ে মজার গিরে অবস্থান শূদ্ধ করলেন। হাজী সাহেবের বিশেষ বিশেষ মুরীদানের মধ্যে অন্যতম মুরীদ ছিলেন মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী ও মৌলভী আশরাফ আলী খানভাী। এরা দু'জনই হাজী সাহেবের তরীকতের নীতিমালার উপেক্ষা করে চলতেন, যেমন হাজী সাহেব মিলাদে কেরাম, ইসালে সাওয়াব ইত্যাদি নেক কাজকে নেক কাজ হিসেবে পালন করতেন। সেক্ষেত্রে গঙ্গুহী ও খানভাী সাহেব মিলাদের কেরামকে খারাপ কাজ বা বেবআতে সাইয়োগ্রাহ বলতেন। গঙ্গুহী সাহেব এত পীর বিরোধী হয়ে যান যে, হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজিরে মজী সাহেবের "হাঙ্গু মাসারেল" নামক কিতাব খানাকে জ্বালিয়ে দিয়ে ছিল। বার পর প্রোক্ষিতে হাজী সাহেব গঙ্গুহীর নাম দপ্তরে তরীকত হতে কেটে দেন। তার পর হতে গঙ্গুহী সাহেব বাহিন্দুত মুরীদ নামে আখ্যায়িত হন। খানভাী সাহেব দেখলেন যে, রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী যে কারণে বাহিন্দু হন সে কারণটি তার মধ্যেও রয়েছে অর্থাৎ মিলাদ শরীফকে হারাম বলা। তখন খানভাী সাহেব পীর সাহেবকে বাহিন্দুকাব করে নিজেই তরীকতের পীর হয়ে যান। এই লেংড়া লুলা তরীকত খান। আজও ওহাবীদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। অর্থাৎ ওহাবী তরীকত খাটি লোকের মাধ্যমে উদ্ভব হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে তা আর রইল না। কিছু দিন পব'ন্ত খানভাী সিলসিলাতে দেওবন্দীগণ আমাদে'র ত্রুতশ্রমে ওহাবী তরীকত প্রচলিত রেখেছিল। তাঁরা যখন দেখলো এই তরীকতে শান্তি নেই তখন অনেক দেওবন্দী আলেম মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক (রঃ) এর সুন্নী তরীকত ভুক্ত হয়ে বেতে বাধ্য হন। তাই এতশ্রমের অনেক দেওবন্দীকে দেখা যাচ্ছে যে, তারা কখনো কখনো সুন্নী সিলসিলার প্রশংসা করছেন আবার কখনো কখনো ওহাবী মতবাদকে খাটি বলছেন। তাদের একহাত বেহেশতের দিকে অন্য হাত দোষখের দিকে।



## বঙ্গ-ভারতে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রহঃ) এর কতিপয় প্রসিদ্ধ মুরীদানের সংক্ষিপ্ত তালিকা :

ফুরফুরার অধিবাসী জনাব হযরত মাওলানা আবুবকর সিদ্দিক (রহঃ)  
(কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার সনদ প্রাপ্ত) তাঁর কতিপয় বিশিষ্ট মুরীদের  
নাম এই :

- ১। মাওলানা রুহুল আমীন (রহঃ) (ফাট ক্রাস ফাট কলিকাতা  
আলীয়া মাদ্রাসা) যার ১৮ হাজার হাদীস কন্ঠস্থ ছিল।
- ২। মাওলানা নেহার উদ্দিন আহমেদ (রহঃ) (শিক্ষা প্রাপ্ত কলিকাতা  
আলীয়া মাদ্রাসা) বরিশালী।
- ৩। সূফী সদরুদ্দিন যশোরী।
- ৪। সূফী তাজামুল হোসেন নাদীয়ায়ী।
- ৫। মাওলানা আহম্মদ আলী এনায়েত পুরী।
- ৬। মাওলানা আবদুল মাবুদ মোবিনীপুরী।
- ৭। মাওলানা আবদুল জব্বার নিজাম পুরী।
- ৮। মাওলানা হাজী মোহাম্মদ হাতেম লালগঞ্জী।
- ৯। মাওলানা আবদুল মজিদ কেরারচরী।
- ১০। মাওলানা গোলাম রহমান নেজাম পুরী।
- ১১। মাওলানা আবদুর রহমান নোয়াখালী।
- ১২। মাওলানা মোরজ উদ্দিন হাটীন্দী।
- ১৩। ডঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ (বহু ভাষা বিন)।
- ১৪। মাওলানা আবদুল গণি মিরেশ্বরী।
- ১৫। মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী।

আরো অন্যান্য ২০০ শতেরও উর্দ্ধে তাঁর বালিকা ছিলেন। তন্মধ্যে  
পরম্পর উপরে উল্লেখিত দু'জনই অতি প্রসিদ্ধ। মাওলানা রুহুল আমীন  
(রহঃ) যার ১৮ হাজার হাদীস শরীফ কন্ঠস্থ ছিল। তিনি ওহাবী বেদ-  
আতী দেওবন্দীদেরকে লা জবাব করার জন্য ১০৫ খানা কিতাব রচনা  
করেন। তৎকালে তিনি হানাকী ও মুসলিম নামক দু'খানা সাপ্তাহিক  
পত্রিকা এবং শরীয়াত ও সুন্নত আল জামায়াত নামক মাসিক পত্রিকার  
প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি দীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবৎ বাংলার অলিতে  
গলিতে পদাধীন করে জন সাধারণকে আশ্লাহ এবং রাসুলের অমর বানী  
প্রবণ করান।

মরহুম মাওলানা পীরে কামেল হাদীয়ে শরীয়াতের ধর্মীর খেদমত  
ও শিক্ষাপ্রদ যোগ্যতার অবধানের ইতিহাস বর্ণনার অপেক্ষা রাখেনা। উক্ত  
দু'জন আল্লামা (মহাবিজ্ঞ) আলেম হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রহঃ) এর  
হাতের লাঠি স্বরূপ ছিলেন। তিনি যখন বঙ্গ ভারতের বে কোন স্থানে  
ওরাজ নসিহত উপলক্ষে তশরীফ নিয়ে যেতেন তাঁদের দু'জনের অন্তত  
একজন হলেও পীর কেবলার সঙ্গে উপস্থিত থাকতেন। কারণ তৎকালে  
দেওবন্দী আলেমগণ পীর সাহেব কেবলার তরীকত সরাসরি বেদআত  
বলতো। দেওবন্দীরা ওরাজ মাহফিলে উপস্থিত হয়ে পীর সাহেব কেবলাকে  
নানা অবধা প্রশ্ন করতো। সেক্ষেত্রে মাওলানা রুহুল আমীন (রহঃ) দেও-  
বন্দীদের প্রশ্নের খণ্ডন করতেন। কারণ তিনি ছিলেন হাফেজে হাদীস।  
তাঁর প্রশ্ন খণ্ডন দেখে অনেক স্থানে অনেক দেওবন্দী আলেম পীর সাহেব  
কেবলার হাতে বাইয়াত হয়ে যান। সে জন্য ভারত ও বাংলাদেশে  
অনেক দেওবন্দী আলেম হযরত মাওলানা আবুবকর সিদ্দিক (রহঃ) ও  
মাওলানা রুহুল আমীন ও মাওলানা নেহার উদ্দিন (রহঃ)-এর হাতে  
বাইয়াত গ্রহণ করেন।



## মাওলানা রুহুল আমিন (রহঃ)-এর সঙ্গে দেওবন্দী ওহাবীদের বহু ও মোকাবিলা :

বহু ও মোকাবিলায় প্রচলন আদিকাল হতে চলে আসছে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নমরুদের সঙ্গে বহু করেছেন, যার কথা কোরআনে উল্লেখ আছে। হযরত আদম (আঃ) হযরত মূসা নবীর সঙ্গে তর্ক বহু করে ছিলেন। ইহা বোখারী শরী শরীফে উল্লেখ আছে। হুজুরে পাক (সঃ) খৃষ্টানদের সঙ্গে বহু করেন, যার কথা তাকসীরে কবিরের মধ্যে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত রয়েছে।

তৎকালে দেওবন্দী ওহাবীদের উৎপাত বেশী ছিল। যখন কোন সুন্মী আলেম কোথাও ওরাজ নছিহতের জন্য আগমন করতেন তখন দেও-বন্দী ওহাবী মৌলভীগণ সদলবলে সেখানে উপস্থিত হয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতেন। অনেক স্থানে হানাফী সুন্মীপন্থীগণ তর্ক বহু করে হেরে গিয়ে ওহাবী মাযহাবে চলে যেতেন। আল্লাহ পাকের মজি'তে প্রভের মাওলানা রুহুল আমিন সাহেব কলিকাতা আলীরা মাদ্রাসা হতে বের হওয়ার পর ওহাবীদের উৎপাত বহু হয়ে যায়। বহু স্থানে ওহাবীগণ পরাস্ত হয়ে সুন্মী আকীদার বিধাসী হন।

১। মাওলানা রুহুল আমিন (রহঃ) এর সঙ্গে মৌলভী গোলাম রহমান দেওবন্দী সাহেব মিলাব কেরাম নাজারেজ বলে সাতকীরার অন্তর্গত মাহমুদপুর গ্রামে বহুয়ের তারিখ রাখ করে। কিন্তু মাওলানা রুহুল আমিন সাহেব যখন মাহাকিলে ঠিকমত পৌঁছে যান, তখন মৌলভী গোলাম রহমান পথ হতে কেটে পড়েন। যখন দেওবন্দী সাহেবের বাড়ীতে খোজ নেয়া হল তখন বলা হল যে, তিনি বহু অন্ত্যস্তানে গিয়েছেন। কিন্তু তখন তিনি ঘরের মধ্যে লুপ্ত হয়ে ছিলেন।

২। মাওলানা রুহুল আমিন (রহঃ) বিতীরা বহু করেন সাতকীরার কাক ডাঙ্গা নিবাসী ওহাবী মৌলভী হাসিব উদ্দিন সাহেবের সঙ্গে। ওহাবী সাহেব বলতেন কেরাছ শরীরতের দলিল নয় এবং ৭০ ফেকরি হাদীসটি অশুদ্ধ। এ বহু ওহাবী সাহেব শোচনীয় ভাবে পরাজয় বরণ করেন এবং জনসাধারণের সম্মুখে ওরাদা করেন যে, উপরে উল্লেখিত মত পোষণে তার ভুল হয়েছে। তিনি আর কখনও এরূপ মত পোষণ করবেন না।

৩। সিরাজগঞ্জ নিবাসী দেওবন্দী আলেমগণ বলতেন মিলাবে কেরাম নাজারেজ এবং গ্রামে জুমার নামাজ পড়া নাজারেজ। মাওলানা রুহুল আমিন সাহেব যখন প্রস্তাবের বিপক্ষে দলিল প্রমাণ সহকারে যুক্তির অবতারণা করেন তখন দেওবন্দীগণ নিরোত্তর হয়ে যান এবং তওবা পড়ে তাঁর হাতে মূরীদ হন।

মাওলানা রুহুল আমিন (রহঃ) তিনি দেওবন্দী ওহাবী লা-মাযহাবী ডম্পীর ইত্যাদির সঙ্গে অন্তত ১০০ এর মত বহু করেছিলেন। প্রত্যেক বিরোধীদল তখনই পরাস্ত হয়েছিল। আমি এখানে বহু সমূহের পূর্ণ বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন মনে করলাম না। (মাওলানা রুহুল আমিন পুস্তকের ৬৪ হতে শেষ প্রবন্ধ দেখুন)

একবার মাওলানা রুহুল আমিন (রহঃ) চট্টগ্রাম হাটহাজারী খারেজী মাদ্রাসার সান্নিধ্যে এক বিরাট ওরাজ মাহাকিলে হাজীর হন। সেই মাহাকিলে হাজার হাজার আনানী-গুণী আলেম-ওলামা উপস্থিত ছিলেন। হাটহাজারী খারেজী মাদ্রাসার ওহাবী আলেমেরা মাওলানা রুহুল আমিন (রহঃ)-কে দেখতে এবং তাঁর ওরাজ শ্রবণ করতে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু তারা তাঁর শোখাক পরিচ্ছদ দেখে ঘৃণা মূলক মনোভাব পোষণ করেন ও নানারূপ উক্তি করে বলেন যে, এই লোক বাংলা বিখ্যাত মাওলানা হতে পারেন না! মনে হয় তাঁর তেমন এলেমও নেই!



বাদ মাগরিব মাওলানা রুহুল আমিন জুনগল হাদীস দ্বারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওরাজ করতে থাকেন, তখন হাটাজারী মাদ্রাসার খায়েজী মৌলভীগণ তাঁর সমীপে উপস্থিত হয়ে কমা প্রার্থনা করলেন।

একবার মাওলানা রুহুল আমিন (রহঃ) সিলেট গৌরী পুরে ওরাজ করতে বান। সেখানে দেওবন্দী আলেমগণের বড় প্রভাব ছিল। সকল দেওবন্দীগণ একত্রিত হয়ে মাওলানা সাহেবকে ওরাজের মধ্যে আটকাবার উদ্দেশ্যে বারংবার প্রশ্ন করতে থাকেন। মাওলানা সাহেব বললেন ওরাজ শেষে আপনাদের প্রশ্নের জবাব দেয়া হবে। তবে দেওবন্দী আলেমগণ তাঁর কথা মানলেন না। তখন মাওলানা সাহেব উপস্থিত জনতা হতে এজাজত নিয়ে দেওবন্দী আলেমগণকে বললেন, আপনারা মিলানকে হারাম বলছেন, আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করছি যে, যদি আপনারা প্রিয় নবী রাসুলে পাক (দঃ)-কে মানেন, তাহলে তাঁর বৈশিষ্ট্য মূলক দু'টি হাদীস বলেন? কিছু কোন দেওবন্দী আলেম তাঁর একটি হাদীসও মুখস্ত বলতে পারলেন না। অতঃপর মাওলানা সাহেব হুজুরে পাক (দঃ) এর শানে এক ঘণ্টা পর্যন্ত অনর্গল উপস্থিত জনতাকে মুখস্ত হাদীস শুনালেন। শেষ পর্যন্ত দেওবন্দী আলেমগণ মাওলানা সাহেবের হাতে বারাজ হন এবং তওবা পড়েন। এই আলোচনা সভাকে গৌরী পুরের বহু নাম দিয়ে পুস্তক ও সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।

## সৈয়দ আহাম্মদ রেলভী শহীদ হয়েও কোন শহীদ নন

সৈয়দ আহাম্মদ রেলভী নিঃসন্দেহে বালা কোটের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। তবে দেওবন্দীগণ তাঁর এই শাহাদাত বরণকে মেনে না নিয়ে নিজেদের মধ্যে এই গুজব রটায় রেখেছেন যে, সৈয়দ সাহেব আজও জীবিত আছেন। জনাব আশরাফ আলী খানভী সাহেব স্বরচিত পুস্তক এমদাদুল মশতাক এর ৬১ পৃষ্ঠার ১৮ লাইনে সিল মহর দিয়ে লিখে রেখেছেন।

القول : ايكة بزرگ لیے حضرت سید صاحب کو بعد  
شهادت دیکھا۔

অর্থাৎ সৈয়দ আহাম্মদ রেলভী (রহঃ) কে খানভী সাহেবের কনি বিবাহ মুরীদ তাঁর শহীদ হওয়ার পরেও জীবিত দেখেছেন। ইহা ছাড়া দেওবন্দীগণের ধারণা যে, তিনি অনেক বছর অতিবাহিত হওয়ার পরেও জীবিত আছেন। তিনি পাহাড়ের মধ্যে লুকিয়ে থেকে বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করছেন। তিনি যুদ্ধে শহীদ হন নি বরং যুদ্ধের ভারসাম্য রক্ষা করতে না পেরে পাহাড়ের মধ্যে আশ্রয় গোপন করে রয়েছেন। মাওলানা কাসেম নানুতবী সাহেব খানভীর মুরীদের কথার উপর আত্মবান হয়ে সৈয়দ সাহেবকে নিজেদের মধ্যে উপস্থিত করতে পারবেন এই মর্মে অনেক দেওবন্দী হতে চাঁদা তুলেছিলেন। শেষ পর্যন্ত অনেক চেষ্টা করেও সৈয়দ সাহেবকে উপস্থিত করতে পারলেন না।

ভারত উপমহাদেশের সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক গোলাম রসুল নেহের বলেন اور شہادت کا کوئی مکمل نمونہ نہیں  
اسکی موت اور شہادت کا کوئی مکمل نمونہ نہیں  
سৈয়দ সাহেবের মৃত্যুও শাহাদাত কোনটার সঠিক দিক  
নির্ণয় করা যাচ্ছেনা! (سورت سید احمد)



তদ্রূপ ইসমাইল সাহেব সম্বন্ধে দেওবন্দীগণ প্রবাদ রূপে প্রসিদ্ধ করে রেখেছেন। ইসমাইল শহীদ, অথচ ইতিহাস তা বলেনা। হাজারা জেলার প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নিজস্ব রচিত "لارمخ هزاره" তারিখে হাজারা" এর মধ্যে লেখেন যে, ইসমাইল সাহেব মুসলমানদের হাতে নিহত হন।

কথিত আছে যে, পাঠান কোটের ইউসুফ জগা জরী সে শিব সম্প্রদায় এর সঙ্গে মোকাবেলা করার জন্য বহু সংখ্যক বন্দুক যোদ্ধা তৈরী করে ঠিক সে সময় ইসমাইল দেহলভী সাহেবের সৈন্যবাহিনী পাঠান রাজ্যে উপস্থিত হয়। পাঠান খান্দানের মধ্যে নিরম ছিল যে, নিজেদের মেয়েদেরকে দেবী করে বিবাহ দিত। ইসমাইল সাহেব এই বদ প্রথা রহিত করণের উদ্দেশ্যে শরীরতের বিধান জারি করলো যে, সৈয়দ আহাম্মদ ত্রেলভীর কোন মুরীদের মেয়ে অবিবাহ থাকতে সে তার বাহিনীর সঙ্গে থাকতে পারবেনা। এই বিধান জারী হওয়ার পর পাঠান খান্দানের ২০টি অবিবাহিত মেয়েকে পাজাবী বাহিনীর ২০ জনের সঙ্গে বিবাহ পড়িয়ে দেন এবং দুটি মেয়ের সঙ্গে স্বয়ং ইসমাইল সাহেব বিবাহ পড়েন। ইউসুফ জগাজরী এই বিবাহ রীতি নীতি দেখে সন্দেহ পোষণ করেন যে, প্রকৃত পক্ষে ইহাতো কোন শরীরতের বিধান নয়। বরং ইসমাইলের কুমতলব। ইউসুফ জগাজরী বলে ফেললেন, আমরা আপনার শরীরতের বিধান মানিনা, আমরা আমাদের মেয়েগুলো ফেরৎ পেতে চাই। কিন্তু ইসমাইল সাহেব তাদের মেয়ে ফেরত দিতে অস্বীকার করলে পাঠান ও পাজাবীদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়। প্রথম দিন উভয়ের মধ্যে যুদ্ধের কোন ফলাফল হয় নাই। পরদিন ইউসুফ জগাজরী ইসমাইলকে লক্ষ্য করে গুলি মারলে ইসমাইল সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটে পড়ে। ইসমাইল সাহেবের মৃত্যু দেখে পাজাবীগণ সৈয়দ বাহিনী ত্যাগ করে চলে যায়। (তারিখে হাজারা ও ১৯ পৃষ্ঠা ফরিদাদুল মুস-লেমিন ১৮ পৃষ্ঠা)

বিভিন্ন ইতিহাস পুস্তকের মধ্যে দেখা যায় যে, ইসমাইল সাহেব মুসলমানদের হাতে নিহত হয়। অথচ দেওবন্দীগণ তাকে শহীদ নামে আখ্যায়িত করেন। আবার যিনি প্রকৃত শহীদ (সৈয়দ সাহেব) তাকে শহীদ বলা দুরের কথা দেওবন্দীগণ তার মৃত্যু হয়েছে বলে বিশ্বাস করেন না। যিনি বালা কোটের মরদানে শহীদ হন তাকে শহীদ বলতে চান না। আর যে বৃদ্ধ মরদানের ধারে কাছে ছিলনা সে শহীদ হল কি করে?

অতি সত্য কথা যে, দেওবন্দের মধ্যে ওহাবী মাযহাব বিস্তারে ইসমাইল দেহলভীর বিরূপ অবদান রয়েছে তবে কেহ তার বা সৈয়দ সাহেবের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে না। সকল দেওবন্দীগণ হাজী এমদাদুল্লাহ মাহাজেরে মতী সাহেবের কাছে মুরীদ হলেন কেন?

### তরীকা : আতর মোহাম্মদিয়া

ভারত উপমহাদেশের সুপ্রসিদ্ধ তরীকত প্রবর্তক ইমামে রব্বানী আল্লামা মোজাম্মেদে আলফে সানীর নিদারিত মোজাম্মেদিয়া তরীকার উপর সকল তরীকত পন্থীগণ তরীকতের সিলসিলা কারেম করেছেন। কেহ আজ পন্থ উক্ত প্রবর্তিত তরীকতের মধ্যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেনি। কারণ মোজাম্মেদিয়া তরীকা এক নামে প্রসিদ্ধ হলেও বহু তরীকার সমষ্টি। যদি কোন ব্যক্তি মোজাম্মেদিয়া তরীকার বাইয়াত হল সেক্ষেত্রে বলা হবে যে, সেই ব্যক্তি সব তরীকার বাইয়াত হল। আমাদের ঐতশেনশের তরীকত পন্থী পীরগণ তরীকত গ্রহণ কালে উচ্চারণ করে থাকেন, হৈমেন বলেন চিশ্‌তিয়া নকশ্বন্দীয়া সোহরাওয়ারদিয়া এবং মোজাম্মেদিয়া তরীকার উপর বাইয়াত হলাম।

আর অনেক পীরানে তরীকতগণ শুধু মোজাম্মেদিয়া তরীকার নামে



বাইয়াত গ্রহণ করে থাকেন। উপরে উল্লেখিত দুই পদ্ধতির মাধ্যমে বাইয়াত গ্রহণ করা সঠিক। এই সঠিক তরীকার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন আলীরা। মাদ্রাসার উচ্চ শিক্ষার সনদ প্রাপ্ত আব্দুল্লাহ আব্দুল করিম সিদ্দিক, মাওলানা রুহুল আমীন ও আব্দুল্লাহ নোহার উদ্দিন আহম্মদ প্রমুখ। এরা নিসাদিক ভাবে এতদ্ব্যতীত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে ধর্মীয় সমস্যার সমাধান করে গেছেন। এ ছাড়া তারা আওলীয়ায় কেরামদের তরীকত পদ্ধতির পূর্ণ অনুসরণ করে গেছেন। সেই তরীকার "আওর মোহাম্মদীয়া" বর্ণিত বাক্যটি নাই।

চারি তরীকা বা আরো ভিন্ন তরীকা সমূহের উপর 'আওর মোহাম্মদীয়া' বাক্যটি যুক্ত করার দ্বারা তরীকত পন্থীগণের মনে সন্দেহ জেগেছে যে, এই বহু মূল্যবান তরীকার প্রকৃত মূল কোন দিকে। তরীকতের মধ্যে হেরফের পরিবর্তন পরিবর্তন করা কোন পীরের ক্ষমতার আওতাধীন নয়। কারণ তরীকতের সকল কাজ তরীকত সংস্কারকের উপর পূর্ণ অর্পিত থাকে। যদি কোন তরীকত পন্থী তরীকতের মূল বাক্যের উপর কোন বাক্যের সংযোজন করেন তখন সেটি আর তরীকত রইলনা বরং সেটি তরীকত চুরি বা জালিয়াতী। এই সংমিশ্রণ যেমন চিনির সাথে লবনের মিশ্রণ।

আর যদি কোন পীর সাহেব বলেন : "আওর মোহাম্মদীয়া" বাক্যটির দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হল যে, আমি মোহাম্মদ (দঃ)-এর পবিত্র নামের বরকত হাসিল করব। তখন প্রশ্ন উঠে যে, তরীকতের পিলসিলা কারেম করার জন্য প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) এর পবিত্র নাম মোহাম্মদকে ব্যবহার করার শরীরতের কোন নির্দেশ আছে? যদি শরীরতের নির্দেশ না থাকে তা হলে এটা তরীকত জালিয়াতী ছাড়া আর কি?

আমরা সাধারণত দেখছি যে, যে তরীকত প্রবর্তকগণ নিজ নামের সঙ্গে সম্পর্কিত করে তরীকতের নাম রেখেছেন, যেমন হযরত আবদুল কাদের (রহঃ) এর তরীকতের নাম ছিল তরীকায়ে কাদেরীয়া। আর তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত আওলীয়া, সে ক্ষেত্রে প্রিয় নবী রাসুলে পাক (দঃ) হলেন

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক বা দানী। যদি তরীকতের সঙ্গে আওর মোহাম্মদ বাক্যটি ব্যবহার করা হয় তখন এই সংযোজন ধর্ম অবমাননাকর কার্য না হলে আর হবে কি?

আর যদি বলা হয় যে, আওর মোহাম্মদীয়া বাক্য দ্বারা যদি সরা সরি মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) এর তরীকাকে উদ্দেশ্য করা হয়। তখন বলা হবে যে, প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) এর মোহাম্মদীয়া নামের কোন তরীকা ছিল বলে আমরা কোরআন ও সুন্নাহর মধ্যে আজ পর্যন্ত দেখি নেই। বরং তার জন্য রয়েছে কুর মতবাদের পাশাপাশি ইসলাম ধর্ম। ধর্ম আর তরীকা দুটি এক কথা নয়।

আর যদি বলা হয় যে, আওর মোহাম্মদীয়া বাক্য সংযুক্তির দ্বারা মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে তখন বলা হবে যে, উচ্চ মুহাম্মদ তো ধর্ম প্রচারক ছিল তারতো কোন তরীকা ছিলনা। এই মুহাম্মদতো মুসলিম উম্মার ঐক্যমতে কাকের ও প্রচারক ছিল। আর কোন ধর্ম ছিলনা সে আবার ধর্ম সংস্কারক হল কখন হতে টু তবে দেওবন্দী আলেমগণ তথাকথিত মুহাম্মদকে ধর্ম সংস্কারক নামে আখ্যায়িত করেন।

## কবর বা স্মৃতি সৌধ নির্মাণের বিধান

মানব জাতি ব্যতীত অন্য কোন জাতিতে কবরস্থ করার নির্দেশ কোন ধর্মে ছিলনা। তাই যে কোন যুগে মানব জাতি মৃত্যু বরণ করলে স্বসম্মানে কবরস্থ করা হয়ে থাকে। নিজ নিজ তাত্ত্বিক অনুযায়ী কবরস্থ ব্যক্তির কবরকে পাকা পোতা করা হয়। অপারগ হলে অন্তত কবরের উপর স্মৃতি স্বরূপ একটি পাথর রেখে দেয়া হয়। এরূপ ভাবে পূর্বকালে আশ্বিয়া



আওলীয়া কেরামদের কবর গুলো সংরক্ষণ করা হয়েছিল। হযরত ওমর (রাঃ) যখন বারতুল মোকান্দাস বিজয় উপলক্ষে সেখানে গমন করে দেখেন যে, আশ্বিনা আওলীয়া কেরামদের কবরের উপর নির্মিত স্মৃতি সৌধ-গুলো আজও অক্ষত্ব কর্তেছে। তিনি স্বদেশে ফিরে উক্ত স্থানের নির্মিত স্মৃতি অনুপাতে মদীনার ভূমিতে কতিপয় কবর স্মৃতি নির্মাণ করেন। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর খেলাফত আমল হতে ১৪শত বছর অতিবাহিত হইল এতে কেহ যিমত পোষণ করেন নাই।

বর্তমানে একদল ধর্মপ্রোহী জানী বের হয়েছে যাদেরকে নজদী ওহাবী বলা হয়। তারা কবর পাকা করা এবং কবরের উপর স্মৃতি নির্মাণ করাকে হারাম বলে। 'ইবনে কায়্যেম' একজন ওহাবী ইমাম ছিল, সে প্রকাশ্য মন্তব্য করে যে, কবর পাকা করা ও স্মৃতি নির্মাণ করা শিরিক ও বেদআত। ইমাম সাহেব এ মন্তব্যও করেছেন যে, যদি কেহ ঘটনা চক্রে কবর পাকা করে ফেলে তাহলে সেই কবরকে ভেঙ্গে চূরমার করে ফেলা প্রত্যেকের জন্য ওরাজিব। এই ভাষাধিত ইমামের রায়ের পূর্ণ কার্যকারীতা শূন্য হয় যখন নজদী পন্থীগণ হিজাজ ভূমি আক্রমণ করে। তখন হতে তারা মক্কা ও মদীনার পূর্ব প্রতিষ্ঠিত পাকা কবর সমূহকে এক এক করে ভেঙ্গে শেষ করে দেয়। ইসলামী আদেশের প্রামাণ্য চিত্র প্রিয় নবী রাসুলে পাক (সঃ) এর আশ্রয় গোপনের স্থানটিকে একেবারে বিনষ্ট করে ফেলে। কুফার অবাধিত হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর মাজারকে সমূলে ধ্বংস করে ফেলে। অতঃপর সাহাবী, তাবেরী ও আওলীয়াদের নির্দেশাবলীকে ধ্বংস করার প্রতি এত ক্রিষ্ট হয় যে, তারা আজ পর্যন্ত মক্কা ও মদীনার ভূমিতে একটি পাকা কবরের স্মৃতি পর্যন্তও বিদ্যমান রাখে নাই।

## মাজার নির্মানের পটভূমিকা :

খলিফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) বলেন, আমি যখন দেশ বিজয় অভিযানে লিপ্ত ছিলাম তখন আমার বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করার সুযোগ লাভ হয়েছিল। তবে বারতুল মোকান্দাস বিজয় অভিযানে আমি হযরত আবু ওবাইদা (রাঃ) কে সেখানে প্রেরণ করি। আমি তাঁকে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে নির্দেশ দিলাম যে, তুমি সব প্রথম বারতুল মোকান্দাস পেঁাছে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার দাওয়াত প্রদান করবে যদি তারা দাওয়াত অমান্য করে তবে তাদের চতুর্দিকে বেটন দিবে রাখবে। হযরত আবু ওবাইদা (রাঃ) হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর নির্দেশ মোতাবিক প্রথম বারতুল মোকান্দাস বাসীদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। স্থানীয় অধিবাসীরা হযরত আবু ওবাইদা (রাঃ) কে বলল, আমরা এক শতে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে ইচ্ছুক, তা এই যে, স্বয়ং খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) কে আমাদের বারতুল মোকান্দাস শহরে পদার্পন করতে হবে। হযরত আবু ওবাইদা (রাঃ) এই দ্বৈতের খবরটি হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর কানে পেঁাছারে দেন। এই খবর পেয়ে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ) কে তার খুলায়িত্ব করে স্বয়ং বারতুল মোকান্দাসের দিকে রওয়ানা দেন। বারতুল মোকান্দাসের অধিবাসীরা খলিফাতুল মুসলেমীনের সুভাগমণে উৎফুল্ল হয়ে বলল আমরা সকলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলাম। আপনি আমাদেরকে ইসলামী কালেমা পাঠ করান। অতঃপর খলিফাতুল মুসলিমীন মদীনার পথে রওয়ানা দেওয়ার পূর্বে প্রথম মসজিদ "আকসা" পরিদর্শন করেন। ইহা ১৬ হিজরীর ঘটনা।



## হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) কতৃক বায়তুল মোকাদ্দাস পরিদর্শন

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) কতৃক বায়তুল মোকাদ্দাস পরিদর্শনের কাহিনীটি বোখারী শরীফের সুপ্রসিদ্ধ বাখ্যা গ্রন্থ বদরুস্ সারীতে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে। আমি এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে লিপি বন্ধ করলাম। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) যখন বায়তুল মোকাদ্দাস পরিদর্শন করতে গমন করেন তখন দেখেন যে, উহার চতুর্দিকে হাজার হাজার আশ্বিয়া কেরামদের কবর মাজার বিক্ষিপ্ত ভাবে পড়ে রয়েছে। ইহা দেখে তিনি অবাক হয়ে যান। তার বলেন আমিই সুভাগ্যবান, কারণ আমারই প্রথমে আশ্বিয়া আওলীয়ারদের কবর জিয়ারত করার সুভাগ্য ঘটেছে। এই বলে তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসে অবস্থিত সুপ্রসিদ্ধ কবর স্থান অর্থাৎ বায়তুল খলিফে উপস্থিত হন। উপস্থিত হয়ে প্রথমে তাঁর দৃষ্টি গোচর হল হযরত দাউদ (আঃ), হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত ইসহাক (আঃ), হযরত ইদ্রাকুব (আঃ) ও হযরত ইউসুফ (আঃ) এর সংরক্ষিত কবর সমূহ। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) আবেগ ভরা মনে উক্ত কবরস্থানের মাজার সমূহ জিয়ারত করলেন। তিনি জিয়ারত করার সময় মাজার সমূহের দৃঢ় নির্মাণ পদ্ধতি অবলোকন করে অবাক হয়ে পড়লেন। কারণ কবরের উপর নির্মিত পাকা পোস্ত স্মৃতি সৌধ সমূহ দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর আজও নতুন নির্মাণ রূপে দৃঢ়ত্ব করছে। কবরের নির্মাণ কার্য দেখে তিনি মনে করলেন যে, প্রত্যেক আশ্বিয়ায়ে কেরামদের আমলে কবর পাকা করা এবং কবরের উপর স্মৃতি সৌধ নির্মাণের দ্বারা প্রচলন ছিল।

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) মদীনায় উপস্থিত হয়ে হযরত আলী (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, কবর পাকা করা এবং কবরের উপর স্মৃতি সৌধ নির্মাণ সম্বন্ধে হুজুরে পাক (দঃ) আপনাকে বিশেষ ভাবে কোন নির্দেশ দিয়েছেন কিনা?

হযরত আলী (রাঃ) হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর প্রশ্নের জবাবে এ বলে উঠলেন যে, হুজুরে পাক (দঃ) আমাকে দু'টি নির্দেশ দেন প্রথম নির্দেশটি হল যে, মদীনায় সড়কের পাশে কবর মশরিক কতৃক যত দেবদেবী ও প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে উহাকে সম্মুখে ধরাস করে দাও।

দ্বিতীয় নির্দেশ ছিল যে, মদীনায় যত মুসলমানের কবর সমূহ বেঘরে এবং অবহেলিত ভাবে রয়েছে উহাকে সম্মুখ ও সংরক্ষণ করার। প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) বলেন :

من على (رض) قال قال : ان لا يدع تمثالا الا طمسه  
ولا يبرأ مشرنا الا سوبته - ( صحيح مسلم - رملى  
لسائى باب صورة القور .

এই হাদীসটির মধ্যে কবর সমতল করার যে নির্দেশ রয়েছে উহা দ্বারা কবরকে সম্মুখ করা এবং সংরক্ষণ করা উদ্দেশ্য। সম্মুখ করার বিশেষ উপায় হল কবরকে পাকা করা এবং উহাকে বেগুনি দিয়ে সংরক্ষণ করা।

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ) এর কবর নির্মাণের বক্তব্য শুনে হযরত আলী (রাঃ) কে নির্দেশ দিলেন যে, মদীনায় মুসলমানগণের কবরকে দৃঢ়ত্ব ভাবে সংরক্ষণ করুন।

হযরত আলী (রাঃ) হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর নির্দেশ মোতাবেক মদীনায় সাধারণ কবর সমূহকে নিশান দ্বারা চিহ্নিত করে সংরক্ষণ শুরু করলেন। প্রথমে নির্মাণ করলেন প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) এর রওজা শরীফ। এই সময় প্রিয় নবীর চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ) ও হযরত আরেশা (রাঃ) জীবিত ছিলেন।

একদা অনাবৃষ্টিতে মানুষ অস্থির হয়ে হযরত আরেশা (রাঃ) এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি পরামর্শ দেন যে, রাসুলে পাক (দঃ) এর নির্মিত রওজার কোববা শরীফের উপর ভাগের যে কোব্বা সামান্য ছিদ্র করে অতঃপর তাঁকে উন্মীলা করে দেয়া করলে মনের বাসনা পূর্য হবে।



আমাদের এতদশৈলী একদল দেওবন্দী ওহাবী আলেম বলেন যে, কবর নির্মাণ করা, কবর পাকা করা এবং কবরের উপর কোববা নির্মাণ করা বেদআত। কারণ তারা বলে যে সব কাজ নবী ও সাহাবীগণের যুগে পালন করা হয় নি উহা বেদআত হওয়ার কারণে শরীরত সম্মত নয়। আমি অজ দেওবন্দীগণকে জিজ্ঞেস করি যে, হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) কি সাহাবী ছিলেন না? প্রকৃত পক্ষে কোববা নির্মাণ করা এবং কবর পাকা করা সাহাবায়ে কেরামদের আমল হতে শুরু হয়।

হযরত আরেশা সিন্দিকা (রাঃ) যত দিন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন ততদিন পর্যন্ত প্রিয় নবী হুজুরে পাক (সঃ) এর রওজা শরীফে যা পাকা ঘর রূপে ছিল উহাতে অবস্থান করেন। মহানবী রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর পার্শ্বের তাঁর নির্দিষ্ট কবরের স্থানটি হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) কে দান করে এবং তিনি জামাতুল বাক্তীর সুপ্রসিদ্ধ কবরস্থানে সমাহিত হন।

নজদীগণ মদীনার কবর সমূহের মধ্যে অন্যতম কবর হযরত আরেশা সিন্দিকা (রাঃ) এর কবরকে সবমূলে ভেঙ্গে চুরে কবর ভাঙ্গার নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। নজদীগণের কবর ভাঙ্গার ঘণিত কাণ্ডটি মজার কাফিরদের তুণীতাই হতে অধিক অবারিত। কাফের-মুশরিকগণ বহু অপকর্মে লিপ্ত হত তবে কখনো কোন মুসলমানদের কবর ভাঙে নাই। কাফেরগণ হুজুরে পাক (সঃ) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে মদীনার সানিকট আবওরা নামক স্থানে পৌঁছলে সেখানে দেখে নবীর শ্রাতার কবর। তারা বিবি আমেনার কবর থানাকে সম্মান না করলেও অন্তত ভেঙ্গে ফেলে দিতে পারত তবে ভাঙে নি। কিন্তু নজদীগণ নবী সাহাবীদের কবর সমূহকে আজ পর্যন্ত নির্বিচারে ভাঙ্গা শুরু করেছে।

## পাকা কবর ও স্মৃতি নির্মাণের মূল উৎস

কবর পাকা করা এবং কবরের উপর ঘর নির্মাণ করার মূল উৎস হল আত্মাহ পাকের কোরআন এবং রাসূলে পাক (সঃ) এর হাদীসের নির্দেশ। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এই বিষয় কোরআনের নির্দেশাবলীর প্রতি লক্ষ্য করেছেন। হযরত আলী (রাঃ) প্রিয় নবী রাসূলে পাক (সঃ) এর হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করেছেন। উক্ত দু'খলিফাতুল মুসলেমীনের আমলে কবর পাকা করা এবং স্মৃতিসৌধ নির্মাণের সূচনা হয়।

কোরআন পাকের মধ্যে “আসহাফে কাহাফের” ঘটনার কবর পাকা করার নির্দেশ এবং স্মৃতি নির্মাণের কথা পরিষ্কার শব্দে উল্লেখ আছে। যেমন :  
أَبْنُوا لَهُمْ مِمَّا لَارِ بِهِمْ أَعْلَمَ بِهِم لَنُخْذَن عَلَيْهِمْ  
(الكهف: ২১) আসহাফে কাহাফ বলা হয় পূর্ব যুগের এক বাপের ৬টি সন্তানকে, যারা “দাকরানুস” নামক (খোবারী দাবীদার) বাদশাহর সাথে যুদ্ধ করে বন্দি হয়ে ছিলেন। দাকরানুস এই ৬ সন্তানকে গ্রেফতার করে একটি পাহাড়ের গর্তে বন্দি করে। তারা দীর্ঘ কাল বন্দি থানায় অবস্থান করে মৃত্যু বরণ করেন। আত্মাহ পাক তাদের স্মৃতি রক্ষার্থে মৃত্যু বরণের স্থানটির উপর ঘর নির্মাণের নির্দেশ দেন।

আত্মাহা যমযশরী বলেন, আসহাবে কাহাফের মৃত্যুর স্থানটিকে পাথর দ্বারা বেষ্টিত করে সংরক্ষণ করার নির্দেশটি ঘর নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য হিসেবে বর্ণনা করেন। যেমন প্রিয় নবী (সঃ) এর কবরকে বেষ্টিতির সাহায্যে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

আর দ্বিতীয় আয়াতটির মধ্যে আসহাবে কাহাফের মৃত্যুর স্থানে মসজিদ নির্মাণের মূল লক্ষ্য ছিল যে, তাঁদের ভক্ত যুগপৎ যখন সেখানে উপস্থিত হবেন নামাজ দোয়া পাঠ করে সেই পবিত্র স্থান হতে যেন বরকত উপলব্ধি করতে পারে।



উক্ত দু'টি আয়াত দ্বারা পরিষ্কার বুঝা গেল যে, পূর্ব যুগে কবর পাকা করা এবং কবরের উপর ঘর নির্মাণ করার প্রচলন ছিল। বারতুল মোকাম্মেদেদের মধ্যে অবস্থিত আশ্বিয়া (আঃ) ও আতুলীয়ায় কেরামদের পাকা কবর ও স্মৃতি সৌধ নির্মাণ সম্বন্ধে যত্ন সহকারে ওমর ফারুক (রাঃ) সাফা দিচ্ছেন যে, পূর্ব যুগের কবর নির্মাণের স্বরূপ উক্ত নির্মাণ দ্বারা ছিল। এ দ্বারা মোতাবেক তিনি নিজ আমলের সাহাবায়ে কেরামদের কবর, মাজার নির্মাণ করে গেছেন। তাঁর নিজ পক্ষ হতে কোন নতুন কবর, মাজার নির্মাণের নিয়ম প্রনয়ন করেন নি।

আর হযরত আলী (রাঃ) প্রায় নবী (দঃ) এর নির্দেশের উপর আমল করছেন। তিনি দু'টি বহু সম্বন্ধে নির্দেশিত ছিলেন। ১। মজা মদীনার সড়কের ধারে ধারে কাকের মূশরিক কতৃক নির্মিত দেবদেবী ও প্রতিমা সমূহকে ভেঙ্গে নিশ্চিহ্ন করার।

আর মজা মদীনার যতগুলো মুসলমানদের কবর রয়েছে উহাকে ইসলামী নির্দেশন হিসেবে সম্মত করার। মোসলমানগণের প্রতিষ্ঠিত কবর সমূহকে সম্মত করার বহু তরীকা রয়েছে। যেমন যে সব কবর অঁকা বঁকা রয়েছে উহাকে সোজা করে দেয়া। মানুষ যখন লম্বা গঠনের তাই মানুষের কবরকে গোলাকার না করে লম্বা করা। পূর্ব যুগে কবর সমূহ উঠের পিঠের মত করে গোলাকার করে নির্মাণ করা হত। ইসলাম ধর্মে গোলাকার কবরের পরিবর্তে মুসলমানগণের কবরকে লম্বা সমতল করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। সমতলের সীমা হল কবরকে সরজমিন হতে আধা হাত পরিমাণ উঁচু করা। আর কবরের উপর যদি কৌববা নির্মাণ করা হয় তবে উহাও কবরের সোজা উপরের দিকে উঁচু করা।

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করা, কবরকে পাকা করা এবং কবরের পাখে নামাজ পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আবার এই নির্দেশের বিপক্ষেও একটি নির্দেশ দেখা যায়। যেমন :

ما روى عن النبي (ص) قوله لعن الله اليهود والنصارى  
الخذوا البور البائهم مساجدا - (بخارى)

অর্থাৎ হযরত নবী করীম (দঃ) বলেন, ইহুদী নাসারাদের উপর আল্লাহ পাকের লানত, তারা সব-সব নবীদের কবর সমূহকে মসজিদ রূপে ব্যবহার করতো। পক্ষান্তরে এই হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, কবরের উপর ঘর নির্মাণ করা এবং সেই ঘরকে মসজিদ রূপে ব্যবহার করা শরীরত সম্মত নয়।

**উত্তর :** ইসলামের পূর্ব যুগে ইহুদী নাসারাগণ সব-সব নবীর কবরের উপর স্মৃতি সৌধ বা ঘর নির্মাণ করতো ইহা তাদের দৃষ্টান্তমূলক অপরাধ ছিলনা। বরং তাদের অপরাধ ছিল যে, তারা আশ্বিয়াদের কবরকে কেবলা করতো এবং সেই কবরকে সিজদা করতো। কোন যুগেই কবর সিজদা করা শরীরত সম্মত ছিলনা। যেমন ইসলাম ধর্মে কবর সিজদা করা হারাম। তবে যে মসজিদের মধ্যে মাজার রয়েছে সেখানে গমন করলে এক সাওরাবের জায়গায় দু'টি সাওরাব পাওয়া যায়। প্রথম সাওরাবটি হল মসজিদে নামাজ পড়ার। দ্বিতীয় সাওরাবটি হল কবর জিয়ারত করার।

**প্রশ্ন :** কবরের পাখে নামাজ পড়লে কবরকে সিজদা করা হয় এই বৃদ্ধিতে মাজার ও নবগাহকে ভেঙ্গে ফেলা উচিত ?

**উত্তর :** শিরকী কাজে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা সাধারণতঃ মসজিদের মধ্যে নামাজ পড়াতেও রয়েছে। কেননা কবর বা কবরের ঘর যে সব বহু দ্বারা নির্মিত, মসজিদও এসব বহু দ্বারা নির্মিত। প্রশ্নকারীর সম্ভাব্য প্রশ্নের ভাষা অনুসারে মসজিদে নামাজ পড়াও শিরকী কাজ। কেননা মুসলিম যখন মসজিদে নামাজ পড়েন তখন সে তার সামনের প্রতিষ্ঠিত ইটপাথরের মেহরাব ও দেয়ালকে সিজদা করছে উহা প্রকাশ্য শিরক।



তদুপরি সে যদি ইমাম সাহেব দ্বারা নামাজ কালেয় করে তাহলে সে প্রথমে ইমাম সাহেবকে সিজদা করতেন। কারণ ইমাম সাহেব মুসলিমদের পিছে নাই। বরং তিনি মুসলিমদের সামনে রয়েছেন। যদি খাটি করে শিরিক মূল্য নামাজ পড়তে হয় তাহলে প্রশ্নকারীর জামাতে ইমামকে মুসলিমদের পিছে রেখে নামাজ পড়তে হয়। ইমাম সাহেব হলেন নামাজের পরিচালক। আর পরিচালক সব সময় পিছনে থাকেন। যেমন গাখাল গরু-ছাগলের বাতানের পিছনে থেকে বিভিন্ন বাক্য দ্বারা সবচেয়ে বেধে নির্দেশ করে। তদুপ ইমাম সাহেব মুসলিমদের পিছনে থেকে নামাজ পরিচালনা করলে ক্ষতি কি?

### কবরের পার্শ্বে নামাজ পড়ার বিধান

প্রিয় নবী হুজুরে পাক (সঃ) এর রওজা শরীফ নির্মানের পর হতে যুগ যুগ পর্যন্ত রওজার পার্শ্বে ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ ভিন্ন ভিন্ন কারণে নামাজ পড়ে আসছেন। রওজা শরীফ সংলগ্ন “বেহেশতের টুকরা” নামক একটি পবিত্র স্থান রয়েছে যার মরফীয়া আলাহ পাকের আওশের চেষ্টেও বেশী। এই রূপ পবিত্র স্থানে নামাজ পড়া ও দোয়া করা সুবৃত্ত। তৎকালের ধর্মপ্রাণ আশেয়ে রাসূলগণ দলে দলে আগমন করে তথায় নামাজ দোয়া দরুদ সালাম পাঠ বেধে একজন নজদী পন্থী (ইমাম ইবনে তাইমিয়া) একটি ফতোয়া রচনা করে মন্তব্য করেন যে, কবরের পার্শ্বে নামাজ পড়া হারাম।

যতমান যুগের নজদীগণ রওজার পার্শ্বে কাউকে নামাজ পড়তে দোয়া করতে দেখলে “কুন্, হারাম-কুন্, হারাম” বাক্য উচ্চারণ করে জিয়ারত-কারীগণকে তথা হতে বিভাভিত করে দেয়। (নাউজুবিল্লাহ)

এই শরতান ইমাম ‘জিয়ারত কুবুর’ নামক কিতাবের মধ্যে আরো বলেছে যে, নবীর রওজার না গিয়ে স্থানীয় মসজিদে নামাজ পড়ে দোয়া করলে সওয়াব বেশী হবে। হাদীস শরীফের মধ্যে উল্লেখ আছে যে, রওজা শরীফে প্রতি ঘন্টার ৭০ হাজার করে নৈনিত্বিন লক্ষ লক্ষ ফিরিশতা অবতরণ করতঃ জিয়ারত করে ঘন হজেন, এই সত্য কথাটি খবিহ ইমাম মোটেই বিশ্বাস করেনি।

ইসলাম ধর্মের একটি বিধান রয়েছে যে, কোন নবী ওলী কোন স্থানে অবতরণ করলে অথবা কোন বস্তুকে স্পর্শ করলে সেই স্থান বা বস্তুটি চিরকালের জন্য বরকতময় হয়ে যায়। যেমন সাকফা ও মারওরা এ দুটি পাহাড়ের উপর ইসলাম পূর্ব হযরত আদম (আঃ) ও হযরত হাওয়া (আঃ) অস্থায়ীভাবে বসেছিলেন, তাঁদের কণস্থায়ী বসাকৈ নব্বুতী নিবর্শন রূপে আজাহ পাক আখ্যায়িত করেন। যেমন আলাহ পাক বলেন: **ان الحفا** **والمرورة من شعائر الله** সাকফা মারওরা আলাহ পাকের নিবর্শন। সেই নিবর্শনীয় স্থানে গমন করে হাজীগণের দৌড়া দৌড়ী করা ফরজ কাজ রূপে বিবোধিত হয়। আর বেস্থানের নিকটবর্তী স্থানে সারোবুল মুরসা-লীনের নুতানী দেহ এক বিশেষ সময় পর্যন্ত অবস্থান করছে তাই সে স্থানটি চিরকালের জন্য বরকতময় হবে না কেন? সে স্থানে গমন করতঃ নামাজ দোয়া দরুদ পাঠ করলে হারাম হবে, এই মর্মে কোরআন হাদীস ইজমা কিয়াসে কোন নিষেধাজ্ঞা আছে বলে আমার মনে হয় না।

প্রিয় নবী রাসূলে পাক (সঃ)-এর আদি দাদা হযরত ইব্রাহীম খালিল-ল্লাহ (আঃ) যে পাহার খানার উপর দাঁড়িয়ে কা'বা ঘর নির্মাণ করেন, সেই পাহার খানা সে স্থানে বেধে দেওয়া হয়। সেই স্থানটি চিরকালের জন্য স্মরণীয় ঘন্য হয়। (مقام ابراهيم) আর সে স্থানটির বিশেষ গুরুত্ব প্রমাণ করার জন্য তথায় নামাজ পড়া ওয়াজিব। স্বয়ং আলাহ পাক এই নির্দেশটি দেন। আলাহ পাক এগণ্য করেন: **والطحا ومن مقام ابراهيم صلى**



ইসলামের বাস্তব ইতিহাস সাক্ষ্য রয়েছে যে, রাসুলে আকরাম (দঃ)-কে হযরত আরশা সিন্দিকা (রাঃ) এর হুজুরা মোবারকে দাফন করা হয়। হযরত আরশা সিন্দিকা (রাঃ) যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন উক্ত হুজুরাতে অবস্থান করে সেখানে নামাজ দোয়া পালন করতেন। যদি কবরের পাশে নামাজ কার্যে করা হারাম হত তবে তিনি কি করে সেখানে নামাজ পড়লেন। মনে রাখুন। কবরের পাশে নামাজ কার্যে করা হারাম নয় বরং সুন্নত।

হযরত আরশা সিন্দিকা (রাঃ) রওজা শরীফের বেণ্টনীর মধ্যে অবস্থান কালে যে নামাজ কার্যে করেছেন তা আল্লাহ পাকের জন্য কার্যে করেছেন। কারণ নামাজের মূল মালিক হলেন স্বয়ং আল্লাহ পাক। তবে হযরত আরশা সিন্দিকা (রাঃ) পূর্ণ অবগত ছিলেন, যে নামাজ আল্লাহ পাকের জন্য কার্যে হচ্ছে সেই নামাজ হুজুর (দঃ) মেরাজে গমনের পর তারিহ মাখামে চালু হয়েছে। ইতি পূর্বে কেহ তো আল্লাহর জন্য নামাজ কার্যে করেনি। আর আল্লাহ পাক তো নিজে এসে আমাদেরকে নামাজ পদ্ধতির প্রশিক্ষণ দেন নি। অর্থাৎ নামাজ আনয়ন কারীই নামাজের পূর্বাপর সব কিছুর প্রাপ্য অধিকারী। ইহা ছাড়া নামাজের মূল গঠনতন্ত্রের মধ্যে প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) শামিল আছেন। যেমন আল্লাহ পাকের জন্য তাকবীরে তাহরীমা সহকারে নামাজ শুরু করা হয়। সেই নামাজের সমাপ্তি ঘোষণা দেওয়া হয় আজালাৎ, আলাইকা আইয়ুহান নাবীয়া, বাক্য দ্বারা নবী পাকের নামে। নামাজ ও ইমানের শুরু হলেন আল্লা পাক এবং শেষ হলেন রাসুলে পাক (দঃ)। এই হিসেবে নামাজের মালিক হলেন আল্লাহ ও তার রাসুল উভয়েই একসঙ্গে। যদি রওজার পাশে নামাজ পড়া হয় তবে বলা হবে যে, নামাজের মালিকের জন্য নামাজ কার্যে করা হল। কবর হল সকলের জন্য একটি চির অবস্থান কেন্দ্র। হুজুরে পাক (দঃ) জন্ম অবস্থান কেন্দ্রে স্বয়ং আল্লাহ পাক ও সালাত পেশ করেছেন।

কবর বা প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) এর অবস্থান কেন্দ্রে নামাজ পড়ার প্রামাণ্য চিত্র হল পাবল কোরআন পাকের **ان الله وملائكته**

**يصلون على النبي** এই আয়াত খানাত। অর্থাৎ প্রিয় নবী হাবীনে খোদা। হযরত মোহাম্মদ (দঃ) পিতার নির্দিষ্ট বাসস্থানে মায়ের গর্ভ হতে জন্মিষ্ট হন তখন আল্লাহ পাকের পবিত্র জাত তার ফিরিশ্তাগণকে সঙ্গে নিয়ে প্রিয় নবীর গৃহ দ্বারে উপস্থিত হন। প্রথমে আল্লাহ পাক সতঃপর ফিরিশ্তাগণ পরঃপর প্রিয় নবীর উপর সালাত পাঠ করেন। তবে আল্লাহর সালাত পাঠ পদ্ধতি কিরূপ ছিল তা আল্লাহ পাকই ভাল জানেন। যিবি আমেনার গৃহ দ্বারে আল্লাহ পাক ও ফিরিশ্তাগণের স্ভাগমণের মূল লক্ষ্য ছিল যে, ইহা অতি পবিত্র স্থান। প্রিয় নবীর ইন্তেকালের পর রাত দিন ফিরিশ্তাগণ নবী পাকের রওজা শরীফে উপস্থিত হয়ে পূর্ববৎ আবিভাদন পেশ প্রথা চালু রেখেছেন আজও। ফিরিশ্তা জাতের উক্ত অবতরণ নীতি আমাদের জন্য নবী পাকের রওজাতে সালাত সালাম পেশ করার প্রামাণ্য চিত্র হিসেবে বিবোচিত।

প্রত্যেক আশেকে রাসুল যখন প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) এর দর-বারে উপস্থিত হন তখন তার রওজা শরীফকে সম্মুখে রেখে এক মনে এক খানে সালাত ও সালাম পেশ করেন। উল্লেখিত নিয়ম নীতির বিপরিত নীতি অবলম্বন করা রওজা পাকের সঙ্গে বেয়াদবী করার নামাশ্রয়। আজ-কাল দ্বারা রওজা পাকের পাশে নামাজ পড়তে বেরনা অথবা রওজা পাককে সম্মুখে করে দোয়া করতে বেরনা তারা নিঃসন্দেহে নবী পাকের ও ধর্মের চির শত্রু। নব্বদীর পরিপন্থী দল বিশেষ।



## তৃতীয় পাঠ কতিপয় ইসলামী নিদর্শন دارالسلام, دارالهدى, دارالرحمة

পাথর বেষ্টনি ও খোদাই করে লিখিত একখানা ঘরের নাম দারুল আরকম। প্রাচীন কালের আরবগণ এই ঘর খানাকে বৈদেশিক বনিক ও মুসলিমদের অবস্থানের জন্য নির্মাণ করেছিলেন। উক্ত ঘর খানাকে ইসলামী নিদর্শন রূপে আখ্যায়িত করার মূল কারণ এই যে, উহার মধ্যে প্রিয় নবী হুজুরে পাক (সঃ) ৪০ জন নও-মুসলমান সাহাবীকে সঙ্গে করে আত্মগোপন করেছিলেন। বর্তমানে তিনি এই স্থানে অবস্থান করেন ততদিন তিনি গোপনে গোপনে মঙ্গীগণকে ইসলামের শিক্ষার শিক্ষিত করেন। তাই উক্ত ঘর খানাকে ইসলামী যুগের প্রথম শিক্ষা কেন্দ্র বলা হয়। প্রিয় নবী হুজুরে পাক (সঃ) দারুল আরকমে আগ্রিত থাকার অবস্থায় হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার দোয়াটি করেন। আবার সেই ঘরে থাকতে থাকতেই তাঁর দোয়া আল্লাহ পাক বাস্তবে রূপায়িত করেন।

ইসলামের ইতিহাস সাক্ষ্য বহন করে যে, প্রিয় নবী হুজুরে পাক (সঃ) যখন গোপন সূত্রে ইসলাম প্রচারের নিয়ম ধারা চালু করলেন তখন মক্কা বাসীরা উহা জানতে পেরে তাঁর উপর-বিভিন্ন অত্যাচার শুরু করল। প্রিয় নবী রাসুলে পাক (সঃ) অপারগ হয়ে দারুল আরকমে আত্ম গোপন করে রইলেন। সেখানে আত্ম গোপনে থেকে আল্লাহ পাকের দরবারে প্রার্থনা করেন। হে আল্লাহ! আমি ইসলাম প্রচারে বাধা প্রাপ্ত হয়েছি। তুমি আবুজহেল অথবা হযরত ওমরকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে আমার হাতকে শক্ত কর।

আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় নবীর দোয়া সঙ্গে সঙ্গে কবুল করে নেন। অর্থাৎ হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর অন্তরে আল্লাহ পাক ইসলাম কবুল করার উদ্বেগ সৃষ্টি করেন।

একদা হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) মহানবী হুজুরে পাক (সঃ) এর মাথা দ্বিধাভিত্ত করার উদ্দেশ্যে তরবারী হাতে নিয়ে ঘর হতে বের হন। পথিমধ্যে তাঁকে কেহ বলল, আপনি যার মাথা কত'ন উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন, তাঁর মাথা কত'নের পূর্বে আপনি নিজ ঘরের খবর নিন। ইহা শুনে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) নিজ ভূমিপতি "সাদ" ও বোন ফাতেমার নিকট উপস্থিত হয়ে অনেক মার পিট করে শেষ পর্যন্ত বোনের মূখে তোর-আন তেলাওয়াত শুনে তাঁর অন্তর গলে গেল। তিনি চিংকার দিতে দিতে ভূমিপতিকে বললেন, আমাকে নবীর আশ্রানায় উপস্থিত কর। ভূমিপতি তাঁকে সঙ্গে করে ধীরে ধীরে গোপনে গোপনে "দারুল আরকমে" নিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখামাত্র ৪০ জন উপস্থিত সাহাবা ভয় ভীতি পরিহার করে তাকবীর ধবনী দিলেন। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) প্রিয় নবী হুজুরে পাকের নৃত্যনী চেহারা মোবারকের দিকে তাকিয়ে বললেন আস্-সালাম, ইয়া রাসুল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে ইসলামী কালেমা পাঠ করান।

হযরত ওমর ফারুক ইসলামী কালেমা পাঠ করার পর প্রিয় নবীর দরবারে নিবেদন করেন যে, আমি আপনাকে দারুল আরকমে আর গোপন থাকতে দিওনা, আপনি আমার সঙ্গে চলুন প্রকাশ্যে ধর্ম প্রচার করুন। হযরত ওমর ফারুক প্রিয় নবীকে সঙ্গে করে কা'বা ঘরের আঙ্গিনাতে অবস্থে উপস্থিত হন। আর ঘোষণা দিলে বলেন, আজ হতে প্রিয় নবী হুজুরে পাক (সঃ) কা'বার আঙ্গিনায় প্রকাশ্যে ইবাদত উপাসনা করবেন। যদি কেহ তাঁকে ইবাদত উপাসনা করতে বাধা দেয় তাহলে আমি তার মাথা কত'ন করে রেখে দিব এখানে।



প্রিয় নবী রাসুলে পাক (দঃ) হযরত ওমর ফারুকের আহ্বানের পর "দারুল আতকাম" ঘর খানা হতে ৪০ জন সাহাবীকে সঙ্গে করে বের হয়ে অবাধে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের সূচনা লাভ হয় দারুল আরকম রেখট হাউজ হতে বের হওয়ার পর। তৎকাল হতে উক্ত ঘর খানা ইসলামী নিদর্শন রূপে আখ্যায়িত হয়। সাহাবাগণ উক্ত ঘর খানাকে আবেগ সহকারে অবলোকন করতেন এবং সেখানে গিয়ে নামাজ পড়ে দোয়া করে নিজেদেরকে ধন্য মনে করতেন। এই স্থানটি দোয়া কবুলের স্থান।

ইসলামের পূর্ণ বিজয় সূচিত হওয়ার পর হতে তৎকালীন রাজা বাদশাহগণ দারুল আরকমের নির্মাণের প্রতি সুনজর রাখতেন। যুগযুগ ধরে সেখানে আশ্রয় নবী এবং রাসুলে পাকের হাদীসের চর্চা হত। এই ঘরের নির্মাণ কার্যে কোন কতি সাধন হলে তারা সঙ্গে সঙ্গে তখনই পুনঃ নির্মাণের ব্যবস্থা করতেন। দারুল আরকমের প্রায় পাথরের উপর সাহাবাগণ প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) এর উপদেশ বাণী খোদাই করে লেখে রেখেছিলেন। যেরূপে প্রবেশ করতে যে, বড় পাথর খানা প্রথমে নজরে পড়তো উহার উপর লেখা ছিল : **بسم الله الرحمن الرحيم**  
**لن يموت اذن الله ان ترفع ويذكر فيه اسمه يسبح**  
**له في الغدو والاصال -**

ইহার গুরুত্ব আরোপ করার জন্য আশ্রাহ পাকের কোরআন পাকের নির্দেশ রয়েছে **وَمِنَ اعْظَمِ شَعَائِرِ اللَّهِ فَإِذَا هِيَ تَقُودِي الْقُلُوبَ** আশ্রাহ পাকের নিদর্শনাবলীর সম্মান বহন করা খোদা ভীতির প্রমাণ স্বরূপ।

নজদী ওহাবীগণ তুর্কী বাদশাহকে পরাজয় করানোর পর হতে আশ্রাহ পাক ও রাসুলে পাকের নিদর্শনাবলিকে প্রায় এক এক করে ভেঙ্গে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে। আর তারা উহাকে স্বয়ং বিনষ্ট করার নাম রেখেছিল ইসলাম।

দারুল আরকমের পবিত্র ঘর খানা ইসলামী আদর্শের প্রথম নিদর্শন। যে ঘর খানার মধ্যে মহানবী রাসুলে পাক (দঃ) প্রথম ইসলামী তালীম তরবিয়াত প্রদান করেন। যেখানে ইসলামের প্রধান ও প্রথম প্রতীক হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন। সে পবিত্র নিদর্শন খানাকে নজদীরা প্রথম ভাঙ্গনে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। "দারুল আরকম" জামাতুল মোহাম্মদাহ কবর স্থান সংলগ্ন ছিল। আজ যদি কোন ধর্ম প্রাণ মুসলমান নিশ্চিহ্ন দার খানার অনুসন্ধান করে সেই স্থানে নামাজ পড়ে দোয়া পাঠ পর ইসলামী আবেগ এগুৎ অনুভব করে তখন সৈয়দানকার প্রহরীরা শূন্য বলে কুল্ল, হারাম, কুল্ল, হারাম।

দারুল আরকমের প্রবেশ পথে উল্লেখিত আশ্রাহটি লেখার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, পরবর্তী যুগে যারা এখানে উপস্থিত হবেন তারা যেন বিশ্বাস করেন যে, কোন যুগে এখানে ইসলামী তালীম তরবিয়াত চালু ছিল।

নবী-রাসুলের শ্রদ্ধাগমনের প্রত্যেক স্থানগুলো আশ্রাহ পাকের নিদর্শন রূপে আখ্যায়িত করা হয়। যেমন "গারে হেরা" এর মধ্যে প্রথম প্রথম মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) আশ্রাহ পাকের এবাধত উপাসনার জন্য উপস্থিত হতেন। এই উপস্থিতির দরুন সেই স্থানটি নবীর নিদর্শন রূপে আখ্যায়িত হয়। আশ্রাহ পাকের প্রথম ওহী সেই পবিত্র স্থানে অবতীর্ণ হয়।

হেরা গৃহের মত আরো কতিপয় নবীর নিদর্শন রয়েছে যার মধ্যে নবী কখন একবার পদাঙ্গন করেন সেই স্থানটুকুও ইসলামের পরিভাষায় ইসলামী নিদর্শন রূপে আখ্যায়িত। যেমন "হুত্র" নামক গৃহ, এই গৃহাতে মহানবী (দঃ) হিজরত কালে মাত্র তিন দিন অবস্থান করেন। অনুরূপ যে স্থানে মহানবী সংগবদ্ধ ভাবে পদাঙ্গন করেন সেস্থান টুকু সর্বকালের জন্য ইসলামী নিদর্শন। যেমন শাঝারে রেদওয়ারের ছায়াতলে হযরত নবী করীম (দঃ) ১৪শত অথবা ১৫শত সাহাবা কেরামগণ সহ সমবেত হন।



হযরত নবী করীম (সঃ) এর অবস্থান কেন্দ্র ওহী অবতীর্ণ হওয়ার স্থান ছিল। আবার যেখানে ওহী নাযিল হত সেই স্থানটি চির কালের জন্য যোনার নিদর্শন রূপে পরিচিত হয়।

## ইসলামী আদর্শের অপূর্ব নিদর্শন :

### জামাতুল মোমাল্লা

জামাতুল মোমাল্লা হলো মক্কা নগরীর একটি প্রাচীনতম কবর স্থান। যা কা'বা গৃহ থেকে এক মাইল দূরে অবস্থিত। তথ্য কবর ভূমির উপর দিয়ে ওহাবী সরকার একটি প্রস্তুত সড়ক নির্মাণ করে। যার ফলে কবর-স্থানটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। কোন জিরারত কারী যেন জিরারত না করতে পারে সেই জন্য উহার চতুর্দিকে বেওয়াল নির্মাণ করে ঘেরাও দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি কবরের সকল প্রকার চিহ্নকে নিঃশিষ্ট করা হয়েছে। চতুর্দিকে শূন্য, মাটির খুপ পড়ে আছে। জিরারতের কোন ব্যবস্থা নাই। কোন কোন কবরের উপর চিহ্ন স্বরূপ বেনামী পাথরের খণ্ড ফেলে রাখা হয়েছে। তাও খুবই শোচনীয় ও অস্বাভাবিক অবস্থায় পড়ে আছে। উহার যে অংশে হযরত আবদুল্লাহ, হযরত আবদুল রহমান বিন আবু বকর, হযরত ইবনে ওমর, হযরত ইবনে জোবায়ের, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক, হযরত ইমাম ইবনে জোবায়ের ও হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়েব (সঃ) (অত্যাচারী হানজাজ বিন ইউসুফ কর্তৃক সকল শহীদদের) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ব্যক্তিদের কবর সমূহ অবস্থিত। উহার ভিতরে যাতায়াত করার একটি পথ রয়েছে। কিন্তু উক্ত পথে কবরের নিকট গমন করা যায় না। উহা শূন্য, মাঠ নতুন মত লাশ দাফন করার যাতায়াতের জন্য নিষিদ্ধ নহে। আর উক্ত কবর স্থানের যে অংশে হযরত খাদিজা (সঃ) এবং তাঁর অনুচর

বংশধরগণ সে স্থানে বিশ্রাম গ্রহণ করছেন। প্রিয় নবী হুজুরের পাক (সঃ) এর কলিজার টুকরা হযরত কাশেম (সঃ) ও তাঁর পিতৃব্য আবু, তালাবকে দাফন করা হয়েছে, তথ্য গমন করার কোন পথ রোধ হয় নি। এই স্থানাম ধন্য কবর সমূহ ভাংগা চুরা অবস্থায় মাটির খুপ আকারে পড়ে রয়েছে। বিশ্বের কোন কবর স্থানকে এরূপ শোচনীয় অবস্থায় ফেলে রাখা হয় নাই। উম্মুল মোমেনীন হযরত খাদিজাতুল কোবরা (সঃ) এর কবর দেখলে দেহ শিহরিয়া উঠে। মুসলমানগণ স্বীয় পরিদেহ কবরের উপর বিশ্ব বিশ্বাস "তাজমহল" নির্মাণ করে ফেলেছে। কিন্তু যে মহীরুসী নবী হযরত রাসূলে পাক (সঃ) এর সান্নিধ্য লাভ করার অপূর্ব সুযোগ পেয়েছেন, এবং যিনি হযরত ফাতেমা জোহরা (সঃ) এর জননী হওয়ার পরম গৌরব লাভ করেছেন, তিনি একটি ভরাজীবী কবরে শূন্যে আছেন।

এ পরিবার বর্গের যে মহান সত্তার সদকার কারণে আরবরা সম্মানের অধিকারী হয়েছে। তাঁর পবিত্র নিদর্শনাবলী সমূহের এই শোচনীয় অবস্থা। প্রকৃতপক্ষে উহা প্রকাশ্য ধর্ম অবমাননা। কা'বা শরীফের সন্নিকটে আবু কুবাইস পাহাড়ের উত্তরে মসজিদে বিলাল আজ খবাসমূহে পরিণত। স্বরূপ আবু কুবাইস পাহাড় যার উপর দাঁড়ালে প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করেন, সেই পাহাড়ের আজ কি অবস্থা বা না দেখলে অনুধাবন করা যাবে না। সমস্ত ভূ-খন্ডের মালিক হলেন মহান আমলাহ পাক, আর উহার মধ্যে গচ্ছিত সকল প্রকার ধনসম্পদেরও মালিক হলেন তিনিই। তাঁর সৃষ্টি জীবের ধন সম্পদে কোন ব্যক্তি এই রূপ অধিকার নাই যে, সে মানুষকে বানো পরিণত করে নিজে রক্তক সেজে বসবে।

মীনার মধ্যবর্তী স্থানে মসজিদে আজ খারেক অবস্থিত। উহা এমন স্থানে অবস্থিত যেখানে বিদায় হজ্জের সময় মহানবী রাসূলে পাক (সঃ) অবস্থান করেছিলেন এবং সাহাবীদের সাথে পাঁচ ওয়াস্ত নামাজ আদায় করেন। প্রথম জামর, ও দ্বিতীয় জামরুর মধ্যবর্তী স্থানে অপর একটি ছোট



মসজিদ অবস্থিত ছিল। উক্ত মসজিদকে মসজিদে আল-আশরাহ বলা হয়ে থাকে। বিদায় হজ্জের সময় আ হযরত (বঃ) এর কোরবানীর উট এখানে জবাই করেছেন। এই মসজিদটি আজ ধ্বংস রূপে পরিণত। জামরা আকাবার সাথান্য আগে ছোট একটি মসজিদ ছিল। উক্ত মসজিদকে মসজিদে আল-আশরাহ বলা হত। সেই স্থানটির নাম পর্যন্ত মূছে ফেলেছে বর্তমান আরবেরা। মদীনার কিছ, লোক এখানে এসে মহানুবী হাজ্জের পাক (বঃ) এর হাতে বারাত হয়েছিল।

### মসজিদে ইবনে আব্বাস :

মসজিদে ইবনে আব্বাস : এই মসজিদটিকে এমন এক স্থানে নির্মাণ করা হয়েছিল ঠিক সে সময় তারেক অবরোধ কালীন সময় মুসলিম সৈন্য বাহিনী এখানেই অবস্থান করেছিল এবং উক্ত স্থানে যুদ্ধও সংঘটিত হয়ে ছিল। উক্ত স্থানের সম্মুখে দক্ষিণ পশ্চিম কোণে তারেকের যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী সাহাবীদের মাজার অবস্থিত। প্রথমে উক্ত কবর সমূহকে সীমা টেনে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এখন উক্ত সীমার প্রাচীরকে সন্মূলে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান আরবগণ নবী, সাহাবা আওলীরা সকলের কবরকে এক এক করে ধ্বংস করছে। এমন কি তাদের হাত থেকে আরবের মসজিদও রক্ষা পাচ্ছেনা।

### ঐতিহাসিক বদর প্রান্তর :

ঐতিহাসিক বদর প্রান্তরের নির্দেশনীর বহু সমূহের অন্যতম নির্দেশন হল শহীদানে বদরগণের কবর। ঐ কবর সমূহ হিজাজের সাধারণ কবর সমূহের ন্যায় শোচনীয় অবস্থায় রয়েছে। কবরের উপর কোন চিহ্ন বা লেখা কিছুই নাই। শুধু, মাটির রূপ পড়ে আছে সেখানে। কোরআন পাকের ৭৫টি আয়াতে বদরের শহীদানগণের মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। আর তারা এখানে শূন্যে আছেন অতি শোচনীয় অবস্থায়। তারা সর্বমোট ৩১৩ জন ছিলেন। তাদের মধ্য হতে বদর মরদ্যানে সমাহিত হয়েছেন মাত্র ১৪ জন। তাদের সাহাবায়ে আলাহ পাক ফিরিশতা প্রেরণ করেছেন। যার বিবরণ সমূহ পবিত্র কোরআন পাকে পুঙ্খভূত করা হয়েছে। ইহা ছিল এইরূপ জিহাদ যে জিহাদের সময় আলাহ পাকের প্রিয় রাসূল মুসলমানদের সহায় সম্বল হীনতার কথা উল্লেখ করে আলাহ পাকের দরবারে দোয়া করেছিলেন।

হে আলাহ! আপনি আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, উহা আজ পূরণ করুন। অতঃপর তিনি সিজদায় পতিত হয়ে আলাহ পাকের নিকট স্বীয় আবেদন প্রার্থনা করেন।

হে খোদা। যদি এই মুষ্টিময় লোক আজ ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে কিহ্রামত পর্যন্ত আপনার নাম স্মরণ করার মত কেউ অবশিষ্ট থাকবেনা।

আলাহ পাক রাসূলে পাকের প্রার্থনার জবাবে ঘোষণা করেন : কোরাইশদের আগত বাহিনীকে পরাজিত করা হবে, আলাহ পাক তাঁর প্রিয় হাদীশের ইজা পূর্ণ করেছেন। বদর যুদ্ধে আরব প্রখ্যাত নেতা প্রধানগণ সামান্য সংখ্যক ইসলাম পন্থীদের হাতে নিহত হয়।

উক্ত বিজয় প্রান্তরে মদ্যাবিধি হযরত সাদ বিন ওবারদা (রাঃ) এর আওরাজের প্রতিধ্বনী যেমন আজও শুনা যাচ্ছে। আমি আলহ পাকের



শপথ করে বলছি। হে নবী! আপনি যদি হুকুম করেন, তাহলে আমি মাত্র মূখ্য হয়ে এখনই সমুদ্রে ফাণিয়ে পড়ব। আজও যেন বদর প্রান্তে হযরত মিকনাফ (রাঃ) এর সে আওলাজের প্রতিধ্বনিত হচ্ছে : আমরা হযরত মুসা (আঃ) এর ফাওমের ন্যায় নই, আমরা কখনো একথা বলবনা যে, হে নবী! আপনি ও আপনার খোদা গিয়ে যুদ্ধ করুন। বরং আমরা আপনার ডানে, বামে, সম্মুখে ও পিছনে থেকে (অর্থাৎ চতুর্দিকে আপনাকে) বেষ্টিত করে যুদ্ধ করব।

তারি সংখ্যায় ছিলেন মাত্র ৩১৩ জন। তদুপরি তাদের মধ্যে অম্বা রোহী ছিল মাত্র দু'জন। সেক্ষেত্রে কোরাইশ বাহিনীর সংখ্যা ছিল এক হাজার। এর মধ্যে তাদের অম্বারোহী ছিল দুই শত। তাদের এই বিরাট শক্তিকে একেবারে হেস্ত নেষ্ট করে দেয়া হয়েছে। কোরাইশ নেতাদের মধ্যে ২৪জন নিহত হয়েছিল। যথা আবু জেহেল, মারাজ ও মোরাবেবজ নামক দুই খুবক ডাইরের হাতে নিহত হয়েছিল। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) তার মাথা কত'ন করে প্রিয় নবী রাসুলে পাক (দঃ) এর পদতলে রেখেছিলেন। কোরাইশ বাহিনীর প্রথম প্রধান সেনাপতি উতবা হযরত হামজা (রাঃ) এর হাতে নিহত হয়েছিল। এই সমস্ত হলো উক্ত যুদ্ধের বিজয়ের স্বাক্ষর। আর এই সমস্ত শহীদগণ যারা সেই দিন স্বর্গে হুজুরে পাক (দঃ) এর প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। তাঁদের কবর সমূহ আজ "সুন্নাতের উত্তরাধিকারীদের হাতে" পদদলিত হচ্ছে। ঐতিহাসিক মূল্যবান নিদর্শন সমূহ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আবু জেহেল, ওতবা যাকে বিলুপ্ত করতে পারে নাই ঐ সমস্ত নিদর্শন সমূহকে আজ আমরা স্বর্গে নিজেদের হাতে ধ্বংস করছি। বদরের শহীদাঙ্গণ আল্লাহ পাকের দরবারে এত মাকবুল ছিলেন বাদে নামের দোহাই দিয়ে যে কোন দোয়া করলে আল্লাহ পাক তা সঙ্গে সঙ্গে কবুল করেন।

প্রিয় নবী রাসুলে পাক (দঃ) হযরত জিব্রাইল (আঃ) কে উদ্দেশ্য করে বলেন, বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীগণ মূলমানবদের শ্রেষ্ঠ

অধিদার অধিকারী। প্রতি উত্তরে হযরত জিব্রাইল (আঃ) বলেন, কিরিশতাদের মধ্যেও বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীগণও শ্রেষ্ঠ মর্যাদাবান। (সহীহ বোখারী)

## জাঙ্গাতুল বাকী :

জাঙ্গাতুল বাকী ইসলামী জগতের অন্যতম কবরস্থান : যার বৈধ্য প্রায় আট একর পরিমান হবে। যার চতুর্দিকে প্রায় সাতো চার ফুট উঁচু প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। শব্দ মাত্র একটি দরজা রয়েছে গেইট আকারে তার উপর একজন ল-সম্র প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে সদা সর্বদা। কয়েক ব্যক্তি বাহিরে জিয়ারত কারীদের অপেক্ষার আছে। তারা কোন বিনিময় ছাড়া আব্দুল বারী কবর সমূহের নাম চিহ্ন ইচ্ছে মত দেখিয়ে থাকে। আর বলে এখানে দাড়াবেন না। চলে যান।

জাঙ্গাতুল মোরাল্লা কবরস্থানের ভাচ্চুরে যে করুন অবস্থা ছিল, এখানে আরো বেশী পরিমাণে ভাচ্চুর করা হয়েছে। কিন্তু জাঙ্গাতুল বাকীতে প্রিয় নবী রাসুলে পাক (দঃ) এর দুই তৃতীয়াংশ বংশধরদেরকে ইসলামের বিধান অনুযায়ী দাফন করা হয়েছে। আরো রয়েছে এখানে অগনিত শহীদ, সাহাবী আকাবেরে দীন ও আইম্মা কেহাম। তারা আজ তথায় ভীষণ অপমানের স্বীকার হয়ে আছেন। উহা দেখা মাত্রই সাধারণের শরীরের রক্ত বিস্মৃত জমাট হয়ে উঠে। নিজকে নিজে সংবরণ করার ক্ষমতা লোপ পেয়ে যায়। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) ঠিকই বলেছেন।

আরব বাসীরা হলো লাপ্যামহীন উটের ন্যায়, তাদের র'শ আমার হাতে সপর্ন করা হয়েছে। আমি তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করে ছাড়বই ইনশা আল্লাহ।



আমাতুল বাকীতে এখন কোন প্রকৃত আরব কবরস্থ হয় না। প্রকৃত আরববাসীগণ কবরে শূরে আছেন। মূলতঃ তারা ই ছিলেন প্রকৃত আরব-বাসী কোরআন পাক তাঁদের জন্য নাজিল হয়েছিল। আজ আমাদের মত অনারবগণ তথ্য গমণ করে থাকে। আর এমন এক দৃশ্যের সূচনা হয়ে থাকে যা দেখলে অন্তর কেঁপে উঠে। এখানে নবীর শহর মদীনা অবস্থিত। তাদের পাশেই জব্লে নূর, জবলে রহমত। সাফা পাহাড়, ওহুদ পাহাড় অবস্থিত। তাদের রাজ্য সমূহ প্রিয় নবী হুজুরে পাক (সঃ) এর পদধূলির কারণে উপকৃত হয়েছে। তাদের ডায়ার আল্লাহ পাক মহানবী রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে সম্বোধন করেছেন। সর্ব শেষ নবীকে তাদের মধ্যে প্রেরণ করা হয়েছিল। ইসলামের ইতিহাস তাদের কারণে সমৃদ্ধি লাভ করেছে। কিন্তু তাদের নিদর্শণ সমূহের সংরক্ষণ করাকে তারা হাজা কুন্স, হারামুন বলছে।

তারি বিম্ব, মাত্তি অনুধাবন করতে পারেন নাই যে, তাদের ঐ মাটিতে কে শূরে আছেন। মহানবী হুজুরে পাক (সঃ) এর কলিজার টুকরো গুলি শূরে আছেন। তারি জ্যোতিময় দৃষ্টি হলো এই সমস্ত জ্যোতিময় দৃষ্টির আলোক বিতরণ। তারি হলেন প্রিয় নবী হুজুরে পাক (সঃ) এর চার চাচা, চাচাত ভাইগণ, মুসলিম উম্মাহর মাতা, জাভায়েদ শাহজাদীগণ, আওলীগ, ফুকাহা, ওলামা, ন্যায় পরায়নগণ, হযরত হালিমা সাদীয়ার ন্যায় সন্তান্যবিত রমণী শূরে আছেন। কিন্তু আরব বাসীগণ উক্ত কবর সমূহ উপাটন করে তাদের নিজেদের জন্য গগনচুম্বী এটালিকা নির্মাণ করেছে।

উক্ত কবর স্থানে প্রবেশ করা মাতই ডান দিকের এক কোণে প্রিয় নবী হুজুরে পাক (সঃ) এর ফুকুগণ শূরে আছেন। আতেকা, সূফিরা ও ফাতেমার কবর সমূহ অবস্থিত। সামনে অগসর হলে দেখা যাক উম্মুল মুমিনিন নিদ্রামগ্ন আছেন, হযরত আরেশা, হযরত সাওদা, হযরত জহরব, হযরত হাজসা, হযরত উম্মুল হাসানীন, হযরত উম্মে সালামা, হযরত উম্মে হাব্বা ও হযরত সুফিরা (সঃ) প্রমুখের মাজার অবস্থিত।

তাঁদের সাথে সারিবদ্ধ ভাবে শূরে আছেন হযরত আকীল (সঃ) হযরত জাকির (সঃ) হযরত তৈরব (সঃ) হযরত ইবাম মালিক (সঃ) হযরত ইমাম নাকি (সঃ) তাঁদের কবরের এক পাশে অনেক শহীদগণের মাজারের এক অংশ অবস্থিত। উহার সামনের দিকে প্রিয় নবী রাসূলে পাক (সঃ) এর স্নেহের পুত্র হযরত ইব্রাহীম (সঃ) এর মাজার অবস্থিত রয়েছে। উহার পাশে পাশে হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (সঃ) হযরত রোকেরা বিনতে ওসমান মাজউন (সঃ) হযরত সাদ বিন আব, ওরাসাস (সঃ) হযরত ফাতেমা বিনতে আসাদ (সঃ) হযরত ইবনে তিমর (সঃ) হযরত মালিক আনসারী (সঃ) হযরত ইসমাইল বিন জাকির সাদেক (সঃ) প্রমুখের মাজার অবস্থিত। উক্ত মাজারের একট, দূরে প্রাচীরের সাথে হযরত হালিমা সাদীয়ার মাজার অবস্থিত।

উম্মুল মুমিনীনদের মাজারের দশ বার গজ সামনের দিকে একখণ্ড পাথরের টুকরা পড়ে আছে। উহা বেশী হলে পাঁচ বা তিন গজ লম্বা হবে। ঐই স্থানটি ৬টি কবরের স্থান সংকুলান পরিমান হবে, উহার উপর কোন কবরের চিহ্নই নাই, উপর পাথরের টুকরা সমূহ পড়ে আছে। উহার ডান পাশে রাসূলে পাক (সঃ) এর কন্যা শূরে আছেন। সামনে হুজুরে পাক (সঃ) এর চাচা হযরত আববাস (সঃ) এর মাজার অবস্থিত। হযরত আববাস (সঃ) এর মাজারের ডান পাশে হযরত ইমাম হাসান, হযরত ইমাম জরনাল আবদীন, হযরত ইবাম বাকের, হযরত ইমাম জাকির সাদেক (সঃ) এর মাজার সমূহ অবস্থিত, উহার প্রতিটি কবরই মসজিদে নববীর পাশেই হযরত ফাতেমা (সঃ) এর কবর প্রতিষ্ঠিত।

প্রিয় নবী রাসূলে পাক (সঃ) বলেছেন : ফাতেমা আমার ইজেকালের ৬মাস পর আমার বংশধরদের মধ্যে সর্ব প্রথম পর জগতে আমার সাথে সাক্ষাত করবে, উহা বাস্তবও হয়েছে।



আর একটি হাদীসে আছে : ফাতেমা আমার কলিজার টুকরা, যে ব্যক্তি তাকে দুঃখ দিবে, সে যেন আমাকেই দুঃখ দিল।

## জামাতুল বাকী কবর স্থানের পূর্বরূপ

ইসলামের ইতিহাস সাক্ষ্য বহন করে যে, নজদী সরকার তুর্কী সরকারকে প্রতিহত করে কমতার আসার পর তুর্কীদের শাসন আমলে জামাতুল বাকীতে অনেক কবর পাকা ছিল এবং উহার উপর খুব সুন্দর সুন্দর কোববা নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু নজদীগণ শরীফ হোসাইনকে পরাজিত করে মদীনায় নগরী দখল করার পর জামাতুল বাকীর অধিকাংশ পাকা কবর ও কোববা সমূহকে এক এক করে ধ্বংস করে দিয়েছে। কিন্তু মোটামুটি ভাবে মজা নগরীর আল মোরান্সা কবর স্থানের তুলনায় মদীনায় জামাতুল বাকীর পাকা কবরের সংখ্যা অনেক বেশী হবে। উহার দিকে যাতায়াতের জন্য যে সড়ক নির্মাণ করা হয় তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তবে জামাতুল মোরান্সার কবর স্থানের সোজা উপর দিয়ে বড় সড়ক নির্মাণ করা হয় ইহা খর্ম জ্বলমানাকর কার্য ছাড়া আর কিছুর নয়।

সাহাবা, আশ্বিনা ও আইশ্বায়ে কেরামদের কবর সম্বন্ধে ইতি পূর্বে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি। নজদীগণের মতে কবরের নিকট গমন করা এবং কবরের উপর ফুলের মালা দেওয়া সরাসরি বেদআত।

কিন্তু তাদের পরিভাষার বিধানীদের কবরের নিকট গমন করে তথ্য কুলের মালা দেয়া বেদআত নহে। আনীর ফাহাদ বিন সাউব যখন আমেরিকা গমন করে বৃষ্টি বাদলকে উৎসর্গ করে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের সমাধি স্থলে উপস্থিত হয়েছিলেন। আর সেখানে পরলোকগত প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের সমাধিতে ফুল দিয়েছিলেন। নজদীগণের নিকট এই প্রপঞ্চ বেদআত ছিল না।

ইসলামী নিদর্শনাবলী ও কবর সমূহের সাথে নজদীদের অত্যাচারের বিবরণ আপনারা এ পর্যন্ত বা অবগত হয়েছেন, এখন প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মুসলমান আপনারা বলুন তারা কিভাবে “আল মোরান্সা” “আল বাকীর” কবরস্থানদ্বয়কে ধ্বংস করে দিয়েছে? সাহাবায়ে কেরাম ও হুজুরে শাক (দঃ) এর পূর্ববর্তী বংশধরদের স্মৃতি চিহ্ন সমূহকে নিশ্চিত করে দিয়েছে তারা। ইসলামের প্রাচীন নিদর্শনাবলীকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। যদি তারা এরূপ নিদর্শনীয় কোন কাজ না করতো তাহলে উহা নজদীদের মতে তাওহীদের উপর আঘাত হানার শামিল হতো। আর উহাতে রিসালতের পরগাম বিলুপ্ত হয়ে পড়ত। (আব্দুগফেরুল্লাহ)

আমাদের এতদ্দেশের নজদী অনুসারীগণ শাহ সউদের প্রশংসায় জুমার খোব্বাতে উচ্চারণ করছেন, আলমোলতান, জিল্লুল্লাহী অর্থাৎ নজদীগণ নাকি আশ্বাহর ছায়া। যারা বাদশাহকে অমান্য করবে আল্লাহ তাদেরকে ইহ জগতে অপদস্ত করবেন।

আমাদের এতদ্দেশের একমূল গোলাপী নজদী আছে, যারা কবর জিয়ারত বন্ধ করে যোয়ার উদ্দেশ্যে কবর জিয়ারতকে কবর পূজা আখ্যায়িত করেছে। আরও নজদীগণ কবরের নিকট গমন করা বেদআত বলছে। আর বাহালী নজদীরা কবর ও মাজারের পাশে গমন করা শিরিক বলছেন। এই বিতর্ক দল অর্থাৎ যারা কবর জিয়ারতকে শিরিক বলছেন এবং তাড়াই আল্লাহকে শিরিক মতে রাখার জন্য আল্লাহ পাকের অত্যন্ত দরদী হয়ে গেছেন। প্রকৃত জিয়ারতকারীগণ আবেরাতের স্মরণ উদ্দেশ্যে যদি কবরের পাশে কোন অন্যান্য কাজ করে বসে তা তার শ্বইছার নয়। আর যদি কেহ শ্বইছার কবরের পাশে কোন অন্যান্য করে বসে, যেমন সিজদা করে বসল তখন অন্য জিয়ারতকারীর উপর ওয়াজিব সে যেন উক্ত কুকর্মকারীকে কুকর্ম হতে বাধা দেয়।



## মৌলবাদী শক্তির কালো মুখ

ইমাম বোখারী (রহঃ) বলেন : হযরত রিসা নবী (আঃ) এর যুগ হতে প্রায় নবী হুজুরে পাক (দঃ) এর জন্ম আবির্ভাব পর্যন্ত অন্তত ঐশত বছর কোন নবী বা রাসুলের শ্রুতগমণ ঘটেনি। সে যুগে মতাবাসীগণ নিজেদের চলার সুবিধার্থে সবইছে বিভিন্ন মতবাদ প্রতিষ্ঠার প্রতি আকৃষ্ট হইল। তাদের আবিষ্কৃত বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে মৌলবাদ মতবাদটি বিশেষ প্রসিদ্ধ। এ মৌলবাদকে তারা আরও ভূখণ্ডে বিভিন্ন নামে প্রচার করে। যেমন : 'বীন-ই এলাহী' 'বীন-ই তাওহীদ' 'খোদাবাদ' ইত্যাদি।

প্রকাশ থাকে যে, বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ধর্মের জন্য আল্লাহর শপক হতে এক একজন ধর্ম প্রবর্তক মনোনীত ছিলেন। কিন্তু এই মৌলবাদের প্রবর্তকের জন্য কোন ব্যক্তি মনোনীত ছিলেন তার নাম আজও কেউ জানেন না। তারা এই মতবাদটিকে বলাই আল্লাহ পাকের সহিত সম্পর্কিত করে থাকুক না টুকন আসলে ইহা আল্লাহ পাকের মনোনীত কোন ধর্ম নহে। যদি আল্লাহ পাকের মনোনীত কোন মতবাদ থাকতো তাহলে ইসলাম ধর্মের দ্বারা এই তথাকথিত মতবাদটি রহিত হতো না।

মৌলবাদশক্তি আরব ভূখণ্ডের বৃকে বহুল প্রচারিত হওয়ার মূল কারণ ছিল এই যে, এ মতবাদটি যথার্থ ভাবে পালন করলে বহু সুযোগ সুবিধা লাভ করা যেতো। আল্লাহ পাকের জন্য এবাশত বন্দেখীর মধ্যে অপকর্মে লিপ্ত হওয়ারকে ও তারা মৌলবাদ তীক্ষ্ণক এবাদত বলে গণ্য করতো।

একবার দু'জন মৌলবাদী প্রেমিক প্রেমিকা কা'বা ঘরের চতুর্দিকে তওরাফ প্রদর্শনের মধ্যে অপকর্মে লিপ্ত হলে অন্যান্য প্রদর্শনকারীরা এই কুকর্মে হাতে তালি দিয়ে সমর্থন দেয়, তখন সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাক উক্ত দু'জন ভাবিচারীর ছবি বিকৃত করে পাথরে পরিণত করে দেন। এই দু'জনের একজনের নাম আসাফ (পুরুষ) দ্বিতীয় জনের নাম নারেল্লা (মহিলা)।

তৎকালীন মদীনা প্রবাসী ইহুদীরা কাফের কতৃক মনগড়া মৌলবাদকে সমর্থন দেয়। যখন ইসলামী সংগ্রামের মাধ্যমে মৌলবাদী শক্তির মূল উৎস হতে লাগল তখন মজার কাফের ইহুদীকে বিকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য মদীনার ইহুদী সম্প্রদায়কে অনুরোধ জ্ঞাপন করে। ইহুদীরা এই অনুরোধ বাস্তবায়নের জন্য প্রায় নবী হুজুরে পাক (দঃ) এর সাথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে মৌলবাদের প্রবর্তক যদিও কাফের সম্প্রদায় ছিল কিন্তু মৌলবাদের বিস্তারক বা রক্ষক ছিল মদীনার ইহুদী সম্প্রদায় একক।

## ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী শক্তি :

বর্তমান যুগে ধর্ম পালনকারীর সংখ্যা অতি সামান্য এবং বিরল। প্রায় লোক হয়তো মৌলবাদী মতবাদে আছে অথবা ধর্ম নিরপেক্ষতা বাদে আছে। মৌলবাদীরাতো ধর্ম প্রবর্তকের নাম লয় অন্ততঃ। ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীগণ এই ব্যাপারে একেবারে নিরপেক্ষ। এই নিরপেক্ষতার না আছে আল্লাহ পাক, না আছে নবী পাক। আর না আছে পীর বুজ'গ। তারা ধর্ম পালনে একেবারে সন্তুষ্টবাদী।

ধর্মীর ক্ষেত্রে মৌলবাদী শক্তির খারোজী ফেকার মতাদর্শী। রাজ-নৈতিক ক্ষেত্রে যেই দলে সুবিধা রয়েছে সেই দলে থাকে প্রায়। ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীগণ বেহেশত দোষখ উভরটার আকাংখী। তাদের এক হাত দোষখের দিকে অন্য হাত বেহেশতের দিকে রেখে দিচ্ছে। এখন আল্লাহর ইচ্ছা-যেই দিকে নিবেন তিনি সেই দিকে শুরুর করে চলি যাবে তারা। এরা হলো মধ্যম পন্থী। আল্লাহ পাক মানুষ্যের জন্য দু'টি পথ নির্ধারণ করেছেন। প্রথম পথের পথিক হবেন মোমিন লোক। আর



বিভিন্ন পথের পথিক হইবে কাফের। এখন পথিকই নির্ধারণ করুক সে কোন পথের পথিক। এই দু' পথ ছাড়া আল্লাহ পাক কোন পথের দিকনির্দেশন করেন নাই।

### মৌলবাদী শক্তির সূচনা কাল

পঞ্চম হিজরী সনে মদীনাবাসী ইহুদী (মৌলবাদী শক্তির) আহবানে মক্কানিবাসী কাফের সম্প্রদায় মদীনায় আক্রমণ করে। আক্রমণে পরাজয় বরণ করে মক্কার কাফেরগণ মক্কায় চলে যায়, মদীনায় নিবাসী ইহুদী সম্প্রদায় মদীনায় থেকে যায়।

হযরত রাসুলে করীম (সঃ) মদীনায় প্রবাসী ইহুদীকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তোমরা আমার প্রতিবেশী হয়ে যখন এই কুকর্মে লিপ্ত হলে তখন তোমরা হত্যার উপযোগী হয়ে গেছ। তবে আমি তোমাদেরকে হত্যা না করে মদীনায় নিকটস্থ "খান্নাবার" এর কৃষি ভূমিতে বহিস্কার করলাম।

ইহুদী সম্প্রদায় মদীনায় হতে বহিস্কার হয়ে খান্নাবারের মধ্যে দু'বছর পর্যন্ত থেকে মদীনায় আক্রমণের জন্য আশ্রয়ক মূলক সেখানে কর্ণাট শক্ত শক্ত কিল্লা নির্মাণ করে। ৭ম হিজরী সনে হযরত আলী (রাঃ) কর্তৃক কিল্লা সমূহকে স্বমূলে ধ্বংস করানো হয়।

ইহুদী সম্প্রদায় বারংবার বিভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত হওয়ার পর হযরত নবী করীম (সঃ) তাদেরকে সমগ্র আরব হতে বহিস্কার করে বিভিন্ন দেশে বিতাড়িত করেন। তারা বহিস্কার হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে আরব বহিঃগত দেশের দিকে পাড়ি দেয়। তবে তাদের এক ক্ষুদ্র দল প্রারম্ভের ইয়েমেন প্রদেশে লুকিয়ে থাকে। এমনকি তারা হযরত ওসমান (রাঃ) এর খেলাফত প্রামাণ্যের প্রায় শেষ পর্যন্ত গুপ্তচর রূপে পালিয়ে

থাকে। ইয়েমেনের শাসনকর্তার হাতে ধরা পড়ার পর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হল তোমাদের পরিচিতি পেশ কর। তখন তারা মদীনায় মুসলমান হিসেবে পরিচিতি দিয়ার লক্ষ্যে মদীনায় গমনের নামে শাম দেশে গিয়ে পৌছে। তখন শাম দেশের শাসনকর্তা ছিলেন হযরত মুরাবিরা (রাঃ) তিনি আগত ইহুদী মৌলবাদী গুপ্তচরদের ঈমান আকীদা পরিষ্কার না করে তাদেরকে পৃথক পৃথক সৈন্য বাহিনী পদে নিযুক্ত করেন। গুপ্তচর ইহুদী সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রভারক আবদুল্লাহ বিন সাবাব বিশেষ উপযুক্ততা দেখে হযরত মুরাবিরা তাকে সৈন্য প্রধান পদে নিযুক্ত করেন।

যে বছর এই ইহুদী প্রভারক মুরাবিরার সৈন্য প্রধান হর ঠিক সেই বছর হযরত ওসমান (রাঃ) কে বিদ্রোহীরা শহীদ করে এবং তাঁরই স্থানে হযরত আলী (রাঃ) খলিফা নিযুক্ত হন। হযরত মুরাবিরা (রাঃ) কে তাঁর সৈন্য প্রধান উসকানী দিতে থাকে যে, আপনি হযরত ওসমানের বন্ধুদের বিচারের দাবীদার হউন। হযরত আলী (রাঃ) যদি সত্তর বিচার না করেন তাহলে আপনি হযরত আলী (রাঃ) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করুন। যুদ্ধ আমি নিজে পরিচালনা করবো ইনশাআল্লাহ।

হযরত আমীরে মুরাবিরার প্রধান সৈন্যপতি আবদুল্লাহ বিন সাবাব প্রখ্যাত মৌলবাদী শক্তি স্বরূপ মুরাবিরার নিকট যাত্রা কাশা করে বললঃ আপনার পিতা আবু সূফিয়ান আরব বিখ্যাত নেতাকে ৮ম হিজরী সনে মোহাম্মদ রাসুলুল্লাহ জোর জবর দ্বারা ইসলামে দীক্ষিত করান, আর আপনিও সেই দিন বাধ্য হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইতি পূর্বে হযরত আলী (রাঃ) এর মাধ্যমে আমাদের ইহুদী সম্প্রদায়কে প্রথমে মদীনায় হতে তার পর খান্নাবার হতে চির কালের জন্য বিদায় নিতে হয়। আজও আমরা স্বাধীন ভাবে আরবে বসবাস করাতো দূরের কথা বরং আরবে অনুপ্রবেশের অধিকার পাচ্ছি না।

প্রভারক সাবাব মুরাবিরাকে আরো বুকালেন যে, হযরত ওসমান গণি (রাঃ) আপনার বংশের লোক তাঁর হত্যার বিচারে বিলম্ব করা বান্, উমাইয়া



বংশের সম্মান হানীর নামান্তর। এই সব নানা প্রভারনা করতঃ আবদুল্লাহ বিন সাবা ইহুদী হযরত মুরাব্বিরা (রাঃ) কে হযরত আলী (রাঃ) এর উপর খেপায়ে তুলল। প্রভারক ইহুদীর পুসলানীর প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে হযরত মুরাব্বিরা (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ) এর বিপক্ষে হযরত ওসমান (রাঃ) কেসাস এর দাবীবার হয়ে গেলেন।

হযরত আলী (রাঃ) বুঝতে পারলেন যে, হযরত মুরাব্বিরা সাবা শত্রুতানের চক্রে আবদ্ধ হচ্ছে তাই তিনি মুরাব্বিরাকে শাম দেশের শাসন কর্তার পদ হতে বরখাস্ত করে সেই পদে অন্য লোক নিয়োগ করলেন। এতে মুরাব্বিরা আরো ক্রুদ্ধ হয়ে হযরত আলী (রাঃ) এর বিরুদ্ধে ফোঁরাত নদীর তীরে সিসফিন নামক স্থানে সৈন্য প্রেরণ করেন এবং সর্বপ্রথম প্রদক্ষেপে ফোঁরাত নদীর তীর দখল করে নিলেন।

হযরত আলী (রাঃ) বুঝলেন যে, হযরত ওসমান (রাঃ) কেসাসের ঘটনা অজ্ঞাত করে মুরাব্বিরা স্বয়ং প্রভারক ইহুদীর মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছেন। অপারগ তিনি ২০ হাজারের সৈন্যের একটি বাহিনী সিসফিনের সরদানে পাঠান। এই বাহিনী সে স্থানে পৌঁছে দেখেন যে, ফোঁরাত নদীর তীর মুরাব্বিরা বাহিনীর পূর্ণ দখলে রয়েছে।

হযরত আলী (রাঃ) এর সৈন্য প্রধান মুরাব্বিরার সৈন্য প্রধান (সাবা ইহুদী) এর সঙ্গে যোগাযোগ বহাল করে জিজ্ঞাস করলো যে, হযরত মুরাব্বিরা এবং হযরত আলী (রাঃ) এর মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির প্রতিশ্রুতি চলেছে যার পরিপ্রেক্ষিতে আজ দুই মুসলিম প্রতিপক্ষ ঘনৈঃ লিপ্ত হয়ে সৈন্য সমাবেশ করছেন এই ক্ষেত্রে তোমরা যে, হযরত আলী (রাঃ) এর বাহিনীর পানি রুখে রেখেছ এটাতে একেবারে হারাম। মুরাব্বিরার ইহুদী বাহিনী প্রতি উত্তরে বলল, আমরা সকল বাহিনী ইহুদী সম্প্রদায় এবং আমরা হালাল হারাম মানিনা। আর হযরত মুরাব্বিরাকেও আমাদের মত অনুসারী করে ফেলেছি।

এই জবাব পাওয়ার পর হযরত আলী (রাঃ) এর মুসলিম বাহিনী বুকে নিলেন যে, আমিহুদে মুরাব্বিরা এবং তার সৈন্য বাহিনী সকলই কাফের এবং ইহুদী মতবাদ সমর্থক। অতঃপর ইহুদী বাহিনী এবং মুসলিম বাহিনী পরস্পর বুকে মেতে উঠলো। মুসলিম বাহিনীর সম্মুখে যখন ইহুদী বাহিনী পরাজয় বরন নিশ্চিত হল তখন তারা আত্মা-খেদায়ে শত চিংকার দিল কিন্তু আব্দুল্লাহ তারের নিকে মূখ্য তোলে দেখলেন না একবার।

দিশা হারা হয়ে ইহুদী বাহিনী এবার কোরআনকে তীরের মাঝে গেঁথে গেঁথে চিংকার দিয়ে বলতে লাগল যে, হে মুসলিম বাহিনী! তোমরা এমতবদ্বার কি করে বুকে রত রয়েছ। তোমরা কি আব্দুল্লাহ পাকের গজবকে ভয় করনা।

হযরত আলী (রাঃ) এর বাহিনীর প্রায় লোকই মৌলবাদ সমর্থক ছিল তন্মধ্যে ৭০ জন লোক অল্প বিদ্যা প্রতি ভয়ংকর ছিল-যারা মশ্বের মত কোরআন পাঠ করতে পারত তবে কোরআন পাকের মর্মার্থ বুঝতে পারতোনা, তাঁদের মোহতামীম (পরিচালক) সাহেবের নাম ছিল "মাসরার বিন তামীম" এবং আওরাল সাহেবের নাম ছিল যারুদ বিন হোসাইন এই ৭০ জন হাফেজে কোরআন, ইহুদী সাবার কোরআনের দোহাইতে বড় অন্ততঃ হয়ে একে অপরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আলী (রাঃ) এর নিকট উপস্থিত হলেন। হযরত আলী (রাঃ) তাদেরকে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, পরাজয় বরন করলে নাকি? হাফেজে কোরআনগণ বললেন না। না হুজুর। আমরা বুকে অগ্রগামী রয়েছি তবে এক বিরাট অসুবিধা হয়ে গেছে যে, সাবারদল কোরআনকে তীরের মাঝে গেঁথে আমাদের পুনরনের সামনে নাড়া চাড়া দিচ্ছে। এমতবদ্বার আমাদের পক্ষে বুক চালান অসম্ভব হয়েছে।

হযরত আলী (রাঃ) বললেন, কোরআনকে তীরের মাঝে উত্তোলন মুরাব্বিরা বাহিনী করেছে তাই তারা এই অপকর্মের জন্য দায়ী হবে।



ইহা ছাড়া ইহুদীগণ যে কোরআনকে কোরআন বলে অজুহাত করেছে হয়তো উহা তাদের সেনা রেকর্ডার পুস্তক হইবে। এখন যাও তোমরা যুদ্ধে রত হও। হাফেজে কোরআনগণ যুদ্ধে রত হওয়ার জন্য রণক্ষেত্রে দিকে ঘুটে পড়লেন কিন্তু যুদ্ধের কণ্ঠের ভয়ে তারা সেখানে গিরে ঘোষণা দিল বিপরিত। অর্থাৎ হাফেজে কোরআনগণ এক বাক্যে বলে উঠলো : হযরত আলী (রাঃ) যুদ্ধ বন্ধ করার নির্দেশ দিলেছেন। এই ঘোষণা শুনে সকল সৈন্যদল যুদ্ধ বন্ধ করে মরদানে দাঁড়িয়ে রইল। এর খবরসুতে আবু দুল্লা বিন সাবা ইহুদী চিংকার দিয়ে বলতে লাগলো যে, তোমরা আমার দলে এসে পড়, হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) উভয় কাকের হয়ে গেছে। হযরত আলী (রাঃ) সৈন্য বাহিনী মোহতাম্মীম ও আওয়াল সাহেবের মূখের দিকে যখন চোরে রইল তখন তারা দু'জন মৌলবাদী আব্দুল্লাহ পশ্চী নির্দেশ দিলেন যে, আলী ও মুয়াবিয়া উভয় যখন কাকের হয়েছে তখন তাঁদের সেনা নিবাসে ফিরে যাওয়া যারনা। এখন সকল উভয়ের সৈন্যদল আবদুল্লাহ সাবার সঙ্গে হারুয়াতে চলে গেল। মোহ-তাম্মীম সাহেব ও আওয়াল সাহেব কোরআন হেফজের মহদি রক্ষা করে তারা দু'জন সৈন্য দলের লাইনের প্রথমে আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহর যিকির মূখে করে চলতে লাগল এবং সকল মৌলবাদী সৈন্য দু'জনার পিছে পিছে যাচ্ করতে করতে হারুয়ার মৌলবাদ বনাম দারুত-তাওহীদে পেশীছে উচ্চবরে আযান দিলো। আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ-আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ। এই ঘটনাটি সংগঠিত হয় বর্তমান কুরুকের হারান নামক অঞ্চলে।

## দমে দমে আব্দুল্লাহ - এবারের সংগ্রাম

### মৌলবাদী সংগ্রাম : লাইলাহা

#### ইল্লাল্লাহ :

হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার সেনা বাহিনীর প্রধানের নাম ছিল মৌলবাদী আবদুল্লাহ বিন সাবা এক একজন প্রখ্যাত ইহুদী। সে সিক-ফিনের যুদ্ধের অবসানের পর হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর যোদ্ধাগণকে বিশেষ প্রতারণার মাধ্যমে হারুয়াতে নিয়ে ইহুদী বানান্নে ফেলে।

হযরত আলী (রাঃ) এর সেনাবাহিনীতে ৭০ জন হাফেজে কোরআন ছিল। তারা ইহুদী সাবার খপ্পরে পড়ে প্রথমেই ইমান হারালো। হাফেজে কোরআনদের মধ্যে তিন জন অত্যন্ত জালানী সুরে কোরআন তেলাওয়াত করতে পারতেন। তাঁদের নাম যথাক্রমে এই : ১। মাসরার বিন তামীম। ২। যারেন বিন হাসিন ও ৩। ফারবা বিন নওকিল।

হাফেজে কোরআন "মাসরার" কে ঠাকুর পদে নিযুক্ত করা হয়। তিনি সাবা ইহুদীর নির্দেশ মোতাবেক হারুয়ার সংসদ ভবনে তালীম তরবিয়াতের জন্য "জামেরা ফোরকানীয়া" নামে একটি হেফজ খানা কার্যে করে। তালীম তরবীরতের নামে প্রথমে দমে দমে আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহর যিকির চাল, করান। লেবাসে শোষাকে তারা ছিলেন একবারে ফিরিশতা। হাবুয়াবাসীর হাস মুরগী, ভেড়া-ছাগল যত কিছ, চুরি ডাকাতি ছিন্তাই করে আত্মনাতে আনা হত এবং উহা আব্দুল্লাহ পশ্চীগণ বিসমিল্লাহ পাঠ করে হালাল করে দিতেন। ইহুদী পশ্চী হাফেজে কোরআনগণ নিজ শিক্ষা হতে অনেক নতুন বিধান চাল, করে একটি চমক সৃষ্টি করে ফেলে ছিলেন বটে।



হাফেজে কোরআনগণদের বড় খেদমত ছিল যে, আরী হারুরাতে আযান দিয়ে নামাজ কারেম করতেন। করুন সূরে কোরআন তেলাওয়াত করতেন। আফ্লাহ, আফ্লাহ, যিকির দ্বারা হারুরার ভূমিকে মূর্খিত করে তুলতেন। তখন যিকির আজকার ছাড়া প্রসিদ্ধি লাভের আর কোন উপায়ও ছিলনা। কারণ তারা তেলাওয়াত যিকির ছাড়া অন্য কিছু জানতেন না।

যায়েদ বিন হাসিন সাহেব মোহতারীম মাসরাব সাহেবের ছাত্র ছিলেন। তার দ্বারা আযান একমতের কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজ সমাধা হত না। তবে ফারদা বিন নওফিল সাহেব তিনি সামরিক বিভাগে ভাল উন্নতি করে ফেলেছিলেন। সে হযরত আমীরে মুরাবিরার একটি বিরাট বাহিনীকে সামরিক ক্যাবেলিয়ন দ্বারা নতীস্বীকার করিয়ে ফেলেছিলেন। আবদুল্লাহ বিন সাবার পর এই দ্বিতীয় ব্যক্তি মৌলবাদ বিস্তারের দায়িত্বভার নিজেই গ্রহণ করেন। মাসরাব ঐক্য যায়েদ এই দু'জন হযরত আলী (রাঃ) এর হাতে হারুরা আক্রমণে নিহত হয়।

মৌলবাদী হাফেজে কোরআনগণ যে মতলবে আফ্লাহকে যেই ভাবে অনুশীলন করেন সেই ভাবে পেয়েছিলেন। হযরত নুসা (আঃ) আম্মাহ পাকের দিদারের রিচাস করে আফ্লাহ পাককে তুর পাহাড়ের উপর পেয়েছিলেন। হযরত মোহাম্মদ (দঃ) আফ্লাহ পাকের দিদার লাভের জন্য মিরাজের রিচাস করেছিলেন তাই আকাশ জগতে আফ্লাহ পাকের দিদার লাভ করেন তিনি।

নমরুদ মালাজুন তাঁর শিকার দ্বারা আফ্লাহর রিচাস করে, আফ্লাহ পাক তাঁর সাধারণ রক্ত লাগানে নিজের পরিচিতি বহন করেন। ভারত উপমহাদেশে ওহাবী বারেকজী মাযহাব পত্তনকারী জনাব ইসমাইল দেহ-লভী সাহেব আফ্লাহ পাকের হাতের রিচাস করেছিলেন, আফ্লাহ পাক তার সেই মতলবী রিচাসকেও পূরা করেন। অর্থাৎ তিনি আফ্লাহ পাকের হাতকে টেনে নৈরদ আহাম্মদ ব্রেলভীর হাতে রেখে দিয়ে বললেন এখন

হতে আপনি আফ্লাহ পাকের মুরীদ। আর সম্পর্ক সরাসরি আফ্লাহ পাকের সাথে হয়ে গেছে তার জন্য নবীর সাথে সম্পর্ক করার আদৌ প্রয়োজন নেই।

বারেকজী পশ্চী ইসমাইল সাহেব, সৈয়দ আহাম্মদ ব্রেলভী (রহঃ) কে সঙ্গে করে বাল। কোটে শিব জাতির সাথে যুক্ত করার জন্য যখন পাঠান রাজ্যে পৌঁছে গেলেন তখন তিনি বিবাহ করার রিচাস করেন। আফ্লাহ পাক তাও পূর্ণ করেন। অর্থাৎ আফ্লাহ তার বিবাহ এর জন্য ইউসুফ জগজিরী পাঠানের দ্বাং মেয়েকে এক সঙ্গে বিবাহ করা নসিব করান।

শরতান মরদুদ রিচাস করলো যে, কোন পদ্ধতিতে হযরত আদম (আঃ) কে প্রত্যাহিত করা যায়। আফ্লাহ পাক তার সে মতলবও পূরা করেন। আফ্লাহ পাক নেককার ও বদকার সকলেরই আফ্লাহ। সকলেরই মতলব পূরা করেন। তবে দেখতে হবে সেই মতলবটা কোন ধরনের। যদি মতলব ভাল ধরনের হয় তবে উহার প্রতিফল ভাল হবে, আর মতলব খারাপ হলে তার প্রতিফল আহাম্মাম।

## একজন মৌলবাদ ওয়ায়েজের

### চমৎকার ঘটনা :

আমীরুল মুমেনীন হযরত আলী (রাঃ) এর মসজিদে কুফার বাতারাতে পথে একজন মানুষ বিষম কান্ডে ছিল। হযরত আলী (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন যে, তোমার উপর কে অত্যাচার করেছে, আমাকে বল। আমি তাকে কঠোর শাস্তি দিব। কিছু কন্দনকারী কবির ছাপে শড়ে কোন উত্তর দিতে সক্ষম হলনা। হযরত আলী (রাঃ) তাকে বৃকে জড়িয়ে মসজিদে কুফার মধ্যে নিয়ে গেলেন। নামাজ শেষে উপস্থিত মুসল্লিগণকে জিজ্ঞেস



করলেন, এই দুর্বল ব্যক্তিকে কোন ব্যক্তি অপদত্ত করেছ-দাঁড়াও। কেহ দাঁড়াল না। তবে উপস্থিত জনতার মধ্যে একব্যক্তি দাঁড়ালে বলল, হুজুর। কন্দনকারীকে কেহ আঘাত করেনি সে নিজের আঘাতে নিজেই কাদছে। এই কথা শুনে প্রত্যেক মুসল্লী কন্দনকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।

অগত্যা কন্দনকারী দাঁড়ালে বলল, আমাকে কেহ আঘাত করেনি বরং আমি মহামান্য একজন ওয়াজের নসিহতের মর্ম অর্থ অনুধাবন করে কাদছি। ওয়াজ সাহেব বেরূপ অন্তর কাপানীর ওয়াজ ফরমান এরূপ ওয়াজ আমি কারো মধ্যে আজ পর্যন্ত শুনিনি নেই।

হযরত আলী (রাঃ) বললেন ওয়াজ শূন্য, তুমি একা শুন নি বরং অনারাত শুনছে, তাহলে তুমি একা কেন কাদিছ ?

কন্দনকারী তখন ওয়াজের গ্রহস্যাটা খুলে বলল। ১। ওয়াজে সাহেব শূন্য, আল্লাহ পাকের রশি শক্ত ভাবে ধরার কথা বলছেন। সেই ক্ষেত্রে আমি ধর্মের রশি ধরে বসে আছি। ওয়াজে সাহেব আরো বলেছেন আল্লাহ পাকের রশি হাত ছাড়া হলে দোষখগামী হতে হবে। দোষে প্রবেশ করলে সেখানে সাপ বিড়, চরম ভাবে ধ্বংসন করবে। হুজুর। আমি দোষখের ভয়ে কাদছি। আপনি কাণ্ডকে শান্তি দিবেন না। হযরত আলী (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, ইহা ছাড়া তুমি তার অন্য কোন ওয়াজ শুনোছ ? কন্দনকারী বলল হ্যাঁ।

২। মহামান্য ওয়াজেজীন সাহেব আরো বলেছেন, ধর্ম পালন ক্ষেত্রে সকল মানব সন্তান। অর্থাৎ কাফের কুফরী ধর্ম পালন করতে পারবে। আর মুসলমানগণ ইসলাম ধর্ম পালন করতে পারে। ধর্ম পালন ক্ষেত্রে এক ধর্ম অবলম্বী অন্যের উপর কোন বাড়াবাড়ী করবেন না। সব সময় ধর্ম নিরপেক্ষ থাকবেন এটা আল্লাহর অকাত্য ঘোষণা।

হযরত আলী (রাঃ) বক্তৃতা পারলেন যে, কুফার মসজিদে মৌলবাধী শয়তান প্রবেশ করেছে। প্রত্যেক সেই মৌলবাদ পন্থী শয়তান ওয়াজেজকে

সমুখে ভেঁকে বললেন, আল্লাহ পাকের রশি ধরে রাখার অর্থ কি ? কোরআনের এক আয়াত অন্য আয়াতের বিধান রহিত হওয়ার আইন কি ?

ওয়াজে সাহেব যখন কোন উত্তর দিতে পারলেন না তখন তাকে ধোঁয়াঘাত করে মসজিদ হতে বিতাড়িত করেন। এই মৌলবাধীর হাতে হযরত আলী (রাঃ) শহীদ হন।

নোট : হিন্দুস্থানী ওহাবী আলেমরাও মৌলবাদ পন্থী ছিল। কারণ বেওদুদ মাদানার বড় মুরব্বী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী সাহেব সন্ধানী খারেজী ফেকাকে কাফের বলতেন না। তিনি বলতেন যারা খারেজী ফেকাকে কাফের বলবে তারা কাফের হবে। (ফতোয়ায়ে রশিদিয়া ৪০ পৃঃ)

- রাফেজী ও খারেজীকে কাফের বলার মধ্যে মতভেদ আছে। ৬২ পৃঃ
- সাহাবা কেরামকে কাফের বললে কোন ক্ষতি নাই। ১০১ পৃঃ
- হানাফী শাফেরী ইত্যাদি মাযহাব ঘৃণিত-সবিলুর রোশাদ। ২১ ..
- সাহাবা কেরামদের সঙ্গে বে-আদবী করা সাধারণ গোনাহ। তবে বেওদুদগণের সঙ্গে বেআদবী করলে কাফের হবে। ৯৬ পৃঃ রশিদ
- সাহাবা কেরামগণকে কাফের বললে সুন্নিত ব্যক্তি হর না। রশিদিয়া ৪২ পৃঃ।



## হযরত আদম ও ইবলিশ শয়তানের মধ্যে লুকোচুরি

হযরত আদম (আঃ) ও ইবলিশ শয়তানের মধ্যে খাম্বাসের লালন পালনকে কেন্দ্র করে যেই লুকোচুরি সংগঠিত হয়, হাকীমে তিরমীজী তা হুদাহ, "নাওয়ারিরুল উসুল" নামক গ্রন্থে সুবিস্তারে লিপিবদ্ধ করেন। আশ্লামা ইমাম ফুরত্বা (রহঃ) উক্ত ঘটনাটিকে হযরত ওহাব বিন মোনাব্বাহ (রাঃ) হতে সনদ সহকারে জামেউল আহকাম গ্রন্থে সুবিস্তারে বর্ণনা করেন।

**লুকোচুরি :** ইবলিশ শয়তানের প্রভাবনার শিকার হয়ে হযরত আদম ও হযরত হাওয়া (আঃ) দু'জন শান্তির স্থান বেহেশত হতে বিতাড়িত হন। অতঃপর তারা দু'জন শান্তি ভোগ করার জন্য শ্রীলংকায় ঘর বাড়ী বেধে কৃষিকার্যে নিমগ্ন হন। কারণ তাঁদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উৎসহ ছিল কৃষি কার্য সম্প্রদান।

একদা হযরত আদম (আঃ) বিবি হাওয়া (আঃ) কে গৃহে রেখে স্বয়ং কৃষি কাজে চলে যান। এই সুযোগে ইবলিশ শয়তান খাম্বাস নামের নিজ শিশু, সন্তানকে এনে বিবি হাওয়া (আঃ) এর লালন পালনে দেয়। বিবি হাওয়া (আঃ) এর তখনো কোন সন্তান সন্ততি জন্ম গ্রহন করে ছিলেন না। তাই তিনি আদম যত্নে খাম্বাস শিশুটিকে দু'ভাত খাওয়ায়ে পালন পোষণ করতে থাকেন।

হযরত আদম (আঃ) বাড়ী ফিরে দেখলেন যে, বিবি সাহেবা একটি অপরিচিত সন্তানকে বর করছেন, তিনি অবাগ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন এই শিশু, পেলো কোথায়? বিবি সাহেবা জবাব দিলেন যে, এক অপরিচিত মান্নু আমাকে এই শিশুটি দিয়ে গেছে। আমি নিঃপাপ শিশুর লালন পালন করছি এতে আপনার অসন্তোষের কোন কারণ থাকতে পারেনা।

হযরত আদম (আঃ) বললেন, বিবি! শিশুতো পালননা বরং কাল সাপ পালন। কারণ এই শিশুতো ইবলিশ শয়তানের যার কুপ্ররোচনার পড়ে আমরা নিবিক্ত গাছের ফল খেয়ে আজ দু'বদেশে নিজনি স্থানে শান্তিভোগ করছি। আর এদিকে তুমি আমার স্ত্রী হয়ে শয়তানের শিশু ছেলে খাম্বাসকে লালন পালন করছ।

বিবি হাওয়া (আঃ) বললেন ইবলিশ শয়তানতো নিঃসন্দেহে পাপিষ্ঠ তবে তার ছেলেতো একেবারে বেগুনোহ। স্বামী স্ত্রী মধ্যে অনেক কথা কাটা কাটির পর হযরত আদম (আঃ) ক্রুদ্ধ হয়ে বিবি কে বললেন শিশুটিকে আমার সমুখে হাজির কর আমি তাকে টুকরো টুকরো করে নিশ্চিহ্ন করে দিব। বিবি হাওয়া বললেন আপনি কি করতে যাচ্ছেন জানিনা তবে আমাকে এই অপরাধে জড়াবে না কিছু।

○ হযরত আদম (আঃ) এর সামনে খাম্বাস শিশুকে উপস্থিত করার পর তিনি দাঁড় দিগে চার খন্ড করে বাড়ীর চারটি গাছের সঙ্গে লটকায় রাখলেন। অতঃপর তিনি খাওয়া খাওয়া করে কৃষিকাজের প্রতি মন্থ হন। ইবলিশ শয়তান এসব কর্ম কান্ড দূর থেকে প্রত্যক্ষ করছিল। হযরত আদম (আঃ) এর বাড়ী হতে বের হওয়ার পর পরই শয়তান বিবি হাওয়ার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল আমার ছেলে কোথায়? প্রতি উত্তরে বিবি হাওয়া বললেন আমার স্বামী নিরপরাধ শিশু, সন্তানটিকে খন্ড খন্ড করে গাছের সাথে লটকিয়ে রেখেছেন। এই চরম মন্থতৈ আমার কিছ, করারও ছিলনা। ইবলিশ শয়তান বিবি হাওয়া (আঃ) এর বত্বা শুনে গাছের নিচে দাড়িয়ে হে খাম্বাস! হে খাম্বাস! বাক্য উচ্চারণ কঠোর চিংকার দিতে লাগলো। খাম্বাস পিতার ডাক শুনে জবাব দিল বাবা আমি গাছের সঙ্গে লটকিয়ে রইছি। শয়তান বলল স্বশরীরে নেমে এসো। খাম্বাস পূর্ব বত্ব স্বশরীরে নেমে পিতার সমীপে উপস্থিত হল। অতঃপর ইবলিশ



শরতান পুনঃবার খাম্বাসকে বিবি হাওয়ার লালন পালনে দিল। এবার ও তিনি পূর্বের ন্যায় খাম্বাসকে দু'খভাত খাওয়ায়ে লালন পালন শুরুর করলেন।

○ কম' বিরতি পর হযরত আদম (আঃ) গৃহে প্রবেশ করে দেখলেন যে, তিনি যেই শিশুকে খন্ড খন্ড করে গাছে লটকিয়ে রেখে ছিলেন সে পুনঃবার জীবিত হয়ে বিবি হাওয়ার লালন পালনে রতছে। এবার স্বহস্তে খাম্বাসকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে হাড় মাংশ খন্ড খন্ড করে আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সমুদ্রের তীরে নিয়ে বাতাসে উড়িয়ে দেন। হযরত আদম (আঃ) ধারণা করেছিলেন যে, এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে ইবলিশ শরতান তার শিশু সন্তান খাম্বাসের সন্ধান একেবারেই পাবে না, কিন্তু ঘটনার ফলাফল বিপরিত হল।

○ হযরত আদম (আঃ) খাম্বাসের ছাই সমুদ্রের বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে গৃহে ফিরে যাওয়ার পর পূর্বের ন্যায় কুহি কাজে বসলেন। তিনি কিছ, দূরে যাওয়ার পর ইবলিশ শরতান পূর্বের ন্যায় বিবি হাওয়ার ঘারে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো আমার ছেলে কোথায়? প্রতি উত্তরে বিবি হাওয়া বললেন হযরত আদম (আঃ) তো এবার খাম্বাসকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে বাতাসে উড়িয়ে দিয়েছেন।

ইবলিশ শরতান সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হয়ে জোরে জোরে চিৎকার দিতে লাগলো, হে খাম্বাস! হে খাম্বাস! সমুদ্রের গভ' হতে খাম্বাস উত্তর দিল বাবা আমি সমুদ্রের গভ' রয়েছি। ইবলিশ শরতান বলল পূর্বের ন্যায় স্বঘরীয়ে আমার সমুদ্রে উপস্থিত হও। খাম্বাস স্বঘরীয়ে উপস্থিত হওয়ার পর তাকে পুনঃবারও বিবি হাওয়ার লালন পালনে দিল। তিনিও আবার খাম্বাসের লালন পালন শুরুর করলেন।

○ হযরত আদম (আঃ) বাড়ী ফিরে দেখলেন যে, বিবি সাংগেবা খাম্বাসকে দু'খভাত খাওয়াচ্ছেন। তিনি ও বিবি হাওয়া দু'জন একত্রে হলে এবার খাম্বাসকে জবাই করে শরীরের মাংসকে কেটে কুটে পাতিলে ভতি করে

রান্নাবান্না করে পেট ভরে খেয়ে ফেললেন। হযরত আদম (আঃ) এবার কাজে না গিয়ে বাড়ীতে বসে রইলেন। আর শরতানের অপেক্ষা করতে লাগলেন যে, এবার সে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে আমি একটু দেখবো।

ইবলিশ শরতান ঠিক সময় হযরত আদম (আঃ) এর গৃহে উপস্থিত হল হযরত আদম শরতানকে লক করে বললেন আমার অনুপস্থিতিতে নিজ বেটাকে নিয়ে খুব দাবা খেলেছ। এবার উপায় কি? আমরা তো দু'জন খাম্বাসের মাংস রান্না বান্না করে খেয়ে ফেলছি। ইবলিশীর আর আরগা পাওনি? এখনতো ছেলে হারালে উপায় কি?

ইবলিশ শরতান হযরত আদম (আঃ) কে লক করে বলল হে আদম! তুমি ঐ আদম না। যেই আদম সামান্য চক্রান্তে খুব পাক খেয়ে বেহেশত হতে বের হয়ে আসছ। এখন তুমি আমার ছেলেকে দিয়ে দাবা খেলছ। একটু দেখ পরিনাম কি হয়।

এই বলে ইবলিশ শরতান হযরত আদম ও বিবি হাওয়া উভয়কে সামনে রেখে ফুৎকার দিল হে খাম্বাস! হে খাম্বাস! উভয়ের সীনার মধ্যে থেকে খাম্বাস জবাব দিল বাবা! আমি আদম ও হাওয়ার সিনাতে আটকা পড়ে রয়েছি বের হতে পারছি না। ইবলিশ শরতান উত্তর করলো হে খাম্বাস! এবার আর বের হয়েওনা আদম ও হাওয়ার অন্তরে লুকিয়ে থেকে কেরামত পূর্ণ কুমন্ত্রণা দিতে থাকো। এই চক্রান্ত বেলার পর হতে মানুষের সীনাই কুমন্ত্রণার কেন্দ্রস্থান হল।

সূরা নাসের তাকসীর করতে গিয়ে ইমাম কুতবী এই ব্যাখ্যাটি স্বীচিৎ জামেউল আহকাম গ্রন্থে স্ববিস্তারে আলোচনা করেন।



## খারেজী মাযহাব বা ইহুদী মাযহাব

খারেজী মাযহাবে ইহুদী মাযহাব নাম করণ করা হয় এই জন্য যে, এ তথাকথিত মাযহাব খানার প্রণেতা ছিল মৌলবাদী শক্তির অন্যতম নেতা আবদুল্লাহ বিন সাবা একজন প্রখ্যাত ইহুদী। মুসলিম উম্মা ঐ মাযহাবকে খারেজী মাযহাব বা ইহুদী মাযহাব নামকরণ করেছেন।

খারেজী মাযহাবের মূলনীতিতে রয়েছে শব্দ, আজাহ পাকের একত্ববাদ ও রব্বিয়ারতের বিখার্স ইমান প্রতিষ্ঠার একক শর্ত। নবী রাসূল আওলীরা বৃদ্ধরগানগণ খারেজীদের নজরে অত্যন্ত ঘৃণিত এবং প্রত্যাখ্যান যোগ্য। সেই কারণে তারা শবরং কাফের ইহুদী হয়ে শ্বনামধন্য নবী রাসূলগণকে মূশরিক নামে আখ্যায়িত করতো। তারা আজাহ পশ্চীর দাবীদার হয়ে সদা সর্বদা কুকার্য সম্পাদনে লিপ্ত থাকতো। খারেজীগণ মাযহাবী কর্ম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সেই যুগে ইরাক সংলগ্ন হারুরা নামক একটি নদীতে দারুত তাওহীদ নামে একটি সংসদ কার্যে মগ্ন ছিল। যার সংসদ সদস্যের সংখ্যা ছিল অন্তত ৬০ হাজার। যার প্রধান দোস্তাগো এর নাম ছিল নাসরার বিন তামীম (যাকেজে কোরআন) সহকারী মুরব্বীর নাম ছিল যারেন বিন হোসাইন।

প্রখ্যাত ইহুদী আবদুল্লাহ বিন সাবা এর মৃত্যুর পর তার স্থলা-বিধিত হয় প্রখ্যাত মৌলবাদী ফরহাব বিন নাওফিল। খারেজী মাযহাব এর ইমামগণের নাম যথাক্রমে এই : আবদুস সালাম ইবনে তাইমিরা ইবনে জুজী ও ইবনে কাইরুম প্রমুখ। খারেজী মাযহাবের উৎপত্তির সন হল ৩৭ হিজরী। এই হিজরী সনে হযরত আলী (রাঃ) প্রত্যেক খারেজী মৌলবাদী শক্তিগণের প্রত্যেক সম্মুখে নিম্নলিখিত করেণ।

## ওহাবীদের মূলধন কিতাবুত তাওহীদ

মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী প্রণীত কিতাবুত তাওহীদ নামের আরবী বই খানা নজদী পশ্চীগণের নীতিমালার মূলধন। উক্ত বইয়ের প্রণেতার মৃত্যুর পর যিনি বইখানা ও অস্তিত্বাহীন হয়ে যেত, আমার মনে হয় ওহাবী পশ্চীদের নাম পর্যন্ত হচ্ছে যেতো। ইসমাইল দেহলভী সাহেব বইখানার উদ্দেশ্য অনুবাদ করে নজদীগণের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখলেন। ইহা ছাড়া পুস্তক খানা আরবী ভাষায় লিখিত হওয়ার কারণে উহাতে কি রহস্য নিবদ্ধ আছে তা অনেকেই জানতেন। কিন্তু ভারত বিখ্যাত শরীর চর্চাবিদ পীর কেবলা জনাব সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী সাহেব উক্ত ধর্ম নাশা পুস্তকের অনুসন্ধান পেয়ে তাঁর একজন খাছ মুরব্বী ইসমাইল দেহলভীকে ইহার উদ্দেশ্য ভাষায় অনুবাদ করার নির্দেশ করে ভারত বর্ষে ওহাবী মিথ্যা মতবাদটিকে পুনঃ বিস্তার করে।

দেহলভী সাহেব পীরের নির্দেশ ক্রমে উক্ত পুস্তক খানার উদ্দেশ্য অনুবাদ করে নাম রাখলেন তাকবীরাতুল ইমান। অর্থাৎ ইমান শক্তকারী বই। কিন্তু বই খানা পাঠ করলে ইমান শক্ত হওয়ার স্থলে ইমানের মূল উপাঠন হয়ে যায়। কারণ বই খানার মধ্যে আশ্বরা, আওলীরা, সাহাবা ও বৃদ্ধ-গানেবীন সমূহকে অপমান সূচক বাক্যে যেভাবে ধোলাই করা হয়েছে তা আরবের চিরচরিত কোন কাফের মূশরিকও করেনি। বিশেষ করে প্রিয় নবী মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ হাবীখে খোদার অগণিত কৃপা করা হয় বিশেষ ভাবে উক্ত পুস্তকটিতে। যেমন পুস্তক খানার বিভিন্ন স্থানে প্রিয় নবী হুজুরের পাক (৭ঃ) কে উপহাস করে বলা হয় তিনি মরে মাটি মিশ্রিত হয়ে গেছেন, তাঁর দারা ইহকাল পরকালে কখনো কারো উপকার হতে পারেনা। তিনি শ্বশরীরে নূর ছিটলেন না বরং তিনি আমাদের মত সাধারণ মানুষ এবং মাটির মানুষ ছিলেন। মহানবী হুজুরের পাক (৭ঃ) এর



শানে মিলাদ মাহফিল সীয়াত অনুষ্ঠান করা হারাম কাজ। মৌলভী ইস-মাইল দেহলভী সাহেব ধর্ম কুৎসার স্বপক্ষে এবং নিজের প্রসিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে একবার দিল্লীর মসজিদ প্রান্তরে সুন্নী ওলামায়ে কেরামদের সঙ্গে বহুসংখ্যক প্রহণ করে। সুন্নী ওলামাগণ যখন দেহলভীকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমার দাবী যে, পির নবী হুজুরে পাক (পর) স্বশরীরে নূর ছিলেন না, তবে আফ্লাহ পাকের কোরআনের মধ্যে কেন তাঁকে নূর খোদা দেয়া হল? ইসমাইল সাহেব প্রশ্নের জবাব না দিতে পেরে মত্ত ভাগ করতে বাধ্য হন। কিন্তু জনতা মারমুখি হয়ে ইসমাইলকে মার ধর করতে চেষ্টাছিল।

আফ্লাহ পাকের কি হুকুম এই ধর্ম কুৎসার পর হতে ইসমাইল সাহেবের বাক শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু অন্তরের কুমন্ত্রণা শক্তি নষ্ট হয়ে ছিলনা। তাই তিনি অতি সংগোপনে তার পীরে কেবলকে আফ্লাহর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করতঃ শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি তথা খোদার আত্মনাতে কাটিয়ে দেন। অবশেষে তিনি পীরে কেবলার সঙ্গে শিখ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রওয়ানা দিলে ইউসুফ জগজয়ী তাকে পাঠান রাজ্যে গুলি করে হত্যা করে।

জনাব মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী সাহেব দিল্লীর মসজিদ প্রান্তরে ইসমাইল দেহলভীর ধর্ম কুৎসার অপবীতি ও নাজেহালকে গুরুত্ব সহকারে উপলব্ধি করতে থাকেন। তিনি সংকল্প করলেন যে, ইসমাইল দেহলভী সাহেবের তাকবিয়াতুল ইমানের নাপাক বিষয় বহুসমূহকে রূপান্তর করার জন্য জানে প্রানে উঠে পড়ে লাগলো এবং একটানা ওহাবী মাযহাবে এবং ইসমাইল সাহেবের ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে অন্তত কয়েক ডজন ফতোয়া রচনা করেন। জনাব খলিল আহাম্মদ আন্দুটি, আশরাফ আলী খানভীকে নিজের সহযোগী রূপে নিয়োগ করেন। এখন হতে ওহাবী মাযহাব আবার মাথা উত্তোলন করতে লাগল নতুনভাবে।

ওহাবী ফেকর প্রধান পণ্টপোষক ইসমাইল দেহলভী সাহেব মৌল-বাদী খারেজী মাযহাবের পূর্ণ সমর্থক ছিলেন যার প্রমানে নিম্ন বাক্যটি।

جسکے لومعه کامل ہوا اسکی گشاء وہ کام کر لیں ہے  
جو اوروں کی عبادت لہوں کر سکتی -

মৌলবাদীগণের পাপের কার্যকারীতা বা তাসির শক্তি এত বেশী যে, উহার মোকাবিলায় ইসলাম পন্থীগণের ইবাদত বন্দেগীর তাসির শক্তি অতি তুচ্ছ। অর্থাৎ মৌলবাদের মোকাবিলায় ইসলাম ধর্ম কিছূনা।

ওহাবীপন্থীরা খারেজী মাযহাবের নিয়ম নীতি আইন কানুন অক্ষরে অক্ষরে পালন করে এতে কোন সন্দেহ নেই। সে কারণে ইমাম ইবনে আবেদীন (রহঃ) ফতোয়া শামীর তৃতীয় খন্ড ৩১৯ পৃষ্ঠার সমস্ত ওহাবী-গণকে খারেজী মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত করে উভয় ফেককে আগ্যাসী সম্প্রদায়-বাদী জালেম ও ডাকু নামে আখ্যায়িত করেন।

ইসমাইল দেহলভীতে মৌলবাদীদের খারেজী মাযহাবকে মনে প্রানে প্রকাশ্যে প্রচার শুরু করেন। আর মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী, আশরাফ আলী খানভী ও খলিল আহাম্মদ আন্দুটি সাহেবান খারেজী মাযহাবের নাম পালটিয়ে দিয়ে ওহাবী মাযহাব নামকরণ করে হিন্দুস্থানের মধ্যে প্রচার করতে থাকেন। কোরআন পাকম প্রসিদ্ধ গ্রন্থ তাকসীয়ে সাবীর ২৩৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার ওহাবী ফেককে ডাকু সম্প্রদায়বাদী ও শয়-তানের দল বলে আখ্যা দেন। (সংক্ষেপ)



## গঙ্গুহীরা ডায়ে ওহাবী ফেরা

معهده بن عبد الوهاب لجدى كولوكون وهابى كمتى  
هس - وواجهها ادمى لها متبع سنت اوردينار لها  
عامل حدت لها بدعت وشركه من لوكون كوروكنا لها  
مكرشده امكى مزاج من لهن لفظ رشيد احمد دعاكو -  
(فتاوى رشيد - ١٢٤ - ١٢٥ - ١٢٦)

মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী সাহেব বলেন যে, মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীকে মানুষ ওহাবী এবং নজদী পন্থী হিসেবে ঘণা করে। তবে সে আমার নিকট বড় ভাল মানুষ এবং সত্যবাদী দীনদার ধার্মিক মানুষ ছিল। সে মানুষকে শিরিক ও বেদআতী কমে' লিপ্ত হতে নিতেনা। তার ব্যবহার ছিল অত্যন্ত খারাপ মেজাজ ছিল বিটবিটে। উক্ত সমর্থন থাকার দ্বারা প্রমানিত হল যে, রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী একজন খাটি ওহাবী ছিলো।

## ইসলামী ফতোয়ার ডায়ে ওহাবী :

(১) আগলামা ইবনে আবদীন বলেন, ওহাবীপন্থীরা ছিল মৌলবাদী আগ্রাসী শক্তি। তারা ছিল মজা মশীনা আক্রমণকারী। তারা মুসলমানদেরকে মশরিক বেদআতী বলতো। তারা নবী, সাহাবী, ওলীগণের বৈশিষ্ট্য সমূহ মেনে নিতেনা। সুন্নী ওলামা এবং সুন্নী আকীদা পন্থীগণ ছিলেন ওহাবীদের নজরে অতি ঘৃণিত। (ফতোয়া শামী)

(২) তফসীরে সাবী শরীফের গ্রন্থকার বলেন, ওহাবী ফেরা হেজাজ ভূমির এক চরম পন্থী আগ্রাসী দলের নাম। তাদের কাঁখে শরতান আরোহন করতেন। তারা কোরআন সুন্নাহর মনগড়া অর্থ করতো। ইত্য।

খনে খারাবী হাইজাক আগ্রাসনী কাজে সন। সর্বদা লিপ্ত হত। তাদের আকীদা আর খারেজী ফেরার আকীদার মধ্যে কোন পার্থক্য ছিলনা। (সাবী ২৩৫ পৃঃ)

(৩) আগলামা আনওয়ার শাহ কাশমেরী (রহঃ) বলেন, মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী ছিল একজন লম্পট কুখ্যাত অস্বাভাবিক কুপ্রজ্ঞানী মানুষ। সে মানুষকে কথার কথার কাকের বলতো। (ফরজুলবারী)

## হাদীসে রাসুল (দঃ)-এর ডায়ে ওহাবী

১। হযরত নবী করীম (সঃ) ফরমান, আরব ভূখণ্ডের পূর্ব দিক (নজদ) হতে কতিপয় লোকের আবির্ভাব হবে যারা শূন্য, কোরআন পড়তে পারবে তবে কোরআনের মর্ম অর্থ কিছ, বুঝবেনা।

২। ইমাম হিজাজের মধ্যে সীমিত, আর কুফর সীমিত পূর্ব দিকে নজদের মধ্যে সীমিত।

৩। যাদের বংশ এবং দেশের জন্য মহানবী হুজুরে শাক (সঃ) দোয়া করেন নি। তার বংশ জাত সকলেই অভিসপ্ত।

## খারেজী বা ইহুদী মাযহাবের প্রথম

সমর্থক : জনাব রশিদ

আহাম্মদ গঙ্গুহী

০ হিন্দুস্থানের মধ্যে খারেজী মাযহাব আনয়ন কারীর নাম ছিল মৌঃ ইসমাইল দেহলভী। রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী সাহেব বলেন খারেজী



মাযহাবপন্থী ইসমাইল বৈহলভী সাহেব অত্যন্ত সত্যবাদী ন্যায় পরামর্শ খাটি মান্য ছিলেন। তিনি খারিজী মাযহাব বিস্তারের লক্ষে ওহাবী নীতিমালার একটি আরবী বইকে উর্দু ও হিন্দীতে অনুবাদ করেন, মূল বইখানা যেমনি শূদ্ধ তেমনি অনুবাদও একেবারে খাটি। উক্ত দু'টি বইকে আমল করার জন্য সঙ্গে রাখার উপদেশ দিচ্ছি।

গঙ্গুহী সাহেব আরো বলেন, আমার উল্লেখিত উপদেশ এবং নির্দেশের উপেক্ষা করে বই দু'টির যে ব্যক্তি সমালোচনা বা অবহেলা করবে সেই ব্যক্তি খাটি মশরিক এবং গোমরাহ। (ফতোয়া রশিদিয়া)

০ অভিশপ্ত নজদের অধিবাসী মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব, যাকে মানুষ ওহাবী বলে ঘৃণা করে তিনিও সত্যবাদী এবং গঙ্গুহপন্থী লোক ছিলেন। সে সব সময় হাদীসের সমুদায়ের অনুসরণ করতো এবং বেদআদ শিরিকের কথা একেবারে শুনতে পারতেন না। তবে তার মেজাজ ছিল খিটখিটে। (ফতোয়া রশিদিয়া ৯৬-২৩৭ পৃঃ)

### ওহাবী মাযহাবের হলপ নামা

سن لو احق ومن هـ جور شهـ احمد كى زبـان سے  
لكلنا هـ اور من يـم كـهنا هـون كه اس زمانه هـون  
هدايت ولجات مولوك هـ مـورى الـهاجـ اسـ (الركرة  
الرشيد كنگوهى)

প্রচলিত শাফেরী হানাকী সকল মাযহাব বাদ দিয়ে আমার মাযহাবে দীক্ষিত হও। হে দেওবন্দীগণ! তোমরা মনে রেখো আমি রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহীর পবিত্র মুখ হতে যে কথা বের হয় তা একেবারে খাটি এবং সত্য। আমি তোমাদের বিশ্বাসে জন্য আল্লাহ পাকের কছম করে বলছি, এই ফাসাদের বামানার হেদায়েত ও নাজাত আমার কথার অনুসরণের উপর নির্ভর করে। (তাবিকিরাতুর রশিদ)

গঙ্গুহী সাহেব যত কছম করে বক্তব্য পেশ করুক না কেন কোন দেওবন্দী তার কথার বিশ্বাসী হলনা। প্রকাশ্য শব্দে প্রত্যেক দেওবন্দী বলতে শুরু করলো যে, রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী নিসন্দেহে কাফের এবং মর্যাদহীন। ঠাকুর নানা বিশেষ হারা হলে তার একান্ত বড় জনাব খলিল আহাম্মদ আম্বু-টির সঙ্গে সলা পরামর্শ করলেন তখন আম্বুটি সাহেব শাস্তনা দিলেন যে, আপনি কাফের হবেন কেন? আপনাকে আমি মুসলমান বানিয়ে ছাড়ক ইনশা আল্লাহ।

### দেওবন্দী মাযহাবে ভোট দিন

كنگوهى كى ايات والعمى اس قابل هـون كه اس وـ  
اعتماد كـهـا جـا وـ اور ان سب كو مـا هـب لـرا رد ما جـائـى  
(المهنة صفـحه ۵۰ مطـر ۳)

জনাব আম্বুটি সাহেব শাস্তনা বাক্যে বললেন তোমাদের বড় মুরব্বী জনাব গঙ্গুহী সাহেবের উপর উল্লেখিত উপদেশ বাক্যেরদ্বারা বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ নাই। সত্যিই তার উপদেশ বাক্যাবলী অতি নির্ভরযোগ্য কালাম। অর্থাৎ তিনি দার্শনিক উক্তি করে দেওবন্দীগণের জন্য একটি নতুন মাযহাব প্রবরন করতে চান। যার নাম হবে ওহাবী মাযহাব বনাম দেওবন্দী মাযহাব।

খলিল সাহেবের শাস্তনা বাক্য দ্বারা দেওবন্দীগণ শূদ্ধ হতে পারলেন যে, রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী নিতান্ত খাটি এবং হক মান্য। তার প্রণীত মাযহাবে সকলেই প্রবেশ করা অতি প্রয়োজন। নচেৎ জাহান্নামে যেতে হবে। দোষে বাবার ভয়ে সকল দেওবন্দ প্রবাসী গুর গুর করে দেওবন্দী মাযহাবে প্রবেশ করতে লাগলো, এটা দেওবন্দী মাযহাবের উৎপত্তির ঘটনা।



## আশরাফ আলী খানভীর ঘোষনা

میں لوگوں کو کھانا کھاؤں کہہ اگر میں اس میں ہزار  
روپیہ ہو سکتی ہوں کہہ کر دوں یہ ہر خود سب وہاں  
بھیجائوں۔ (الاضاحات لہا لوی جلد ۳ - ص ۶۱ - سطر ۸)

হে দেওবন্দীগণ! তোমরা অবগত আছ যে, দেওবন্দী ও ওহাবী  
এই দুটি মাদহাবের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এই মাদহাবটি আমার  
মনের মাদহাব। আমি আশরাফ আলী বলছি আমার কাছে যদি ১০  
হাজার টাকা থাকতো তবে সবটাকা দেওবন্দী ও ওহাবী মাদহাব প্রচারের  
ক্ষেত্রে খরচ করতাম।

আশরাফ আলী খানভীর সাহেবের উক্ত ভাষণের উপর পূর্ণ আস্থা  
হয়ে দেওবন্দীগণ ওহাবী মাদহাব বনাম দেওবন্দী মাদহাবে প্রবেশ করতে  
শুরু করলো।

**সহযোগী ফাতাওয়া :** রশিদ আহম্মদ গঙ্গুহী সাহেব জনাব  
খানভীর সাহেবের উক্ত ভাষণ দেবার পর পালটা ফতোয়া মারলেন। হে  
দেওবন্দীগণ! ওহাবী মাদহাব ও দেওবন্দী মাদহাবের মধ্যে কোন বাধ্যন  
নেই। ওহাবীগণ যেমন শূদ্র, আল্লাহ পাককে বিশ্বাস করে থাকে রাসুলকে  
পূর্ণ বিশ্বাস করেন। তদ্রূপ দেওবন্দীগণও আল্লাহর বিশ্বাসী রসুলের  
পূর্ণ বিশ্বাসী নয়। (ফতোয়ায়ে রশিদিয়া ১০ পৃঃ)

## দেওবন্দী মাদহাবের বৈশিষ্ট্য

وہم مريدون الجمع والحدك روح شيوخ ملکہ بیگہ مکان  
لیت ... .. شيوخ راہد لایب حاضر اور دہ بلحاہ  
حال سوال کنند الخ۔ (امداد السلوک معنفہ رشید  
ص ۶۰ - سطر ۱)

জনাব মৌলভী রশিদ আহম্মদ গঙ্গুহী সাহেব দেওবন্দ মাদ্রাসার  
বাসী হওয়ার সাথে সাথে দেওবন্দী মাদহাবের অন্যতম ইমামও ছিলেন।  
তিনি কলে কৌশলে হেদায়েত নাজাতের ভর দেখাতে হিন্দুস্থানীগণকে  
দেওবন্দী মাদহাব ভুক্ত করার জন্য নিম্ন পীরতারা শুরুর করেন।

হে দেওবন্দীগণ! তোমরা আমার মত শেখের মুরীদ। মৃত্যুর পূর্বে  
আমি যেমন তোমাদের ঘরে পাশে বিদ্যমান আছি তেমনি মৃত্যুর পরও  
আমি তোমাদের আশে পাশে থাকবো ইনশা আল্লাহ। মরার পর আমার  
প্রাণ সর্বস্থানে সর্বস্তরে বিচরণ করবে। তোমরা কোন বিপদে পড়ে গেলে  
আমাকে ডাকলে আল্লাহর কজলে তখনই বিদ্রোহের মত তোমাদের ঘরে  
উপস্থিত হব। দেওবন্দীগণ! আমিই একমাত্র তোমাদের মূলকিল কুশা।

জনাব রশিদ আহম্মদ গঙ্গুহীর ফারসী ভাষায় উল্লেখিত ঘোষণাটি  
প্রকাশিত হওয়ার পর দেওবন্দ অধিবাসীগণ তাকে খোদার স্থানে রেখে  
সম্মান করতে লাগলেন। এই গোমরাহীতে সাধারণ অসাধারণ প্রত্যেক  
দেওবন্দী আটকাপড়ে গেল। গঙ্গুহীর মৃত্যুর পর জনাব মৌলভী  
মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী গঙ্গুহীর শান প্রকাশের জন্য কতগুলো

عبدالان کا مرثیہ ہے وہ مرثیہ  
اس توحید غلامی کے



অর্থাৎ বিশদ আহাম্মদ শীত কেবলা সাহেবের প্রভু ছিলেন স্বয়ং খোদা-ওরান্দে তারালা। আর জনাব গঙ্গুহী সাহেব সমস্ত মাখলুকাতের খোদা ছিলেন। নাউজ্জুবিল্লাহ। কবিতা :

جدهمركواپ مائل لهي اذهر من حق بهن دائرها  
مور ليله مور كعبه لهي حلال من حلال (مرئيه  
محمود الحسن ص ۱۲)

গঙ্গুহী সাহেব মৌদিকে ঘাবিতে হতেন সেই দিকে আল্লাহও ঘাবিত হতে বাধ্য হতেন। গঙ্গুহী সাহেব দেওবন্দীগণের নামাজের কেবলা এবং কা'বাও ছিলেন। তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি আল্লাহর চাইতে বেশী হজ্জানী ছিলেন। কারণ আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারেন কিছু তাঁর পক্ষে মিথ্যা বলা অসম্ভব ছিল।

### সীতাকুণ্ড - দেওবন্দ

ভারত উপমহাদেশে বহুহিন্দু, তীর্থস্থান রয়েছে তন্মধ্যে কতিপয় স্থান এক শব্দ দ্বারা গঠিত। যেমন গয়া-কাশী, যথুরা ইত্যাদি। আর কতিপয় তীর্থ স্থানের নাম দু'টি সংযুক্ত শব্দ দ্বারা গঠিত। যেমন বিন্দা-বন দ্বারা কুন্ড নাভি-কুন্ড রাধা কুন্ড সীতা-কুন্ড এবং দেও বন্দ ইত্যাদি।

**সীতাকুণ্ড :** সীতা অর্থ সোজা রেখা। কুন্ড অর্থ গর্ত-জলাশয় ও জ্ঞানভল। পারিভাষিক ভাষে সীতা-কুন্ড ঐ জলাশয় স্থানকে বলা হয় যেখানে মিথিলার রাজা জনক কৃষিক কার্য সম্পাদন করে। হিন্দু ঐতিহাসিকগণ বলেন মিথিলার রাজা জনক তিনি লাক্ষ্মণ চখতে গিয়ে একটি মেয়ে পান সেখানে। তিনি এই মেয়েটির নাম রাখেন জানকী। এই জানকীর সঙ্গে অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র রাম চন্দ্রের সঙ্গে বিবাহ হয়। পরে তার নাম রাখা হয় সীতা। মহামন্ত্রি সীতা ও রামচন্দ্রের

নামে এই স্থানটি সীতাকুন্ড নামে পরিচিতি লাভ হয়। সেখানে বর্তমান মিথিলার উপস্থাপিত আছে। হিন্দু, সম্প্রদায় সেখানে গিয়ে লিঙ্গ পূজা করে। উক্ত তীর্থস্থানটি চট্টগ্রাম হতে ২০/২২ মাইল উত্তরে সীতাকুন্ড উপজেলায় অবস্থিত আছে।

**দেওবন্দ :** দুই শব্দ বিশিষ্ট সংযুক্ত নামের একটি নাম হল দেওবন্দ। ইহা সীতাকুন্ড শব্দের অনুরূপ অর্থ বহন করে। "দেও" শব্দটির অর্থ হল শরতান ভূত পেতনী, জঘন্যতম পাপাত্মা। দৈত্য দৈত্যারি দৈত্যের শত্রু, বিক্ষ, ইত্যাদি।

"বন্দ" শব্দের অর্থ হল দল জামাত গোষ্ঠী। দেও এবং বন্দ উভয় শব্দকে একত্রিত করে অর্থ করলে সমষ্টির অর্থ বীড়ায় শরতানের দল বা ভূতের পেতনীর গোষ্ঠী। রোমানীরাতে দেওবন্দ শব্দের অনুরূপ বালবাক নামে একটি শহর আছে। বালো ভাষায় যার অর্থ হয় ভূতের শহর। আমাদের জানা নেই যে, সেই শহরে আদৌ ভূত ছিল কিনা। তদ্রূপ আমাদের জানা নাই যে, হিন্দুস্থানের ই, উ, পিতে দেওবন্দের স্থানে শরতান ভূত পেতনী কখনো বাস করতো কি না।

হিন্দু ঐতিহাসিকগণ বলেন "দেওবন্দ" হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি ঐতিহাসিক তীর্থ স্থানের নাম। তথ্য তৎকালে হিন্দু, সম্প্রদায় উপস্থিত হয়ে পূজা পাট নবত্ব স্ব স্ব ধর্মীর কাজ সম্পাদন করতো। সে স্থানে অবস্থিত মন্দিরের চতুর্দিকে তৎকালে শত্রু শত্রু পাতিতা বসবাস করতো। পূর্ব হতে সেখানে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক আড্ডাখানাটি আজও অবস্থিত আছে। দেওবন্দ যাই থাকুকনা কেন আল্লাহর রহমতে দেওবন্দী মুরব্বীগণ তথায় সেই নামে একটি মাদ্রাসা কার্যে মনোনিবেশ করেন। মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার তারিখ ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দ।

মুরব্বীগণ বলেন যে, দেওবন্দ মাদ্রাসার স্থান নির্ধারক ছিলেন স্বয়ং মহানবী হাজুরে পাক (সঃ)। তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে সাঠি দ্বারা



মাত্রাসার সীমা রেখা নির্দিষ্ট করেছেন। আবার মুরব্বীনের আকীদা বিশ্বাস ছিল যে, প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) এর ইন্তেকালের পর তাঁর কর্ম ক্ষমতা রহিত হয়ে গেছে এবং যদি কেহ বলে যে, হুজুরে পাক (দঃ) ইন্তেকালের পর কোথায় উপস্থিত হয়েছেন এইরূপ বিশ্বাস করা সরাসরি শিরিক তুলা কর্ম। তাই মুরব্বীগণ মিলান মাহিফিল হতে গুরুগুরু করে বের হয়ে পড়েন।

আবার দেওবন্দী মুরব্বীগণ বলেন হুজুরে পাক (দঃ) দেওবন্দে এসে উম্মু হিন্দী ভাষা শিক্ষা করেন। কারণ দেওবন্দী শিক্ষকগণ উম্মু হিন্দী ভাষা চমৎকার জানেন।

## দেওবন্দে রাসুলে পাকের তশরীফ

### আনয়ন বা সুভাগমণ :

ایک صالح نظر عالم علمہ السلام کسی زیارت سے جواب میں مشرک ہوئے جواب کو اردو میں کلام کو رائے دیکھو کہ ہو چکا کہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آگئے - آپ کو عمر ایسے میں فرمایا کہ جب سے علمائے مدینہ مدینہ سے عمارانہ علمہ خواہم کو یہ زبان آگئی (ابراہیم لاطبعہ ص ۲۶ - مظهر ۱)

একজন দেওবন্দী হুজুর বাজি স্বপ্নযোগে প্রিয় নবী রাসুলে পাক (দঃ)-এর সঙ্গে দিবারাভ করেন। সেই দিবারের মধ্যে তার সঙ্গে হুজুর (দঃ) স্বয়ং গর গর করে উম্মু ভাষার কথা বার্তা বলতে দেখে তিনি অবাক হয়ে বললেন-আপনিতো আরবী ভাষাভাষী তবে উম্মু ভাষা শিখলেন

কোথা হতে? তদন্তরে হুজুরে পাক (দঃ) বললেন আরে মিঠা! আমি বহু পূর্ব হতে দেওবন্দী ওলামাগণের সঙ্গে উম্মু শিকালান্তের জন্য যোগাযোগ করে আসছি। এই মিলামিসার পর হতে আমি উম্মু ভাষার কথা বার্তা বলতে সক্ষম হই। নাউজ, বিজ্লাহ।

**পাঠকবৃন্দ :** গঙ্গাহী সাহেব তার স্বহস্তে প্রতিষ্ঠিত দেওবন্দ মাত্রাসার গুরুত্ব ঐশিষ্ট বর্ণনা করলেন তৎসঙ্গে বিশ্বনবী হুজুর (দঃ) কে হেরণ হীন করে দেখলেন। এইরূপ হেরণ হীন করা ধর্ম অবমাননা নয় কি? কোরআন শরীফ, হুজুরের উপর নাজিল হও, জিব্রাইল (আঃ) কোরআনের আরাতে নিয়ে হুজুরে পাকের খাণেই আসতেন। তিনি হার মদীনাতে থাকতেন তাহলে হযরত জিব্রাইল মদীনাতে চলে যেতেন এবং মজাতে থাকলে মজাতে যেতেন। তিনি জীবনে একদিনও জিব্রাইলের নিকট গিয়ে আল্লাহর বাণী আনেন নাই। সেই ক্ষেত্রে তাঁর উম্মু শিক্ষার জন্য দেওবন্দে উপস্থিত হওয়ার কোন যুক্তি থাকতে পারে? দেওবন্দী-গণ মনে করে যে, তাদের স্বপ্নের স্মৃতি। নবীনের ওহী হতে বেশী। তারা স্বপ্ন খেলা খেলে তাবলীগী দলের উদ্ভব ঘটাল। এসব ধর্মের নামে পরি-তার নয় আর কি?

## হারামকে হালাল করার সঠিক

### তরীকা :

حرام مال حلال کرائے کے سلسلہ میں لایا جائے ایک حیلہ لکھا ہے وہ یہ کہ الٰہی کسی حلال مال سے ترشہ لیکن مسجد یا مدرسہ میں لگایا کہ جس میں - (الافاضہ ج ۲ - ص ۲۶ - مظهر ۲)



এক ব্যক্তি আশরাফ আলী খানভী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করল যে, কোন সন্দেহ নেই যে, পতিতার কামাই হারাম। তবে পতিতা (বেশ্যাগির) আগ্রহ সহকারে মাদ্রাসা মসজিদে দান করতে চাইলে কি হুকুম? খানভী সাহেব বললেন যে, ইসলামের চিন্তাবিদ দার্শনিকগণ হারাম মালকে হালাল করার একটা পন্থা বের করেছেন উহা এই যে, পতিতা নিজ দেহ বিক্রয় করা হারাম কারাইলে কোন হালাল মালের সঙ্গে বিনিময় করতঃ মাদ্রাসা মসজিদে দান করতে পারে। যেমন একখানা কাপড় খরিন করে মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষককে দিল তাহা জামা পাগড়ী তৈরী করল অথবা একটি গাভী খরিন করে দিল মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষকগণ দুধ বা মাংস খেলো ইত্যাদি।

### সুদের টাকা হালাল করার হীলা :

মাসআলা : এক ব্যক্তি খানভী সাহেবের নিকট একথা জানতে চাইলো যে, ইচ্ছার অনিচ্ছার আমার নিকট অনেক সুদের টাকা জমা হয়ে গেছে। এখন আমি চাই যে, উহা সং পথে ব্যয় করব। এটি সম্পর্কে আপনার রায় কি? জনাব খানভী সাহেব পরের মাধ্যমে ফতোয়া প্রেরণ করলেন :  
 اسکر لمکر هندوستان آجاؤ  
 हिन्दुस्तान (देवन्द) एसपड़। पतितार कामाई हलाल हते पारले  
 सुदेर टीका हलाल हवेना केन ? (इफावा ५४ खंड ५५ प.५)

### হারাম দুধ ও মাংস হালাল করার সঠিক পদ্ধতি :

ظاهرشہ کہ اکی او و شرب لہن او ہمہ جائز بلا کراعت  
 هست پس در صورت مسولہ از شان بہیمہ چہ چیز تعرض  
 نہ کردہ شود - چوں کہ مالک او گوارہ لکند ( ۱۱ رجب  
 ۱۳۲۱ - امداد الفتاویٰ لہا لوی ج ۲ - ۵۵ - ۵۶  
 - مطر ۱۰ )

ফাতায়া : খানভী সাহেবকে কেহ জিজ্ঞাসা করলো যে, আমাদের মধ্যে কোন একজন মানুষ গাভীর সঙ্গে ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়েছে এখন সেই ব্যক্তি ও গাভীকে কি করতে হবে?

খানভী সাহেব বললেন যে, জেনাকৃত গাভীর মাংস খাওয়া এবং দুধ পান করা নিষিদ্ধে জারাজ। গাভীটাকে কি করতে হবে এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন যে, উহাকে সন্তুষ্ট বিধানের আওতাধীন রাখতে হবে। কারণ গাভীতো বেজবান যার মালিক অন্য লোক। অন্য লোকের গাভীকে জবাই করা দুরন্ত হয়ে না। অন্যে খানভীর এই ফতোয়া দ্বারা একথাই প্রতিপন্ন হচ্চে যে, এক ব্যক্তি একটা গাভী খরিন করে সকাল বিকাল দুধ পান করলো এবং জেনার সময় জৈনা করলো, তাহলে ঐ ব্যক্তির আর বিবাহের প্রয়োজন বইল কোথায়।

জেনাকৃত গাভীর সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ ফতোয়া খামীর গ্রন্থকার বলেন, لا يألحق بها, জেনাকৃত গাভীটাকে জবাই করে মাংসগুলো জমালিয়ে দিতে হবে। জেনাকৃত গাভীর মাংস খাওয়া এবং দুধ পান করা একেবারে হারাম। তবে জনাব আশরাফ আলী খানভী এই ইসলামী ফতোয়ার বিপক্ষে হালালের নির্দেশ জারী করার মূল উদ্দেশ্য ছিল যে, হিন্দুস্থানের মধ্যে গাভীর মরগা অত্যধিক ছিল। হিন্দু সম্প্রদায়গণ গাভীর পূজা পাঠ করে থাকে। যদি খানভী সাহেব জেনাকৃত গাভীর মাংস বন্ধনের নির্দেশ দিতেন তাহলে দেওন্দের হিন্দুগণ খানভীর উপর অসন্তুষ্ট হত। তিনি মাদ্রাসা টীকিরে রাখার জন্য এই পদ্ধতি গ্রহণ করেন।

নোট : মৌলভী আশরাফ আলী খানভী সাহেবকে রহমতুল্লাহ বলুক আর না বলুক তা ভক্তগণের ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে খানভী সাহেব জীবনে একটি কথাও সঠিক বলেন নি। বেহেশতী ঘির নিষিদ্ধে একটি ব্যক্তি কিতাব। তবে কিতাব খানা তার রচিত নয়। বরং উহা শিবিরে আলী ও জমিল আহাম্মদ (রাঃ) এর হাতের লেখা খানভী সম্পর্কিত উমদ পুস্তক।



## কাকের মাংস হালাল করার হীল :

দেওবন্দ মাদ্রাসার বাণী জনাব মোলভী রশিদ আহম্মদ গঙ্গুহীকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, 'এতদ্ব্যতীত মানুষ কাকের মাংস খাওয়া সম্বন্ধে নানী কথা বলে। এই ব্যাপারে ইসলামী শরী'রতের প্রকৃত নির্দেশ কি ?

জনাব গঙ্গুহী সাহেব ফতোয়া দিলেন, মানুষের কথা বাব দাও, আমার নির্দেশ হল কাকের মাংস খেলে সাওয়াব হবে। (নাউজুবিল্লাহ)

الجواب " ثواب حوكا - لفظ، شهد احمد (التاوى  
رشيده ص ۱۲۰ )

## কাকের মাংস হারাম হওয়া সম্বন্ধে

### কোরআন সুন্নাহর বিধান

(১) يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِى الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا  
(القرآن)

(২) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُوا مِنْ ثَمَرِ الْأَرْضِ مَا هُوَ مِنَ الطَّيِّبَاتِ (ابن ماجه ص ২৮)

(৩) عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحَبَّةُ نَاسِقَةٌ وَالْعُثْبُ نَاسِقٌ وَالْفَارَةُ نَاسِقَةٌ وَالْغَرَابُ نَاسِقٌ (مسلم شرح كتاب الحج)

অর্থ আল্লাহ পাকের নির্দেশ : হে মুম্বীন মুসলমানগণ, হালাল বহু ভক্ষণ কর। কাকতো হারাম।

২। ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন কাক খাবে কে ? থাকে রাসুলে পাক (রাঃ) অধারিত রূপে নাম করণ করেছেন। আমি হাদীস বর্ণনাকারী কহম করে বলাছি, যে, কাক পাক ও পবিত্র পাখী নয়। কিন্তু দেওবন্দীগণ বলেন, যে, আমরাই মাত্র কাক খেতে পারব। কারণ আমরা পবিত্র এবং অপবিত্রের মধ্যে ভেদ বিচার করিনা।

৩। হযরত আরেশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন সাপ ঘৃণিত ও অধারিত, তরুণ বিজ, ইদ্র, কাক ও ঘৃণিত। (মোসলিম শরীফ)

## দেওবন্দী মাযহাবে কাক খাওয়ার যৌক্তি :

মৌলভী রশিদ আহম্মদ গঙ্গুহী সাহেব কাকের মাংস ভক্ষণ করলে সাওয়াব হবে, তার এই ইসলাম পরিপন্থী ফতোয়া দেয়ার মূল উৎস হল হিন্দু ধর্মের সঙ্গে দেওবন্দী মাযহাবের মধ্যে একাত্তা বজার রেখে উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তুলার। হিন্দু ধর্ম কাকের বহু প্রশংসা রচিত আছে। যেমন তুলসী দাস প্রণীত রামায়ন গ্রন্থের ৭৬০ পৃষ্ঠার কাক পাখীকে দেবতা আখ্যায়িত করা হয়। একদিন এক ভদ্র হিন্দুকে অগ্নি যজ্ঞ করার পর সে কাকের ডালি ধারণ করে ফেলে। তখন হিন্দুরা কাক পাখীর প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করতে থাকে। যেমন বলে হে আমাদের কাক দেবতা। তোমার উপর আমাদের আটল ভক্তি প্রকাশ করেছে তুমি আমাদের উপর আশীর্বাদ গ্রহণ কর। কাক পাখিটি হিন্দু, ভদ্র ব্যবহার একথা শুনে সম্মরণ ও কিত'ন করতঃ উড়িয়ে শয়ান জাগ করে।

জনাব মোলভী রশিদ আহম্মদ গঙ্গুহী সাহেব হিন্দু ধর্মের অত্যন্ত গুরুত্ব উপলব্ধি করে হুজুর (রাঃ) এর অমর বাণীর একটুও তোয়াক্কা করলেন না। রাসুলে পাক (রাঃ) কাক ঘৃণিত পাখী রূপে অভিহিত



করেছেন। জনাব গঙ্গুহী সাহেব উহার প্রতি ভক্তি প্রভা জ্ঞাপন করে কাক খাওয়া সওয়াবের কাজ বলে ঘোষণা দিলেন। (নাউজুবিল্লাহ)

পাখীর মধ্যে কাক পাখী নাকরমান। হযরত নূহ (আঃ) তুকান বন্ধ হওয়ার পর যখন কাককে পানির পরিমানের খবর আনার জন্য পাঠালেন তখন কাক পানির খবর না এনে মরা লাশের মাংস খাওয়া শুরু করে দেয়। কাকের এ আচরণে হযরত নূহ (আঃ) খুব হয়ে বদদোয়া দিয়েছিলেন। কাকের পরিবর্তে পানির খবর আনার জন্য কবুতরকে পাঠালেন। কবুতর পানির সঠিক দিক দর্শন করে এসে হযরত নূহ (আঃ) কে খবর দেয়ার পর তিনি কবুতরের জন্য দোয়া করেন।

### দেওবন্দী উস্তাদ সাগরিদের লড়াই, কিতাবে “হাশ্ত মাসআলায়” আগুন :

দেওবন্দী মৌলভীগণ জন্মগত ভাবে মিলাদ সীরাতে ও কেরামের গোড়ি বিরোধী। তারা ওরাজ নসিহতের মধ্যে প্রকাশ্য বয়ান করেন যে, মিলাদ শরীফ পালনকারী বেদআতি এবং মূশরিক। কিন্তু তাদের প্রসিদ্ধ গুরু, মহামান্য দেওবন্দী সনদ বিতরণকারী প্রসিদ্ধ উস্তাদ সয়রুত তিনি আগ্রহ সহকারে মিলাদ অনুষ্ঠান করতেন, ইছালে সাওদাব করতেন। বিনি মিলাদ ও কেরামকে পুণ্যের কাজ বলতেন, তিনি হলেন হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজিরে মজী (রঃ)। তাঁর কতিপয় ছাত্র যেমন মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী, মৌলভী খলিল আহাম্মদ আম্বুটি, মৌলভী আশরাফ আলী খানভী প্রমুখ হাজী সাহেবের বিরুদ্ধে চরম পন্থা অবলম্বন করে পীরে কামেলকে মিলাদ কেরাম পছন্দ করার কারণে খুশা করতে লাগল। তবে মৌলভী আশরাফ আলী খানভী কানপুর মাদ্রাসার শিক্ষক থাকা কালীন

তথ্য মিলাদ শরীফকে সাওদাবের কাজ হিসেবে নিজেও পালন করেছিলেন আর মিলাদ বিরোধীবাদীদেরকে কাকের কতোরা দিয়ে ছিলেন। তবে জনাব গঙ্গুহী সাহেবের খপ্পরে পড়ে পরে তিনিও মিলাদ শরীফকে হারাম বলতে শুরু করলেন। শেষ পর্যন্ত মিলাদ কেরামকে কেন্দ্র করে উস্তাদ সাগরিদের মধ্যে যন্দ শুরু হয়ে গেল। উস্তাদ কোন এক স্থানে আশরীফ নিজে মিলাদ অনুষ্ঠান করে আসার পর পর উল্লেখিত বিরোধী হারাম সেখানে গমন করে বলতেন হাজী সাহেব একটি হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে গেছেন। তাঁকে আপনারা কখনও ওরাজ নসিহতের অনুষ্ঠানে দাওয়াত করবেন না। বারংবার এই রূপ কুখ্যাত নীতি এবং অপ প্রচারের দরুন হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজিরে মজী (রঃ) বিভিন্ন স্থানে অপদত্ত হতে লাগলেন। হাজী সাহেবের বিরোধী ছাত্র গঙ্গুহী সাহেব মিলাদ ও কেরামকে হারাম বেদআতে সাইয়্যাহ নাম দিয়ে একটি ফতোয়া রচনা করে গ্রাম গজে প্রমদন করে হাজী সাহেবের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অপ প্রচারে লিপ্ত হয়ে গেল। হাজী সাহেব দিশে হারা হয়ে মিলাদ কেরামের খপ্পকে একটি বিস্তারিত পুস্তক রচনা করেন যার নাম “হাশ্ত-মাসআলায়”। হাজী সাহেব কিতাব খানা রচনা করে হিন্দুস্থানের মধ্যে বিনা মূল্যে বিতরণ শুরু করলেন। আর কির, সংখক কিতাব বিনামূল্যে বিতরণের উদ্দেশ্যে তাঁর একান্ত ভক্ত ছাত্র জনাব মৌলভী আবদুস সামী সাহেবের নিকট প্রেরণ করলেন। কিন্তু গঙ্গুহী সাহেব উক্ত কিতাব সমূহকে সেখান থেকে এনে একত্র করে অগ্নিদত্ত করলো। কিতাব পোড়ার খবর শুনে হাজী সাহেব গঙ্গুহীকে অন্তর খুলে বদদোয়া করলেন। যার কারণে গঙ্গুহী সাহেব মাতালের ভেঙ্গে লুটি দিয়ে পাগড়ী বেঁধে উস্তাদের বিরুদ্ধে অপ-প্রচার শুরু করলো।

মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী সাহেব মিলাদ কেরাম হারাম প্রমাণ করার জন্য একান্ত বদ্ধ মৌলভী খলিল আহাম্মদ আম্বুটি সাহেবকে ভাও-রালপুরের ওরাজের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি সে



স্থানে ঠিক সময় উপস্থিত হয়ে মিলাদ কেয়ামকে হারাম বললেন। তখন জনতা খিলিল আহাম্মদ আম্বুটিকে নাজেহাল করার জন্য মারমুখি হয়ে গেল। খিলিল সাহেব কোন রকমে প্রাণ রক্ষা করে আবার রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহীরা আস্তানায় উপস্থিত হর।

জনাব রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী সাহেব খিলিল আহাম্মদ আম্বুটির অপমানের কথা শুনে ক্রোধ করে বললেন, এবার দু'দিকের একদিক কবর ইনশাআল্লাহ। জনাব খিলিল আহাম্মদ আম্বুটিকে নির্দেশ দিলেন যে, মিলাদ কেয়ামকে হারাম প্রমাণ করে আরো কাতপন্ন খম'নাশা উক্তি সম্বলিত একটি কিতাব রচনা কর। জনাব গঙ্গুহী সাহেবের নির্দেশক্রমে খিলিল আহাম্মদ সাহেব *سراة من لا طعمه* (যা রাহীনে কাতেরাহ) নামে একটি পুস্তক রচনা করলো। যার উল্লেখ বোণা বিষয় বহুগুলো নিম্নে প্রদত্ত হল।

- ১। আশ্লাহ মিথ্যা কথা বলতে পারেন তবে বলেন না।
- ২। মহানবী হুজুরে পাক (সঃ) নুরের তৈরী ছিলেন না। বরং তিনি আমাদের মত মানুষ ছিলেন, তিনি আমাদের তুলনায় বড় ভাই এর মর্যাদার ছিলেন।
- ৩। মহানবী রাসুলে পাক (সঃ) এর জ্ঞান বুদ্ধি শরভানের চেয়েও কম ছিল।
- ৪। মহানবী হুজুরে পাক (সঃ) রাহমাতুল লিল আলামীন ছিলেন তবে একক ছিলেন না।
- ৫। পটলিত মিলাদ কেয়াম একেবারে হারাম ও বেবআতে নাইয়াহ। মিলাদ গ্রাহফিল পালনকারী মুশরিক তুলা ইত্যাদি ইত্যাদি। আরো অন্তত শতের উর্কে কুফরী কালাম সম্বলিত কটুক্তি দ্বারা উক্ত খম'নাশা বইখানা রচনা করেন।

হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাম্মদের মজী (সঃ) দেখলেন যে, জনাব রশিদ ও জনাব খিলিল সাহেবের দ্বারা সমগ্র হিম্মত্বানে কুফরী নীতি বিস্তারিত হচ্ছে তখন অগত্যা অপারগ তিনি তাঁর দু'জন প্রখ্যাত বিজ্ঞ ভ্রাতাকে নির্দেশ দিলেন যে, গঙ্গুহী ও খিলিল দ্বারা রচিত বই খানার জবাবে স্বেচ্ছায় এক খানা কিতাব রচনা কর।

আশ্লাহ আবদুর রহমান দাশ্তগীর ও আশ্লাহ মোলায় ফরিদ (সঃ) উভ্যদের নির্দেশকে অকরে অকরে পালন করতঃ রশিদ ও খিলিল রচিত বই খানার রব করণ বা জবাব স্বরূপ *تقدم الوكيل عن الرسول والخليل* নামে স্বেচ্ছায় একটি গ্রন্থ রচনা করেন। হাজী সাহেব গ্রন্থখানা দেখে দু'জন দ্বাধের প্রসংসা করেন।

তাকদীমুল উকিল গ্রন্থখানা ৪০০ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত। প্রথম হতে ১১৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিষয়বসী হুজুরে পাক (সঃ) এর গান ও বৈশিষ্ট্যকে কৌরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কেয়াম দ্বারা প্রমাণিত করা হয়। ১১৮ পৃঃ হতে ৪০০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আল্লাহ পাকের তাওহীদ ও রব্বিয়্যাত্তের আলোচনা করা হয়েছে।

## দেওবন্দী মায়হাব মৌলভী ইসলাইল

### দেহলভী খারেজী :

মৌলভী ইসলাইল সাহেব দিল্লীর শাহ্ বংসে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ইমামে আহলে সুন্নত শাহ্ ওলী উল্লাহ মোহাম্মদে দেহলভী (সঃ) এর নাতি এবং শাহ্ আবদুল আজিজ মোহাম্মদে দেহলভী (সঃ) এর ভাতিজা ছিলেন। তিনি ঢাকার উপর রাগ করে অভিশপ্ত মজদ প্রদেশের নজদী আকীমকে হিম্মত্বানে এনে ওহাবী আকীম নামকরণ করেন। ওহাবী আকীমের পাশা পাশি তিনি তরীকত শিকার নামে নিজ পীর



সৈয়দ মোহাম্মদ ব্রেলভীকে আব্বাশ পাকের হাতে বাইয়াত করান। তার পর হতে হিন্দুস্থানের মধ্যে ভক্ত পীর মুর্ত্তীদিগ্ন সিলসিলা কারেম হল।

ইসমাইল সাহেব শূধ, খোদা প'হী ছিলেন। প্রিয় নবী রাসুলে পাক (দঃ) এর একেবারেই বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি হিন্দুস্থানে মৌল-বাহ ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের একমাত্র বিস্তারক হিসেবে প্রসিদ্ধ।

### ইসমাইল কতৃক ধর্ম'নাশা আকীদা

- ১। হযরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁর জীবদ্দশা পর্যন্ত আব্বাশ পাকের রাসুলে ছিলেন। এখন যখন মরে মাটির সাথে মিশ্রিত হয়ে গেছেন তখন তিনি ইচ্ছিত সম্মান, প্রশংসা ও গুণ কীর্তনের আধিকারী তইলেন কি করে। বর্তমানে তিনি নবী (দঃ) সাধারণ মনুষ্যের সম্মান পাওয়ার যোগ্য।
- ২। হযরত মোহাম্মদ (দঃ) কে আব্বাশ পাক বিন্দু পরিমানও গায়েবের এলেম প্রদান করেন নাই।
- ৩। হযরত মোহাম্মদ (দঃ) কে হাজির নাজির বিশ্বাস করা শিরিকী কাজ। তাই ইয়া নাবী আব্বাশ, ইয়া হাবিবাব্বাশ, ইয়া রাসুলাব্বাশ বলা একেবারে যাবেজ নাই।
- ৪। বর্তমান যুগের সকল মানুষ কাফেরে পরিণত হয়ে গেছে। তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরজ।
- ৫। রওজা শরীফ জিয়ারত করার উদ্দেশ্যে ঘর হতে বের হওয়া হারাম। যদি কোন ব্যক্তি এই নির্দেশ অমান্য করবে সেই ব্যক্তি নিঃসন্দেহে মৃশরিক।
- ৬। ইমাম হানাকী, ইমাম মালেকী, ইমাম শাফেরী ও ইমাম হাম্বলী মাযহাবীগণ সকলেই (বিনআত)।

- ৭। আব্বাশ পাকের বিশ্বাস শূধ, ইমানের জন্য। মোহাম্মদ (দঃ) এর বিশ্বাস শিরিকের জন্য।
- ৮। হযরত রাসুলুল্লাহ (দঃ) এর মদনা বড় ভাইয়ের তুল্য। আব্বাশ লিরা বৃজ'গানেদীন চামারের তুল্য।
- ৯। বৃজ'গানে দীনের তরীকত প্রচলন ইব্দুদী মতবাদ সমতুল্য।
- ১০। ওরশ মিলাদ মাহাফিল করে নবী ও আওলীয়াগণকে সম্মান করা কুফর ও শিরেকী কর্ম বিশেষ।
- ১১। নামাজের মধ্যে অর্থাৎ আত্মাহিয়াতুর মধ্যে প্রিয় নবী হৃজুরে পাক (দঃ) মহব্বতের সহিত সালাম দেওয়া গরু, গাধাকে মহব্ব-বত করার তুল্য।
- ১২। ইহ কালে মবীর কোন কমতা ছিলনা, পরকালেও তাঁর কোন কমতা থাকবেনা।

### দেওবন্দী মাযহাবের দ্বিতীয় ইমাম মৌলভী কাশেম নানুতবী-কাদিয়ানী :

মৌলভী কাশেম নানুতবী সাহেব মৌলভী মূমলুক আলীর শিষ্য ছিলেন। মৌলভী মূমলুক আলী সাহেব মৌলভী ইসমাইল দেহলভী সাহেবের অসাধারণ ভক্তও ছিলো। তিনি ওহাবী নীতিমালার বাস্তবায়ন লক্ষে নিজ নামকে "মূমলুক আলী" হতে "মূমলুকুল ওলায়" পরিবর্তন করেন। কারণ প্রথম নামটি হযরত আলীর সাথে সম্পর্ক যুক্ত আর দ্বিতীয় নামটি "ওলা" অর্থাৎ আব্বাশের গুণ বাচক নামের সাথে সম্পর্ক যুক্ত।

দেওবন্দী মাযহাবের বাণী দ্বারা হিন্দুস্থানের মধ্যে দেওবন্দী মাযহাব তত্ত্বা শিকড় গজাতে পারে নাই। তবে এই মূমলুক আলী মাস্টারের



মাধ্যমে হিন্দুস্থানে ওহাবী মাযহাব প্রচারের জন্য গঙ্গুহী ও নানুতভীকে নির্দেশ দিলেন যে, ওহাবী মাযহাবের শিক্ষা দেয়ার জন্য মাদ্রাসা কার্যে মকর। গঙ্গুহী ও নানুতভীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নানুতভীর কাশেম শব্দ এর সংযুক্ত করে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে কাশেমুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপন করে। স্বয়ং মৌলভী কাশেম সাহেব উক্ত মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মনোনীত হন। আর মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী সেক্রেটারী জেনারেল নিযুক্ত হন।

মৌলভী কাশেম উক্ত মাধ্যমে হানাকী মাযহাবের অনুকরণে শিক্ষা বাবস্থা চালু করলে গঙ্গুহী সাহেব পরামর্শ দিলেন যে, হানাকী মাযহাবের সাথে ওহাবী মাযহাবের শিক্ষা দেয়া হউক। হিন্দুস্থানের হিন্দুরা দেখল যে, দেওবন্দ মাদ্রাসাতে ওহাবী আকীদার ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে এবং হিন্দু-দেরকে মুসলমানদের সঙ্গে চলাফেরার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে তখন হিন্দুরা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে মাদ্রাসার চাঁদা দেয়া শুরু করল। এমন কি কংগ্রেসের প্রচার কেন্দ্রও সে দেওবন্দ মাদ্রাসায়ই স্থাপন করা হল। আজও মাদ্রাসাটি কংগ্রেসের প্রচার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

**ধর্ম কুৎসা :** মৌলভী কাশেম নানুতভীর পুত্রিং দেওবন্দী-গণ মহানবী হযরত রাসুলে করীম (সঃ), সাহাবী, আওলীরায়ে কেরামদের শত শত কুৎসা রচনা করেন। তবে সে ক্ষেত্রে নানুতভী সাহেব একটি অন্যতম কুৎসা করেন। সেই কুৎসাটি হল যে, তিনি প্রিয় নবী হুজুরে পাক (সঃ)-কে শেষ নবী হওয়ার বিশ্বাসী ছিলেন না। জনাব নানুতভী সাহেব বলেন, আওরাম মানুশেরা হযরত নবী করীম (সঃ) কে শেষ নবী হিসেবে বিশ্বাস করেন। শেষ নবীর অর্থ এই যে, তিনি তাঁর পুত্রিং সকল নবীগণের পরে আবির্ভাব হন। তবে জানীগণ বলেন যে, হযরত নবী করীম (সঃ) শেষ নবী হিসেবে বৈশিষ্ট পূর্ণ ছিলেন না বরং তাঁর পুত্রিং বৈশিষ্ট ছিল অন্য দিক দিগা।

অর্থাৎ মৌলভী কাশেম সাহেব প্রিয় নবী রাসুলে পাক (সঃ) এর শেষ নবী হওয়ার কোন বৈশিষ্ট্য মনে করতেন না। (الحق للناس من الله لا اله الا الله) মৌলভী কাশেম নানুতভী সাহেব স্বরচিত উক্ত পুস্তকের ৬৪ পৃষ্ঠার ১৬ লাইনে আরো বলেন, হযরত নবী করীম (সঃ) এর নবুত্বী বৃদ্ধির পর অন্য কোন নবীর আগমন ঘটলে মোহাম্মদ (সঃ) এর শেষ নবী হওয়ার অর্থ কিস্তি হয়ে যাবে না? কাশেম সাহেবের এই অপব্যাক্য যারা গোলাম মোহাম্মদ কাবিরানী নবী মোহাম্মদ (সঃ) এর পর নবী হিসেবে নবুত্বের দাবীদার হল। প্রকৃত পক্ষে কাবিরানী সম্প্রদায়ের মূল উৎস হল জনাব কাশেম নানুতভী সাহেব। যেই মাদ্রাসার পরিচালকের এইরূপ মনোভাব হয় সেই মাদ্রাসার প্রশিক্ষিতদের ইমান আকীদা কিরূপ হবে? প্রত্যেক পাঠক নিজের বিবেচনা করে দেখুন। এই কাশেম নানুতভী উক্ত পুস্তকের ৪ পৃঃ ২১ লাইনে লেখেন নবীগণের আমল আখলাক হতে কতিপয় উম্মতের আমল চবিত্ত সম্মত ছিল।

## দেওবন্দী মাযহাবের তৃতীয় ইমাম মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহীর জীবনী সংক্ষেপ :

মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী সাহেব দেওবন্দ মাদ্রাসার অন্যতম অভিযাবক ছিলেন। মৌলভী কাশেম সাহেবের মৃত্যুর পর তিনি আবার সেই মাদ্রাসার মোহতামিম নিযুক্ত হন। তার আকীদা বিশ্বাস ছিল অত্যন্ত বদ, সেই কারণে সে নিজ এলাকাত অবাঞ্ছিত ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে ছিল। অতঃপর সে নিজের ববনামী ঢাকার জন্য হিন্দুস্থানের বিখ্যাত ওলীয়ে কামেল হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজিরে মজীর হাতে বাইরাতে গ্রহণ



করে। যখন কিছু বদনামী জুড় হয়ে গেল তখন নিজ পীরের বাইয়াত ভেঙ্গে মিলান ও কোরামের মাসরালেতে উগ্রাদের সঙ্গে বিমত পোষন করে। হাজী সাহেব অগত্যা রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী বাইয়াত প্রত্যাখ্যান করেন। বাইয়াত ভেঙ্গে দেয়ার পর গঙ্গুহী সাহেব রাগের মাথার পীরে কামেল হাজী সাহেবের “হাফ মাসারেল” পুস্তক খানাকে পুড়িয়ে ফেলে। নিজ পীর সাহেবের পুস্তক অগ্নিদগ্ধ করার ঘটনা আমি পূর্বেই আলোচনা করেছি। এখন আমি রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী সাহেবের ইমান, আকীদা ও চরিত্র বর্ণনা করব।

- ১। আল্লাহ বিখ্যাত বলতে পারেন, তবে তিনি তা বলেন না।
- ২। মহানবী হুজুরে পাক (সঃ) এর অনুরূপ মানুষ সৃষ্টি হতে পারে।
- ৩। প্রিয় নবী হুজুরে পাক (সঃ) আমাদের মত সাধারণ মানুষ ছিলেন।
- ৪। মহানবী হুজুরে পাক (সঃ) এর চেয়ে শরতানের জান ব্যুতি বেশী ছিল।
- ৫। প্রচলিত মিলান মাহফিল ও কোরাম বেদআতে সাইয়েরাহ বা হারাম।

### দেওবন্দী মাযহাবের চতুর্থ ইমাম মৌলভী খলিল আহাম্মদ আমবুটির সংক্ষিপ্ত জীবনী :

মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী সাহেবের ছাত্র ও কুফরী আকীদা প্রমোদিত পুস্তক ফতোয়ায় রশিদিয়া ও বারাহীনে কাতেরায় লিখিত

আছে। রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহীর উগ্রাদের প্রণীত তাকদিসুল উকিল গ্রন্থে তার কুফরী মতবাদের সমালোচনা করেন।

মৌলভী খলিল আহাম্মদ আমবুটি সাহেব মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী সাহেবের খাচ চামচা ছিল। সে ছিল দেওবন্দী আকীদার গোড়া সমর্থক। খলিল সাহেব নিজেই গঙ্গুহীর কুফরী কালামকে সমর্থন দরে বিলে ছিলো নবী মোহাম্মদ (সঃ) এর জান ব্যুতি শরতানের জান ব্যুতি হতে কম ছিল। তারই প্রচেষ্টার ভাওয়াল পুরে দেওবন্দী আকীদা বিস্তারিত হয়। সেই ভাওয়াল পুরে মিলান ও কোরামকে উপেক্ষা করার কারণে নানা ভাবে অগদগত হয়। ভাওয়াল পুরে তৎকালে সরকার পরিচালিত জামেয়া আব্বাসিয়া নামী একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত ছিল। খলিল সাহেব কলে কৌশলে ঐ মাদ্রাসা শিক্ষক নিযুক্ত হয়। তার পর হতে তিনি স্থানীয় এলাকার ধীরে ধীরে দেওবন্দী মতবাদ বিস্তার করতে থাকে। ইহা দেখে তৎকালীন সুন্নী আকীদার প্রখ্যাত আলেক হযরত মাওলানা গোলাম দস্তগীর সাহেব গঙ্গুহীর রচিত বারাহীনে কাতেরা পুস্তক খানা সঙ্গে করে নিয়ে ভাওয়াল পুর মাদ্রাসায় উপস্থিত হন। সেখানকার উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তাগণকে তার ধর্মনাশা পুস্তক খানা দেখান। সরকারী কর্মকর্তাগণ পুস্তকের মধ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিভিন্ন সমালোচনা দেখে অবাক হন।

এদিকে খাজা ফরিদ সাহেব খলিল সাহেবকে পুস্তকের বিবরণ বহুর উপর আলোচনা শ্রবণ করেন। আলোচনাতে পরিস্কার হয়। পড়ল যে, তিনি একজন নজবী পুহী দেওবন্দী ওহাবী। অন্যদিকে মাওলানা দস্তগীর সাহেব খলিল আহাম্মদ আমবুটি সাহেবকে আলোচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত করার জন্য লোক পাঠান, কিন্তু ইতি পূর্বে তিনি ভাওয়াল পুর হতে পলায়ন করেন। (ভাজকেরাতুল খলিল ৯০ পৃষ্ঠা)



দেওবন্দী মায়হাবের শেষ ইমাম  
মৌলভী আবদুল আলী খানভীর  
সংক্ষিপ্ত জীবনী :

জনাব মৌলভী আশু'রাফ আলী খানজী সাহেবের কাম্বুখান ছিল খানাবন  
গ্রামে। তিনি ছাড়া তার অন্যান্য বংশধরগণ সকলই নুনৌ আকীবা পাহাড়ী  
ছিলেন। তিনিও প্রথম প্রথম নুনৌ আকীবার ছিলেন। শেষে মৌলভী  
রাশিদ আহাম্মদ গঙ্গু'র সাহেবের বপু'র পড়ে ওহাবী আকীবা অবল-  
ম্বন করেন।

মৌলভী আল-রাফ আলী খানভী সাহেব ইয়াকুব দেওবন্দীর বিশেষ  
ছাত্র ছিলেন। খানভী সাহেব শিক্ষা সমাপ্তির পর সর্ব প্রথম কানপুর  
ইসলামিয়া মাদ্রাসার একজন সাধারণ শিক্ষক নিযুক্ত হন। এই ইসলামিয়া  
মাদ্রাসার স্থানীয় অধিবাসীগণ ছিল ইম্যান আকীদ। বিদ্যাসে একেবারে খাঁটি  
সুন্নী এবং হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজিরে মজী (রহঃ) এর অভ্যাস ভক্ত।  
খানভী সাহেব সেন্দ্বানে অবস্থান কালে চতুর্দিকে গিয়ে মিলাদ মাহকিল  
করতেন। খানভী সাহেবের তত্ত্বাবধানে পীর ছিলেন তৎকালীন অতি  
প্রসিদ্ধ আলেম হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজিরে মজী (রহঃ) তিনি সদা  
সর্বদা পীর সাহেবের খেদমতে নিয়োজিত থাকতেন এবং হাজী সাহেবের  
সঙ্গে মিলাদ অনুষ্ঠানে মিলাদ কেয়াম করতেন।

একবার মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী সাহেব খানভাঁ সাহেবের  
 নিম্নে একটি চব্বস পত্র প্রেরণ করে অবগত করান যে, মিলাদ কেদাম যখন  
 বেদান্ত ও শিরিক তখন কানপুরে উহাকে যেভাবে হুঁক জুমি হারান  
 প্রমান কর। অথবা কানপুর ছেড়ে দিলে যান। বনে পায় সেজে বসে থাক।  
 এই নির্দেশের পর কানপুর ছেড়ে তিনি খানাবনে এসে আস্তানা করেন।

করেন। এখন হতে তিনি একটানা প্রিয়নবী হৃদয়ে থাকিয়া ও সাহাবা কেরামদের বিরুদ্ধে ফতোয়া বচনা করতে থাকেন। তার নব্যমত বিরোধী ফতোয়ার মধ্যে জুলফা ফতোয়া হল এই যে, তিনি মহানবী রাসুলে পাক (সঃ)-কে কবর খানী বলেছেন।

খানভী সাহেব দু'জন যোগা যোগা বেতনধারী কেরানী রেখে ছিলেন প্রথম জনের নাম ছিল মাওলানা শিবদুর আলী দ্বিতীয় জনের নাম মাওলানা আমিল আহাম্মদ। যতদিন খানভী সাহেবের আল এমদাদ ও আল হাবলিগ মাসিক পত্রিকা দু'টি চলে, ছিল ততদিন এই দু'জন আলেম উক্ত দু'খানা পত্রিকার সম্পাদন করতেন। যখন পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেল তখন তারা দু'জন কোরআন, হাদীস, ফেকাহ ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর কিতাব রচনা করে জনাব খানভী সাহেবের নামে প্রকাশ করতে লাগলেন। আজ কাল যতগুলো কিতাব খানভীর নামে প্রকাশিত হয়েছে উহা উক্ত দু'জন আলেমের প্রণীত শব্দে কিতাবের জুলুস নিদর্শন।

জনাব শিবির আলী ও জামিল আহাম্মদ (রহঃ) খানভী সাহেবের  
মৃত্যুর পরও খানা বনে বসে বহু কিতাব আদিত স্বহস্তে লিখে খানভী  
সাহেবের নামে প্রকাশ করেন।

আশরাফ আলীর ঘোষণা মতে মহানবী  
(দঃ) কত জানী ছিলেন :

(معاذ اللہ) آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم  
 کیا جاتا اگر بقول: یہ صحیح ہو تو درحالت طلب امر  
 یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کلی غیب۔



اگر بعض علوم فیهما مراد ہوں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے۔ ایسا علم فہم کو زیادہ - عمرو بلکہ ہر مہم و مسجون بلکہ جمیع حیوانات اور ہاں تم کے لئے ہوں حاصل ہے (حفظ الامان مصنفہ اشرف علی لہا لوی مطبوعہ دہلی ص ۱۰)

আশরাফ আলী খানভী সাহেব বিদ্যনবী হাবীব খোদা হুজুরে পাক (দঃ) বিজ্ঞ ছিলেন। মস্তব্য করে একটি চ্যালেঞ্জ দেন। খানভী সাহেব বলেন যদি কোন ব্যক্তি দাবী করে যে, প্রিয়নবী হুজুরে পাক (দঃ) বিজ্ঞ ছিলেন, সেই দাবীর বিপক্ষে আমি খানভী বলব যে, নবী (দঃ) কুদ্র জানী ছিলেন। কারণ জ্ঞান প্রেস্টেজের ও কুদ্র জ্ঞানের মানদণ্ড দু'প্রকার। প্রথম প্রকার হল প্রেস্টেজ জ্ঞান। এই জ্ঞানের পূর্ণ অধিকারী হলেন একমাত্র আল্লাহ পাক। দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান হল সামান্য বা কুদ্র। প্রথম প্রকারের জ্ঞানের মধ্যে কারো অন্তর্ভুক্তি শিরিক।

অতএব মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) এর জন্য যে কুদ্র জ্ঞান দাবী করা হয়েছে উহাতে বারেন্দ, আমর, শিশু, পাগল এমন কি সমস্ত বে-ভবান জীব জন্তুরও তো অর্জিত আছে। এই কুদ্র জানী হওয়ার দ্বারা নবী (দঃ) বৈশিষ্ট্য কোথায়। (হেফযুল ইমান ৮ পৃঃ)

### এই চ্যালেঞ্জের মূল কারণ :

১। নবী (দঃ) আমাদের মত মানুষ এবং সাধারণ মানুষ ছিলেন বলে মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী সাহেব যে চ্যালেঞ্জ করেন সেই চ্যালেঞ্জকে তাকদীসুল উকিল নামের সুপ্রী স্প্রেড খণ্ডন দ্বারা প্রমানীত হয় যে, প্রিয়নবী হুজুরে পাক (দঃ) সাধারণ মানুষ ছিলেন না বরং অদ্বিতীয় রাসুল ছিলেন। এই খণ্ডন নীতি দ্বারা গঙ্গুহী সাহেব অপমান ও লাঞ্ছনা হয়ে গিয়ে বলে দান। খানভী সাহেব নবী (দঃ) কে কুদ্র জানী বলে গঙ্গুহী সাহেবের অপমানের প্রতিশোধ নিলেন এখানে।

২। আশরাফ আলী খানভী সাহেব উল্লেখিত কটুক্তি করে একথা বলতে চান যে, নবী (দঃ) কুদ্র জানী ছিলেন আর তিনি একাই অজ্ঞাত জানী ছিলেন। কেননা তিনি ছিলেন একাই হৈকিমুল উম্মত বা মোজাম্মেদ মিলত।

নোট : মৌলভী আশরাফ আলী খানভী সাহেব যে বলেছেন বিদ্যনবী (দঃ) জ্ঞান প্রেস্টেজের অধিকারী ছিলেন না, তার এই দ্রষ্টব্যটি একটি কুফরী কালাম দ্বারা। আর খানভী সাহেব জীব জন্তুর সঙ্গে বিদ্যনবী (দঃ) কে উপমা সহকারে তুলনা করতে তিনি ধর্ম হ্রাস হয়ে গেলেন নিসন্দেহে। তাকে যে ব্যক্তি মুসলমান ছিল বলে দাবী করবে সেও নিসন্দেহে কাকের হয়ে যাবে।

খানাবনের আশরাফ আলী খলিফাতুল মুসলেমীন হযরত আব্দুলকর সিন্দিক (রাঃ) ও হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) কে শরতানের সাথে উপমা দিয়ে কটুক্তি করেন। তিনি বলেন এই দু'বহান ব্যক্তিদের ছবিতে শতাব্দী আবৃত হতে পারে। (ইফাযা ৬ খণ্ড ১৮২ পৃঃ)

জনাব আশরাফ আলী খানভী সাহেব প্রিয়নবী হুজুরে পাক (দঃ) এর মদীন। মোনাওয়ারার মদীনা কুদ্র করে বলেন যে, তার খানাবনের মদীনা মদীনীর অনুরূপ। এই মদীনার চুটি কারণ দেখান, তিনি এখানে প্রথম কারণ এই যে, খানাবনে তার পীর সাহেব পদার্পন করেন। দ্বিতীয় কারণ দ্বারা তিনি খানাবনে আস্তানা পেতেছিলেন। (ইফাযা ৬ খণ্ড ২৭০ পৃঃ)

لوا بجمع شمله على شان فتوى طلب كما كنهه و ث من قبره عماره بنائى كى مما لعت قوم معلوم ہے ! جب لہى كرم (م) كے روضہ پر كٹيہ بنا ہوا ہے تو كيا جائے ۔  
الجواب : اسے كواد بناوا جب ہے ۔ فقط اشرك على  
(الاضاحات الوضوئيه ج ۱ ص ۱۹۰ مطبعہ ۱۳۲۲)

অনুবাদ : নবাব জমিদার আলী খান জনাব আশরাফ আলী খানভী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলো, হুজুর! দাবীস শরীফের মধ্যে



কবরের উপর ঘর নির্মানের নিষেধাজ্ঞা এসেছে কিছু নবী (দঃ) এর রওজা শরীফের উপর যে, গোম্বোজ নির্মিত আছে তা কি করা হবে।

**ফতোয়া :** জনাব আশরাফ আলী খানভী সাহেব নবী (দঃ) এর রওজা শরীফের উপর যে কোববা নির্মিত আছে তা ভেঙ্গে দেয়া ওয়াজিব বলে ফতোয়া প্রদান করেন।

لنا وی رشیدہ ۱۱۲) ہشتہ فیروز قبہ بنالاحرام ہے

**ফতোয়া :** দেওবন্দ মাদ্রাসার ফতোয়া লেখক মৌলভী আজিজুর রহমান ফতোয়া দেন, জিয়ারত উদ্দেশ্যে আজমীর শরীফ গমন করী ব্যক্তি হত্যাযোগ্য এবং জেনার লিপ্ত হওয়া ব্যক্তির ছেড়ে বেশী পাপিষ্ট। (لجہ بہ احیائے دین ص ۹۳-۹۴: شہان کوٹ)

### খানভী ও খানাবন এর মর্ষাদা

০ মৌলভী আশরাফ আলী খানভীর একজন অতি ভক্তের শক্ত মুরশীদ একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে, একদা আমি খানাবনের রাস্তা কুড়াতো ছিলাম হঠাৎ আমার সম্মুখে একজন মানুষ উপস্থিত হল যার পায়ের হাটুর নীচের অংশ ঝকঝক করছিল ইহা দেখে আমি ধারণা করলাম তিনি নিঃসন্দেহই নবী করীম (দঃ) হবেন। এই দেখে সেই মূহূর্তেই আমি তার কদমবুঁচি শরু করলাম। তখন তিনি বললেন অতিরিক্ত হয়ে যাচ্ছে মাথা উঠাও। আমি মাথা উঠায়ে দেখি যার পাবুঁচি করছি তিনি আমার পীর আশরাফ আলী খানভী সাহেব। তখন হতে আমার আস্থা হল যে, আমার পীর সাহেব মহানবী (দঃ) হতে কোন দিকে মর্ষাদিগ্ন কমনন। (আসদাকুর রোইয়া ১৫ পৃঃ ১২ লাইন)

এই অতি শক্তের ভক্ত মুরশীদ আর একটি স্বপ্নের ঘটনা বলেন। আমাদের একটি নিঃসম আছে যে, আমরা তাবলীগি নেসাব অনুরূপ 'হাসনুল আজিজ রিসালা' খানার কিছ, অংশ হলেও তেলাওয়াত করে ঘুমাই। আমি এই

নিঃসম পালন করে একরাতে ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুমের মধ্যে দেখি যে, আমি "ফরফর" "ফরফর" করে কালেমা পাঠের মধ্যে রাসুলুল্লাহ বাকের স্থানে পীর কেবলার নাম উচ্চারণ করতছি। তখন জাগ্রত হয়ে কয়েকবার আউ-ঘুবিলাহ পাঠ করে পুনঃবার ঘুমায়ে পড়ি। পুনঃবার শরতান এ বিকল্প কালেমাটি আমার মুখে উচ্চারণ করছে। সেই রাতে তিনবার আমি শরতানী কালেমাটি ধারংবার পাঠ করি। খুব সকালে ঘুম হতে উঠে পীর কেবলার খানাবনের আস্তানার গিরে যনা ধরি। পীর সাহেব আমার মুখে স্বপ্নের ঘটনা বিস্তারিত ভাবে শুনেন এই স্বপ্নের ভাবীর বলেন।

اس واقعہ میں اصلی تھی کہ جسکی طرف رجوع کرو  
تھے ہو وہ بحوالہ تعالیٰ متبع سنت ہے (رسالہ الامداد  
اشرف علی تھاوی باب ۱۳ ص ۳۵-۳۶ ص ۳۷-۳۸)

তুমি কালেমা পাঠের যেই বিকল্প স্বপ্ন দেখেছ উহা বারা আশ্রাহ তোমাকে শাসনা দিচ্ছেন, ইহা বারা বিচলিত হওয়ার কিছু নাই। আরে স্বপ্ন ছাড়াও তুমি যার দিকে রজ, হও সে অত্যন্ত ধার্মিক। (নাউজুবিল্লাহ)

স্বপ্নের ঘটনাটি মৌলভী আশরাফ আলী খানভী সাহেব ১৩৩৬ হিজরী সনে তার স্বপ্রকাশিত "আল এমদাদ" পত্রিকার ছাপার পর সাধারণ মানুষ তাকে কাকের নামে আখ্যায়িত করে। দেওবন্দী মাঘহাভের চতুর্থ ইমাম মৌলভী খলিল আহম্মদ আম্বুটি সাহেব নিশাহারা হয়ে পেরী না করে খানভী সাহেবের আস্তানায় উপস্থিত হলেন। কিছু খানভী সাহেবকে পেলেন না। অবশেষে খানভী সাহেবের ওয়াজ নাহীফিলে উপস্থিত হলেন তিনি সেখানে তার সঙ্গে মোলাকাত হয়ে গেল। নাহীফিলের মধ্যে খলিল সাহেব খানভী সাহেবের কানে কানে বললেন, হুজুর। মানুষ আপনাকে কাকের বলছে। আপনি নিজের ভুল তাবীকের সূরাহা এখনেই করে ফেলুন। নচেত আমাকে বলুন আমি স্বপ্নের সঠিক তাবীরটি প্রকাশ করে দেই। খলিল সাহেবের এই উপদেশ বাণীর উপর খানভী ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন :



اگر ایسا ہوا تو میں جلد سے اٹھ کر چلا جاؤں گا  
(اشرف المصنوعات تہا لوی ص ۱۷۷ - مطرہ)

হে খলিল! এই মুহূর্তে আমাকে যদি অতি বিরক্ত কর তবে আমি মজলিস ত্যাগ করে চলে যাব। কুফরী করছি আমি, তোমার কেন এত মাথা ব্যাথা। এবার খলিল সাহেব ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, আপনি আস্তা কাফের। আপনার পত্নী ভালোক হয়ে গেছে। এই বলে মৌলভী খলিল আহাম্মদ সাহেব দেওবন্দ এলাকা ছেড়ে সাহারণ পুর মাদ্রাসার শিক্ষক হয়ে গেলেন।

### দেওবন্দীগণ তিন দলে বিভক্ত :

**প্রথম দল :** মৌলভী খলিল আহাম্মদ আম্বুটি সাহেব প্রথমেই তিনি মৌলভী আশরাফ আলী খানভী সাহেবকে কাফের ফতোয়া দেন। তাঁর সঙ্গে এক বিরাট দেওবন্দী দল একাত্তা প্রকাশ করেন।  
الراجح ص ৫২

**দ্বিতীয় দল :** দ্বিতীয় দল হল মধ্যম পন্থীদল। এই দলের লোকেরা আশরাফ আলী খানভী সাহেব হতে আকীদা ছিন্ন করলনা আবার তার পূর্ণ সহযোগীতাও করলনা। যেমন এতদেশের গোলফী সুন্নীগণ খানভীর সম্বন্ধে ভাল মন্দ কোন অভিমত প্রকাশ করেন না।  
الحاكت  
فہو شیعہ مطان اخر من الحق  
প্রকাশ করেন। তাদেরকে মহানবী হুজুর (সঃ) বোবা শরতান নামে আখ্যা দিয়েছেন।  
الراجح تہا لوی ص ۱۷۷ - مطرہ

**তৃতীয় দল :** এই দলের মধ্যে রয়েছেন মহামান্য আদিম দেওবন্দীগণ। তারা খানভী সাহেবের কুফরী স্বপ্নকে গারের জোরে ইসলামী স্বপ্ন বলে থাকেন। এই দলের অভিমত হল এই যে, যদি কেহ কালেমার মধ্যে

মোহাম্মদ রাসুলুলাহ এর স্থলে ইচ্ছে করে আশরাফ আলীর নাম ব্যবহার করে তবে নিসন্দেহ কুফরী কালাম। এখানেতো খানভী সাহেবের মুরীদই স্বপ্ন দেখেছে কাফের হলে সেই হবে। খানভী কেন কাফের হবে?

প্রথম দল এই প্রশ্নের জবাব দেন যে, খানভী সাহেবতো স্বপ্ন দেখে কাফের হন নি। বরং স্বপ্নের মনগড়া ভাবীর দেয়ার কারণে সে কাফেরে পরিণত হয়েছেন।

### মৌলভী আশরাফ আলী খানভীর ফতোয়ায়

#### সকল দেওবন্দী কাফের :

(۱) اب لو اکثر ایسا ہی ہوگا کہ مسلماں ہونے  
بہر مراد ہوگئے (اخانات ج ۲ ص ۱۸۶ - مطرہ)

জনাব মৌলভী আশরাফ আলী খানভী প্রথম দলের কুফরী ফতোয়া প্রাপ্তির পর তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে সকল দেওবন্দীকে প্রথমে কাফের বললেন পরে ধমচ্চুতা ও বললেন। তখন দেওবন্দীগণ প্রশ্ন করলেন হে খানভী সাহেব! আপনি মুসলমান দেওবন্দীগণকে কাফেরে পরিণত করলেননি কেন? খানভী সাহেব প্রতি উত্তরে বললেন, দেওবন্দীগণতো প্রথমে মুসলমান ছিল, অতঃপর ধমচ্চুতা হয়ে যায়। অর্থাৎ আমিও তোমাদের নিকট প্রথমে ঐটি মুসলমান ছিলাম। আর এখন শেষ জীবনে কাফের হলাম কেন?

(۲) کفر کے لئے ایک بات کافی ہے کیا کفر کے ایک  
بات سے کافر نہ ہوگا? (اخانات ج ۲ ص ۱۸۶ - مطرہ)

দেওবন্দীগণ পুনঃ প্রশ্ন করলেন : আপনাকে শুধু একটি স্বপ্নের ভুল ভাবীর দেয়ার কারণে আমরা কাফের বলেছি। খানভী সাহেব বললেন মানুষ কাফের হওয়ার জন্য একটি কুফরী কথাই যথেষ্ট।



(৭) كافر لواءه خود بنه هيس. اب سرى بتلا با جا لاه  
(اضافات ج ۲ - ص ۳۱۸ - سطر ۱۶)

দেওবন্দীগণ পাঠ্য প্রশ্ন করলেন, হে খানভী সাহেব! আপনি সকল দেওবন্দীদেরকে বিনা কারণে কাফের বানাচ্ছেন।

জনাব খানভী সাহেব বললেন দেওবন্দীগণ প্রথম হতেই কাফের বনে রয়েছে। তবে আমি এখন তাদের কাফের হয়ে যাওয়ার কথাটা প্রকাশ করছি মাত্র।

(৮) ایسا سمجھنے والا شخص ہوں گا کہ جو کفر کو  
کفر نہ کہے (اضافات ج ۲ - ص ۳۱۸ - سطر ۱۶)

দেওবন্দীরা বললেন : দেওবন্দীরা কাফের হটক অথবা মুসলমান হটক আপনি তাদেরকে কাফের ফতোয়া দিলে কোন ফারদা হচ্ছে ?

জনাব খানভী সাহেব বললেন : কোন কাফেরের কুফরী কার্য করতে দেখেও তাকে কাফের না বললে নিজেই কাফের হতে হয়।

উপরে উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা প্রমাণীত হল যে, জনাব মৌলভী আশরাফ আলী খানভী সাহেব দেওবন্দীগণের মধ্যে একা খাঁটি ইমানদার ছিলেন।

**সমাপ্ত**



# সুন্নী আকীদা - বিশ্বাস মোতাবেক লিখিত আমাদের কতিপয় ধর্মীয় পুস্তক

## সহীহ মুরাদুল মোমেনীন

সাধারণ মুসলিম নর-নারীদের ধর্মীয় শিক্ষার অধিতীয় ও প্রশসনীয় পুস্তক

## শানে মোহাম্মাদ (দঃ)

নূরে মোহাম্মাদীর অনু হতে তাঁর সকল প্রকার জাহেদী ও বাতেনী শানের স্থলস্ত নিদর্শন।

## হাকীকতে খানায়াকাবা

কাবা ঘর হতে বিশুদ্ধগত সৃষ্টি এবং কালো পাথর হতে হারাম শরীফ ও কাবার পরিচিতি।

## যুক্তিতে ধর্মীয় বিধান

যুক্তিতে ধর্ম পালনের মূল উৎস

## সুন্নী পরিচয়

ধর্মের দৃষ্টিতে বোহেশতী ফেরকা ও সোযবী ফেরকার সঠিক পরিচয়

## ওহাবী পরিচয় :

হাদীসে ব্রাসূলে ওহাবী ফেরকার সঠিক দিক এবং মিলাদ ও কেয়াম পালন করার মহা ফজিলত

## নকশে সোলায়মানী

ইহা পরিষ্কিত ও প্রশসনীয় জাবীজ - তুমার এর বই

## তিন সূরা

সাধারণ মানুষের তেলওয়াযতের জন্য উচ্চারণ ও অর্থ সহ সূরা ইয়াসীন,  
সূরা রহমান ও আয্যাকুল কুরসী

## নূরে এলাহী পাঞ্জো সূরা ও দোয়া দরুদ

উচ্চারণ ও অর্থসহ সূরা ইয়াসীন, সূরা রহমান, সূরা ওয়াকেরা, সূরা মুলক, সূরা মুখাম্মিল,  
এবং আসমা-উল-হুসনা, আসমা-উল-মবী, দোয়ায়ে হাবিবী, দরুদে তাহ, দরুদে এলাহী ও মুনাযাত

## নূরে মোহাম্মাদী পকেট নামাজ শিক্ষা

সহজ পদ্ধতিতে নামাজ শিক্ষার বই